Regestered No C 116,

নবম বর্ষ ।] বৈশাখ ১৩১২ । [প্রথম সংখ্যা ।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী ।
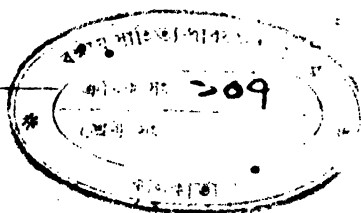
সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

Printed by Jogendra Nath Chakraborti

At The "Hari-press" No 133 Musjid Bari Street

CALCUTTA

1905

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণের

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই একমাত্র মহৌষধ)

শ্বাস কাসাদিতে প্রপীড়িত রোগীগণ ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার ও যন্ত্রণাময় ভাবিয়া সতত অশান্তি ভোগ করিতে থাকেন। জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া, মৃত্যুর করালকবলে পতিত হইবার বাসনা করেন। যাঁহারা হাঁপানি কাসি শিবের অসাধ্য রোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপশম প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাসশূন্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমাদের এই "শ্বাসারি" একশিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন, অবশ্যই উপকার পাইবেন। আমাদের এই "শ্বাসারি" সেবনে নিম্নলিখিত উপসর্গসহ হাঁপানি কাসি সত্বর নিবারণ হইবে।

"শ্বাসারি সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূর হইবে, গলার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ আঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালক-বালিকাদিগের অণুকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড়্ ঘড়্ করা, বুকে শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতি রোগ দুইদিনে কমিবে।

যতদিনের হাঁপানি হউক না কেন, এই ঔষধ দুই সপ্তাহ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার শ্বাস; যথা—মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমকশ্বাস ও ক্ষুদ্রশ্বাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শ্বাস ও তদনুষাঙ্গিক যাবতীয় উপসর্গ অর্থাৎ ফুস্ফুসে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, উদরে, মেরুদণ্ডে বেদনা প্রভৃতি উপশমিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই রোগী সুস্থ ও সবল হইবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি, অবিরত কাসিতে কফ ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহ মধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন। ১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৷৷০ আট আনা, মোট ২৲ টাকা পড়ে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৬ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার; কলিকাতা।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

নবম ভাগ—নবম বর্ষ।

১৩১২ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভক্তিরত্ন)

কলিকাতা ;

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

নবম বর্ষ { আলোচনা সন ১৩১২ সাল } প্রথম সংখ্যা।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ। } বৈশাখ, সন ১৩১২। { প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষ।

নববর্ষ এস এস, মানস মন্দিরে বস,
এস, এস হে অতিথি নব আগন্তুক।
এসেছ কা'দের সঙ্গে, ওরা কি রহিবে বঙ্গে,
ওরা যেন চে'ন চে'ন সুখ আর দুঃখ।
কি ভাবে ভ্রমিবে ওরা, সমগ্র বিশাল ধরা,
কেমনে ভেটিবে ওহে বল উহাদের।
বড় সাধ তোমা ধনে, সাজাইব সযতনে
বসাইয়ে সিংহাসনে—ক্ষীণ হৃদয়ের।
দোলা'ব ফুলের মালা, গেঁথেছি যা ভরে ডালা,
মালতী মল্লিকা জাতি—প্রফুল্ল কমল।
যে তব সঙ্গের সাথী, তোমা সনে নিতিনিতি,
আসিয়া একেলা ফোটে, আলো ক'রে জল।
নিদাঘে এনেছ সঙ্গে, চন্দন মাখায়ে রঙ্গে,
ব্যজন করিব তাই ধরি সমীরণ।
কাটাতে না পেরে মায়া, দূরেতে বসন্ত ছায়া,
ফাঁক বুঝে উঁকি ঝুঁকি মারে অনুক্ষণ।
গোধূলির অবসরে, এসে সমীরণ ভরে,
কুসুম সুবাস মাখি, ভয়েতে পলায়।
যেন কোন নববধূ, হেরিয়া প্রবাসী বঁধু,
সরমে মরিয়া যায়—লুকাইতে চায়।
তরুলতা ফুলফল, ভূধর কানন জল,
মরি মরি কি সুষমা মাখিয়াছে আজ।
তোমারি পূজার তরে, সেজেছে পুলক ভরে,
খেচর ভূচর সবে ত্যজি নিজ কাজ।
এস নববর্ষরাজ, পরি কমনীয় সাজ,
আশীষ করহ এসে দুর্ভাগা মানবে।
হিংসা দ্বেষ ত্যজি যেন, ধর্ম্মপথে বিচরণ,
করে হে সকলে মিলে, এ মরত ভবে।
হতভাগ্য বঙ্গসুত, মাগে ওহে গুণযুত,
তোমারি আশীষকণা মস্তক পাতিয়ে।
তোমার কোলেতে শুয়ে, দিন যেন যায় ব'য়ে,
কঠিন মরম জ্বালা সংসারে ভুলিয়ে।
জগদীশ পদে যেন, করি আত্ম সমর্পণ,
সাধিবারে পারি এবে হিত সবাকার।
মনের বাসনা মত, কার্য্য করি অবিরত,
অবশেষে তব পদে করি যেন নমস্কার।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাত ফেরৎ ও হিন্দু সমাজ।

সম্প্রতি ময়মনসিংহের প্রখ্যাত যশা স্বদেশবৎসল মহারাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত শর্ম্মা আচার্য্য বাহাদুর স্বীয় কুমারের সহিত বিলাত প্রত্যাগত বারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে একটি নূতন আন্দোলনের স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছেন। অনেকে মহারাজ বাহাদুরের এই কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। অপর পক্ষে অনেকে এই কার্য্যের উপর দোষারোপও করিতেছেন। প্রশংসাকারীগণ মহারাজের এই কার্য্যে অভিনব সমাজ সংস্কারের একটি পথ উন্মুক্ত হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিবাদকারীগণ এতদ্দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের পতন আশঙ্কা করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। এই উপলক্ষ করিয়া দুই চারিটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে বিবেচনায় তদ্বিষয়ে উন্মুখ হওয়া যাইতেছে।

মহারাজ সূর্য্যকান্ত স্বীয় অশেষ সদ্‌গুণরাশি দ্বারা জন-সাধারণের একান্তই শ্রদ্ধাভাজন। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার উৎসাহে পরিপুষ্টা, দরিদ্র সাহিত্যসেবী অশেষ প্রকারে তাঁহার দ্বারা উপকৃত। তদীয় প্রজা সাধারণ তাঁহার সদয়-শাসনে পরিতুষ্ট। রাজদ্বারের সম্মান অপেক্ষা তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের শ্রদ্ধাকেই অধিক বরণীয় বলিয়া মনে করেন এবং স্বীয় কার্য্যকলাপেও তাহাই প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন।

এই পুত্র পরিণয় ব্যাপারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তিই তাঁহাকে অহিন্দু বলিয়া মনেও করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং দেব দ্বিজে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। মহারাজ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরী বংশ বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের সুপরিচিত। এই কারণেই এই বিবাহ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের অনেকে অর্থাৎ বিপক্ষবাদীগণ মহারাজ হিন্দু-সমাজ হইতে চ্যুত হইলেন বলিয়াই আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন। নতুবা অন্য কোন বিপথগামী রাজা বা জমিদারের বিষয়ে এইরূপ ঘটনা হইলে তাঁহাদের সে আক্ষেপ থাকিত না। মহারাজের ন্যায় সহায় হারাইয়া সমাজের বলহানি হইল, এই তাঁহাদের দুঃখ। যাঁহাকে হিন্দুগণ স্বীয় সমাজের গৌরব বলিয়া মনে করিতেন, আজ তাঁহাকে সমাজ হইতে বিচ্যুত করিতে হইতেছে বলিয়া তাঁহারা ক্ষুব্ধ।

এক্ষণে আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে বিপক্ষবাদীগণের এই আপত্তি

কতদূর সঙ্গত। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্তান এবং নিজেও উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিলাত যাত্রা করিয়া তথায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও স্বদেশে আসিয়া তিনি যথা সম্ভব স্বধর্ম্ম পালনে তৎপর আছেন বলিয়া আমরা জানি। মহারাজ বাহাদুরও তদীয় বক্তৃতায় একস্থানে তাহা বলিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যোমকেশ বাবু বিলাত গমন করিয়াছিলেন এই আপত্তি ব্যতীত এই বিবাহে অন্য আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না।

অতএব ইহা প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে এই আপত্তিটি রক্ষণীয় অথবা বর্জ্জনীয়।

সমাজ পরিবর্ত্তনশীল। সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাকে সম্পূর্ণ স্থিতি-শীল জড় ভাবাপন্ন করিয়া রাখা বোধ হয় অসম্ভব। উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের এই সনাতন হিন্দু সমাজেরও যদি আভ্যন্তরিক অবস্থা পূর্ব্বাপর নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহারও যুগে যুগে নানাপ্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সমাজ শাসনের প্রধান অবলম্বন সংহিতা সমূহের সূত্রাবলী পাঠ এবং তুলনা করিলেও বোধ হয় অনায়াসেই এই সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। এক যুগে যে সব আচার-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে, যুগান্তরে সে গুলির পরিবর্ত্তন, পরিমার্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন হইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাহুল্য বোধে তৎপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল না, যদি কাহারও ইহাতে সন্দেহ থাকে, তবে তাহা জানিতে পারিলে আমরা প্রবন্ধান্তর উপলক্ষে তাহা উত্থাপিত করিব।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণাদিও বোধ হয় এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। তবে একথা স্বীকার্য্য যে হিন্দু সমাজ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল নহেন, যতদিন পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদি স্থায়ী রাখিতে পারা যায় ততদিন হিন্দু সমাজ কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু যখনই সমাজ নেতা তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ দেখিয়াছেন যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে এবং পরিবর্ত্তনেই শুভ ফল সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সে স্থলে তাঁহারা সে পরিবর্ত্তন করিতে, সে বিধির নিষেধ ব্যবস্থা দিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা নানা কারণে অস্মদ্দেশীয় দিগের পক্ষে প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশের উন্নতি, স্বজাতীয় শ্রীবৃদ্ধি, স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ইত্যাদি বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে বিদেশে সমুদ্রপথে গমনের জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, ইহা ভগবদিচ্ছা! কর্ম্মক্রমে আজ কোন কোন

বিষয়ে ইয়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ আমাদের শিক্ষক স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তত্তদ্দেশীয় বিশেষ বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য তদ্দেশে গমন করাও আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই সব দেশের অধিবাসীগণ ভিন্ন কর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও মতাবলম্বী হওয়াতে তথায় যাইয়া বাস করিবার কালে আমাদের হিন্দু শাস্ত্র সম্মত আচার ব্যবহার হইতে কোন কোন বিষয়ে বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নহে। আবশ্যক স্থলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রও শপচাধমের অন্ন গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সুতরাং সেরূপ স্থলে অস্মদাদিরও স্বধর্ম্মানুযায়ী আচার হইতে কিঞ্চিৎ ভ্রংশ বোধহয় মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত। স্বদেশে হিন্দু নামধারী এমন কি অনেক মহাত্মা নাই, যাঁহারা বিজাতীয় ভোজনাগারে বিজাতীয় যবনান্ন ও অন্যান্য নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করিয়াও হিন্দুত্ব হইতে স্খলিত হন নাই? সমাজ কি সেরূপ সমস্ত ব্যক্তির সংবাদ রাখেন না?

কেহ কেহ এতদুত্তরে বলেন যে ঐরূপ ব্যক্তিরা যদিও এই সব নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা সমাজকে ভয় করিয়া চলেন এবং সেই জন্যই সমাজকে লুকাইয়া গোপনে এই সব আচরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপনে কি করিতেছে না করিতেছে সমাজ তাহা দেখিবেন না; ব্যক্ত ভাবে কে সমাজের শাসন অমান্য করিতেছে তাহাই সমাজ দেখিবেন এবং তদনুসারেই তাহার দণ্ড প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিবেন। আচ্ছা ভাল কথা;—এরূপ স্থলেও বোধ হয় যাঁহারা স্বীয় জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদেশগামী হইয়া জীবন ধারণের জন্য (আমোদ উপভোগের জন্য অথবা বানরী বৃত্তি অবলম্বনের জন্য নহে) স্বধর্ম্ম বিগর্হিত ভোজ্য পানীয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন অথচ স্বদেশে আসিয়া স্বীয় সমাজের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন এবং সমাজ কোন দণ্ড দিতে চাহিলে তাহাও গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন, তাঁহারা কি অধিক সহানুভূতির, অধিক দয়ার যোগ্য পাত্র নহেন? আমি স্বদেশে স্বজাতির মধ্যে থাকিয়া জঘন্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সমাজ ও ধর্ম্ম শাসনকে অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ খাদ্যাদি ভোজন করিতেছি, আমি সমাজের নিকট অঙ্গুলীর অন্তরালে থাকিয়া নির্দ্দোষী রহিলাম, আর অপর ব্যক্তি মহদুদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাধ্য হইয়া এইরূপ আচরণ করিল সে সমাজের ক্ষমার্হ হইল না?

এ সময় যদি প্রকৃত পক্ষে সমাজনেতৃগণ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন; যদি হিন্দু রাজন্যবর্গ দ্বারা সমাজ নিয়মিত হইত, হিন্দু-নরপতির যদি সমাজ-পতিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় এই আবশ্য-

ক্ষীয় বিধানটির ব্যবস্থা এত দিন সমাজে প্রণীত ও প্রচলিত হইয়া যাইত। শাস্ত্রদর্শী জগৎ-হিতব্রত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশ ও স্বীয় সমাজের এই কল্যাণকর সমুদ্র গমন ও পাশ্চাত্য দেশে অধিবাসের বিষয় কোন একটা বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া দেশের ও সমাজের মঙ্গলের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের আজ সে অবস্থা নহে। এখন সমাজ নামে মাত্র পর্য্যবসিত। হিন্দু সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব নাই ইহা সত্য এবং আমরা এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিধি নিষেধের উপর আস্থাবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই বিষয় লইয়া ঐক্য মত দেখা যায় না। আমার যতদূর ধারণা তাহাতে বোধহয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সকল সময়ে আমরা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করি না। যদি স্বমত পোষক ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আমরা তাহা লইয়া একটা মহা কলরব করিতে পারি বটে কিন্তু স্বমত বিরোধী প্রস্তাব হইলে তখন আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের উপর শ্রদ্ধার অভাব হইয়া তাহাদের এত তীব্রশ্লেষ, তাঁহাদের শাস্ত্র জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি প্রদর্শন প্রবৃত্তিই প্রবলা হইয়া উঠে। এই সমুদ্র যাত্রা ও ম্লেচ্ছদেশাধিবাসের স্বপক্ষে যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা না পাওয়া গিয়াছে এমত নহে কিন্তু যে সব পণ্ডিত ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষের তীব্র সমালোচনাও কম ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাতে আমাদের শাস্ত্রের বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না বলিলে বোধ হয় দোষের হয় না।

আমরা দেখিতেছি—বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে এইরূপ বিলাত প্রত্যাগত বিজ্ঞজনকে সমাজ গ্রহণ করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ সুধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত কথোপকথন করিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহারা এই পুনর্গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহারা "গতানুগতিক ন্যায়" অবলম্বন করিয়া চলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া মনে করেন, বিষ্ণুশর্ম্মার অমূল্য উপদেশের (ন গণস্যা গ্রতো গচ্ছেৎ) অবমাননা করিয়া ইহলোকে লোকের দন্তরুচি কৌমুদি উদ্ভাসিত করিতে চাহেন না। সমাজে যে সমস্ত পাষণ্ড ও বিদ্রোহীর স্থান রহিয়াছে, তাহাদের তুলনায় এই সমস্ত জ্ঞানলিপ্সু ভদ্রগণ বহু প্রকারেই শ্রেষ্ঠ এবং সমাজে গৃহীত হইলে তাঁহারা সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ হইতে পারেন, এ কথাও অনেকেই স্বীকার করেন।

আমরা বলি যে এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজের এই সমুদয় সুশিক্ষিত ব্যক্তির সম্বন্ধে পুনর্গ্রহণের একটা ব্যবস্থা প্রচলিত করা একান্তই কর্ত্তব্য। আজকাল এই জ্ঞান বিজ্ঞানের দিনে যদি বিদেশে গমন পূর্ব্বক

বৈদেশিক শিল্প বিষয়ে নানা বিষয়িণী অভি-জ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া স্বদেশে আসিয়া দেশীয় শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারা যায় তাহা হইলে সেই কল্যাণকর বিষয়ে মত প্রদানে ইতস্ততঃ করা একপ্রকার সমাজদ্রোহ বলিয়া আমরা মনে করি।

যদি সমুদয় ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের উদ্যোগে শাস্ত্রদর্শী অভিজ্ঞ পণ্ডিতকুলপতি-গণের প্রতিনিধিত্বে একটি বিরাট সভা আহূত হইয়া তথায় এই বিষয়ের যথাযথরূপে বিচার করা হয় এবং সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি তাঁহা-দের ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হয় এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বদেশের কল্যাণকামী শাস্ত্রকর্ত্তাগণ কখনই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বজাতিবৎসল বিদেশীয় জ্ঞানপুষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিদেশীয় জ্ঞানার্জ্জন অপরাধে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মও এই সমস্ত সন্তানগণকে স্বীয় মতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে আপত্তি করিতে পারেন না।

তবে এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে এই সমুদয় বিলাত প্রত্যাগত মনিষীগণের অন্তঃকরণে হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজশাসন মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি থাকা একান্তই আবশ্যক।

তাঁহারা যদি স্বধর্ম্মে ও স্ব সমাজে প্রবিষ্ট কাম হইয়াও খাদ্য পানীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে উচ্ছৃখলতা এবং সমাজ ও ধর্ম্ম-রীতি-নীতির পরিবর্ত্তে নিজ স্বাতন্ত্র্যই প্রচলিত রাখিতে ইচ্ছা করেন এবং তত্তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য ও অবহেলা করেন, তাহা হইলে সমাজ তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীরে আর এক নূতন ব্যাধির সৃষ্টি করিবেন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে লাভবান্ হইবেন বলিয়া আমরা বোধ করি না।

যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত হইয়া জাতি-ভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা মানিতে চাহেন না, মানবমাত্রেরই স্পৃষ্ট ও পক্ক খাদ্য পানীয় যাঁহারা অবাধে গ্রহণ করিতে যত্নশীল, তাঁহা-দের পক্ষে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাদের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতিই রহিয়াছে। তত্তৎ সমাজে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি আস্থাবান্, তাঁহাদের সম্বন্ধেই আমরা এত কথা বলিতেছি। যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত হইয়া নিজ সাহেবীয়ানা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় পরিচ্ছদ ও ভাষা-কেই আদর করিয়াছেন, যাঁহারা রহিম চাচার হস্তপক্ক কুক্কুটাদি ভোজ্যে বীতস্পৃহ এবং সর্ব্বপ্রযত্নে হিন্দু আচার ব্যবহার পালনে যত্ন-শীল, তাঁহাদের জন্য হিন্দু সমাজের একটা ব্যবস্থা স্থির করা একান্তই প্রয়োজন। এখন সমাজ তাঁহাদিগকে লইতে চাহেন না বলিয়া

অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বাবুর্চ্চি রাখিতে হইয়াছে, কিন্তু সমাজ তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিলে আর তাঁহাদের ঐ প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিবে না।

অনেক ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সমুদ্র জলের সহিত পরিচিত না হইয়া ত বাহ্যত হিন্দু পরিচয় দিয়া এবং হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশিয়া থাকিয়াও যে প্রকাশ্যে বাবুর্চ্চির হাতে খানা খাইতেছেন, সাহেবদের টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন, সমাজ তাঁহাদের এই উশৃঙ্খলতা, এই অবহেলা কি ভাবে দেখিতেছেন তাহা কি বিবেচ্য নহে? ইহা কি সমাজকে সম্মান করার চিহ্ন? তবে যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন তাঁহাদের অপরাধ কি এতদপেক্ষাও গুরুতর?—আমরা তাহা মনে করি না।

আমার যতদূর স্মরণ হয়, বোধ হয় পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তদীয় "সামাজিক প্রবন্ধে" এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে সমাজে পুনর্গ্রহণই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মনীষী ব্যক্তির মত উপেক্ষণীয় নহে।

অতএব আমাদের বিবেচনায় মহারাজ সূর্য্যকান্ত স্বীয় পুত্রকে বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দু ধর্ম্মানুরক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া স্বীয় নৈতিক বল ও সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন এবং সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষায় একটি নব সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি স্বধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের প্রশংসা পাইবার যোগ্য। দেশের কৃতবিদ্য প্রতিপত্তিশালী মহাত্মাগণ যদি এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন, এবং মহারাজকে সমাজদ্রোহী মনে না করিয়া সমাজের প্রকৃত মিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই বোধ হয় প্রকৃত কার্য্য করা হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপে সমাজ স্বীয় উপযুক্ত সন্তানগণকে পুনর্গ্রহণ করিলে ক্রমেই সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং ধর্ম্মেরও গৌরব ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আমাদের স্থান সংক্ষিপ্ত, এজন্য অদ্য এই স্থানেই বিরত হইতে হইল। আবশ্যক বোধ করিলে ভবিষ্যতে এতদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

কবিরাজ ৺নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত

শোকগীতি।

নীরব হয়েছে আজি চিরতরে বীণাতান,
কাকলী-মুখর-পিক, ছাড়িয়া দিয়াছে গান।
সুহাস-রজত-শুভ্র-কৌমুদীর সুপ্ত ছায়া,
যেন গো মিলায়ে গেছে তিমিরে ঢাকিয়ে কায়া

বিষণ্ণা প্রকৃতি বালা নীহার-নিসিক্ত হ'য়ে,
যেন গো কাঁদিছে এবে নেত্রাসার বরষিয়ে।
কেন গো কেন গো আজি কি গভীর বেদনায়—
ঝিল্লি-মন্দ্র-মুখরিত-নিশিথীনি কাঁদে হায়?
নিদাঘ-প্রকৃতি জাত রক্তিম-প্রবাল-দল
রহিয়াছে অধোমুখে,—আঁখি যেন ছল ছল।
বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি তোমার বিরহে আজি,
নূতন বরষমুখে নব আভরণে সাজি'—
সলজ্জা স্বভাব-সতী তব গুণরাশি স্মরি'।
তাই বুঝি কিছুতেই সুষমা নাহিক হেরি?

শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবনে মরণে।

এ জীবনে আর কোন সাধ নাই মোর
হে কল্যাণি, মনোরাণি! শুধু মন ডোর
বাঁধা থাক্ দু'জনার! নীরব নিক্কণ
জেগে থাক্ দু'অধরে। তৃষিত-নয়ন
থাক্ চির তৃষাতুর। অনুভবে হোক্
তোমাতে আমাতে শুধু অন্তরে সম্ভোগ।
তার পর একদিন বিশ্রব্ধ সন্ধ্যায়
বিশ্রান্ত পাখীর ন্যায় ফিরিব কুলায়
পশ্চিম গগনে;—দূরে হের রবি-রেখা!
আমার নয়নে যেন হয় সখি দেখা
তোমার নয়ন! মূর্ত্তিময়ী রূপে আসি'
একটী চুম্বনে দিও দুই চক্ষু ভাসি।
আমার বুকেতে যেন তোমারি চরণ
পড়ে থাকে!—তারপর আসুক মরণ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

তৃপ্ত।

দূরে থাক সুখে থাক'
দেখ আর নাই দেখ,
তাই ভাল,—তাই ভাল সখা।
ছিঁড়ে যাক্—ভেঙ্গে যাক্
মন প্রাণ,—তবু থাক্
না'ই হ'ল—না'ই হ'ল দেখা।
কেন দিব—কেন হব—
সুখে বাধা,—ব্যথা তব,
তা'তে মোর কিবা অধিকার?
এই ঢের—এই বেশী—
আমারে যে ভালবাসি
দেহ তব বিন্দু প্রেমধার।

অতৃপ্ত।

আরো দাও—খুব দাও
যত পার ঢেলে দাও
এ তৃষিত পরাণে আমার;
ছেড়ে' দাও—খুলে' দাও—
খুঁজে-নিক্-পরে যাও
বাকি যদি থাকে কিছু আর।
বুঝে নাই—শিখে নাই
ভাবিয়াছে বুঝি তাই
ছলিয়াছি—ভুলায়েছি তারে,
আরো আছে—তাই নাকি
দেই নাই, আছে বাকি—
খুঁজে নিক্ যদি নিতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

সোণার পারিজাত।

উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সে কই?"—জনকোলাহল ভেদ করিয়া একটি যুবকের ভগ্নতার-বীণার ন্যায় রুদ্ধকণ্ঠ হইতে হতাশ-ব্যথিত সুদীর্ঘ স্বর উঠিল,—"সে কই?"

কে সে?—যুবকের স্ত্রী সোণামুখী। সোণামুখী পূর্ণ যুবতী—রূপে জ্যোৎস্নার শীতল মাধুরী,—জ্যোৎস্নাশীতল নৈশ কুসুমের হৃদয়-হারিণী প্রভা উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছিল।

যুবকের নাম নীলরতন রায়,—জাতি ব্রাহ্মণ, নিবাস যাদবপুর গ্রামে।

কুক্ষণে সেবার অর্দ্ধোদয় যোগ দেখা দিয়াছিল;—এই অর্দ্ধোদয় যোগে বাঙ্গালার অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক নানাপ্রকারে বিপন্ন, রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায়, পথে, ঘা'ট, সর্ব্বত্রই গঙ্গাস্নানার্থী মানবগণের বিপুল স্রোত। নৌকা, অশ্বযান, গোযান সমস্তই দুষ্প্রাপ্য—বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছিল। রেল গাড়ীতে আরও জনতা—সরিষা ফেলিবার স্থান ছিল না। যে গাড়ী দেখ, সেই গাড়ীতেই লোকে লোকারণ্য; কেহ ঠেলিতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ কাহারও চরণভরে নিষ্পেষিত ও বিদলিত হইতেছে;—আবার কেহবা উপর হইতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করিতেছে। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ কেহ বা কুব্জভাবে, কেহ কেহ বা উত্তানভাবে অবস্থিত। কেহ বসিতে গিয়া নিম্নভাগের লোকের ঠেলা খাইয়া উঠিতে যাইতেছিল,—এবার উপরের লোকের গুঁতা লাগিয়া আর উঠা হইল না—কাজেই মাঝামাঝি ভাবে থাকিতে হইল। কোলের ছেলে নিষ্পেষণে কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল,—কামিনীর কোমল কায় কঠোর কর-পীড়িত হইয়া ঘামিতেছিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঠেসাঠেসির জ্বালায়—কেহ হেলিয়া, কেহ ঢুলিয়া, কেহ বাঁকিয়া মুখ সিট্‌কাইয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতেছিল।

তার উপরে আবার মারামারি—গালাগালি—হুড়াহুড়িও যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল।

গাড়ীর মধ্যেকার কথা এই,—তদ্ভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনে হয়ত তিনদিন পর্য্যন্ত টিকিট করিয়া কত নরনারী বসিয়া আছে—গাড়ীতে লোকের স্থান আর হয় না, কাজেই যাওয়াই ঘটে না। বাজারের পচা-ধসা দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতেছে, আর ষ্টেশনের সেই অল্প স্থানে বহুলোক একত্রে জমাট পাকাইয়া একটা কোলাহল তুলিতেছে—এবং মধ্যে মধ্যে রেল বাবুদের ডাকে, হাঁকে, স্বগর্ব্ব-স্ফীত পদক্ষেপে ও যুবতীগণের প্রতি কটাক্ষপাতে আপ্যায়িত হইতেছিল। একখানা গাড়ী আসিতেছে, দূর হইতে তাহার ধূম দেখিবামাত্র হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মোট, বোঝা, গাটরী, টানিয়া প্লাটফরমে গিয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে, হতাশ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে,—তিল ধারণের স্থান নাই লোকের উপরে লোক চাপিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার তথা রেলের টীকটাকিটি পর্য্যন্ত প্রভূ-ত্বের গর্ব্বোন্নত মস্তকে দুই একবার ডাক হাঁক করিয়া, দুই একজনকে প্রবেশ করাইবার ছলে, গাড়ীর মধ্যস্থা দুই একটি ভদ্রমহিলার উপরে জুলুম করিল, কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রায় হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল, কেন না, তাহা-দের সঙ্গী পুরুষগণ আস্তেন গুটাইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। গাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, আবার সকলে দ্রব্যাদি টানিয়া লইয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রেলগাড়ী ছাড়িয়া পথে চল,—ঐ এক-রূপই দৃশ্য! কেবল জনস্রোতের বিশাল প্রবাহ। দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কারণে বঙ্গের রুদ্ধগৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অথবা কোন কারণে বঙ্গের সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাই আজ মাতা, পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী, পৌগণ্ডবিরাগোগণও সকলে ছুটিয়া চলি-য়াছে। দোকানীগণ বহুদিনের সঞ্চিত পচা ধসা দ্রব্য চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে, ঘোষানী দুগ্ধভাণ্ড হাতে করিয়া জল বোচয়াই পয়সা লইতেছে। গ্রামের মধ্যে বাজারের সরাইয়ে এত লোকের স্থান কোথায়? অসূর্য্যম্পশ্যা কুলের বধু ধানের ক্ষেতের পাশে মামাশ্বশুরের সম্মুখে বসিয়া চিড়া ভিজাই-তেছে—বৃক্ষতলে শয়ন করিতেছে। এইরূপ সর্ব্বত্র—এইরূপ সাধারণ ব্যবস্থা।

যেখানে সেখানে পূতসলিলা ভাগীরথী অবস্থিতা—সেই সেই স্থানে লোক আসিয়া পূর্ণ হইতেছে। গ্রামের লোকের আহারাভাব ঘটিয়া উঠিয়াছে। মৎস্য, তরকারি, দধি, দুগ্ধ দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও পাইবার উপায় নাই। চিনি মিশ্রী একবারেই দুষ্প্রাপ্য। সে যাহা হউক,—এত জনতায়, এত গোলযোগে সর্ব্ব-

ত্রই ভীষণ বিসূচিকা-ব্যাধি করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। যাত্রীগণের মধ্যে মড়ক লাগিয়া গিয়াছিল। জননী হয় ত পুত্রকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন,—স্নেহাধার নয়নমণি পুত্রকে কালের কোলে ডালি দিয়া পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। সতী হয় ত পতি-পতিসহ "যোড়ে গঙ্গাস্নান" করিতে আসিয়াছিলেন,—শেষে জন্মের মত যোড় ভাঙ্গিয়া সিঁতের সিন্দূর মুছিয়া নয়নজলে বক্ষবিধৌত করিতে করিতে উদাস-প্রাণে হতাশ বিহ্বল-চিত্তে বাড়ী চলিলেন। ভগিনী ভ্রাতা হারাইলেন, ভ্রাতা ভগিনীকে চিতার আগুণে ভস্ম করিয়া দেশে গমন করিলেন। পথে, ঘাটে মাঠে সর্ব্বত্রই মড়ক—সর্ব্বত্রই হাহাকার!

আরও উপসর্গ আছে। এই অর্দ্ধোদয় যোগে চোর, জুয়াচোর ও দস্যুগণের পূর্ণ সুযোগোদয় হইয়াছিল। ভীষণ জনতায় কাহারও অর্থ শুদ্ধ পকেট অদর্শন হইতেছে, কাহারও গাঁটরী অপহৃত হইতেছে, কাহারও ব্যাগ বা বাক্স হারাইয়া যাইতেছে। অনেক যুবতী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছে—অনেকস্থলে অনেক প্রকারের কুকার্য্য সংঘটিত হইয়া যাইতেছে।

নীলরতন রায়, তাঁহার মাতা এবং স্ত্রী সোণামুখীকে লইয়া অর্দ্ধোদয়ের পবিত্র যোগে গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটী আগমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে গ্রামস্থ ভদ্রাভদ্র স্ত্রীপুরুষে আরও দশ বারজন ছিল।

সন্ধ্যার পরে যখন তাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় ফিরিতেছিল, সেই সময়ে গঙ্গাতীরে ভারি একটা জনতা হইয়া উঠিয়াছিল,—কেন সহসা এত জনতা, এত ভিড়, এত ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, পেশাপেসি, মিশামিশি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, মারামারি হইল, তাহার কারণ কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিল না। একটি বৃদ্ধা গঙ্গাস্নান করিয়া যাইতেছিল, এই ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া মানব-চরণ-দলিত হইয়া সে গঙ্গালাভ করিল। লোক সকল প্রহার খাইয়া,—দলিত ও পিষ্ট হইয়া, ঘামিয়া ব্যথা পাইয়া বাহির হইল,—কিন্তু কোথায় গিয়াছে দলস্থ কে কোন দিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, কে কোথায় রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

নীলরতনের দলও এইরূপ বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন,—নীলরতন বলিষ্ঠ যুবক, কিন্তু বল-প্রয়োগে তিনি হুঁচোট খাইয়া একধারে পড়িয়াছিলেন,—কোন্ একটা প্রবল শক্তি যেন তাঁহাকে ধাক্কা মারিয়া তাঁহার দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। জনতার বেগ একটু মন্থর হইলে, তিনি তাঁহার দলস্থ সকলকে অনুসন্ধান করিলেন,—সকলকেই একস্থানে একত্রে সাক্ষাৎ পাইলেন। কিন্তু "সে কই?"

কে সে? নীলরতনের স্ত্রী সোণামুখী। সোণামুখী কোথায়?

নীলরতনের হৃদয়-তন্ত্রী অতি দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল,—ছুটিয়া আবার সেই মন্দীভূত বিচ্ছিন্ন জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। চারিদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সে কই! সোণামুখী কোথায়?

যেখানে মাতা ও অন্যান্য সকলে দাঁড়াইয়াছিলেন, নীলরতন তথায় ফিরিয়া আসিলেন, মনের আশা হয় ত এতক্ষণ সোণামুখী তথায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে! উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সোণামুখী সেখানেও নাই।

নীলরতনের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সহসা, সোণামুখীর অন্তর্ধানে তাহার বক্ষপঞ্জর ধসিয়া যাইতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলিলেন, "সে কই?"

"সে কই?—বৌমা কোথায়? ওগো, তোমরা আমার লক্ষ্মীমাকে খুঁজিয়া দেখ, আর আমার কি হ'ল—সে আমার কোথায় গেল!" নীলরতনের জননী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গীগণের মধ্যে আরও তিন চারি জন ভদ্রলোক এদিক ওদিক ছুটিলেন। ইহার আগেই নীলরতন অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গমন করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন—সোণামুখীর সন্ধান কোথাও মিলিল না। নীলরতনের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, সঙ্গের স্ত্রীলোকগণও হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন; নীলরতনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন পরামর্শ স্থির হইল, স্ত্রীলোকদিগকে বাসায় রাখিয়া, পুরুষগণ চারিদিকে সোণামুখীর অনুসন্ধানার্থ বাহির হইবে।

তাহাই হইল। সকলে বাসায় গমন করিলেন,—কেবল নীলরতন গঙ্গার তীরে তীরে ছুটিয়া ছুটিয়া সোণামুখীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তৎপরে থানায় গিয়া সংবাদ দিলেন, এবং গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে, বাজারের প্রত্যেক দোকানে দোকানে, যাত্রীদিগের প্রতি বাসায় বাসায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

নীলরতন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত,—রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত। সমস্ত স্থান ঘুরিয়া যখন কোথাও সোণামুখীর সন্ধান মিলিল না, তখন তিনি আবার গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। মুখে কোন কথা নাই, শুধু এক একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল।

গঙ্গাতীর তখন কতকটা জনশূন্য—নিস্তব্ধ। যাত্রীগণ সকলেই বাসা লইয়াছে। কল্ কল্ স্বন্ স্বন্ শব্দে ভাগীরথী-প্রবাহ বহিয়া চলিতেছে। দূরে দূরে পালতোলা নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, কতক বা তীরে বাঁধা রহিয়াছে। শেষরাত্রির প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি গঙ্গার নির্ম্মল

সলিলে আপন আপন রূপের ছটা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

নীলরতন গঙ্গার তীরে তীরে সোণামুখীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাসের ব্যথিত স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"সোণামুখি, প্রাণের সোণামুখি!—তুমি আমার কোথায়?"

কেহ উত্তর দিল না। কেহ সে কথা শুনিল না। করুণহৃদয়া প্রতিধ্বনি একবার সে কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল, আর গঙ্গার বক্ষ দিয়া বায়ুপ্রবাহ হাহাস্বরে সে স্বর বহিয়া বৃক্ষশাখা তাপিত করিয়া দিয়াছিল। নীলরতন বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "সোণামুখী—যাহাকে না দেখিলে একদণ্ডও বাঁচিতে পারি না—যে আমার জীবনের ধ্রুবতারা—সে কোথায় গেল?—আমার সে কই?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল;—পূর্ব্বদিক্‌ভাগে হৈমকিরণছটা বিকীর্ণ করিয়া দিনদেবের সমুদয় হইল। বিহঙ্গকূজনে, যাত্রীদিগের কলরবে, দোকানদারগণের আয়জিনিষের প্রশংসাবাদে সমস্ত গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজি যাত্রীগণ বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, তাই সকাল সকাল গঙ্গাস্নান করিয়া লইতেছে; প্রভাত হইতেই সকলে স্নানার্থী হইয়াছে,—কেহ স্নান, করিতেছে, কেহ স্নান করিয়া উঠিয়া স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগানন্তর শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিতেছে। আগ্রীব নিমজ্জমানা কুলবধূগণ উপরে শতদল ভাসিতেছে। সমস্ত রাত্রি বিলাসিনীর বিলাসকুঞ্জে কাল কাটাইয়া মদিরা আঁখির কামকটাক্ষ লইয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন, বর্ণজ্ঞানশূন্য "হঠাৎ পুরোহিতগণ" যজমান খুঁজিয়া লইয়া মন্ত্রপাঠ করাইতেছে। সহসা শুনিলে, তাহারা সংস্কৃত কি আরবী অথবা পার্সীভাষা পড়াইতেছে, তাহায় কিছুই বুঝা যায় না।

হায়, বেদমন্ত্র! আজি তোমার কি দুর্দশা! একদিন তুমি উদাত্তাদি স্বর সংযোগে প্রজ্ঞাশীল ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া, দিক্‌বধূকে আকুল করিয়া তুলিতে, আর আজ তুমি "ক"-অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিত সূচিভাজা বামুনের বিকৃতকণ্ঠ হইতে ভগ্নপদ চূর্ণীকৃতভাবে উচ্চারিত হইতেছ! দোষ তোমার নহে, আমাদের,—আমাদের হিন্দুসমাজের, আমরা সব হারাইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও হারাইয়াছি—কিন্তু তোমাকে হারাইয়াছি বলিয়াই, আমরা অধঃপাতের গুহায় এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছি!

নীলরতনের গ্রামের সকলেও বাড়ী যাই-

বেন। নীলরতন সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এই মাত্র ভগ্নহৃদয়ের ব্যথাটুকু লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঘোর লোহিতরাগে রঞ্জিত, উদাস-বিস্ফারিত।

নীলরতনের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! আমার বৌমা কোথায়?"

নীলরতনের চক্ষু দিয়া স্রোত বহিল। গলা ঝাড়িয়া, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আর তাহাকে পাইলাম না। বুঝি এ জন্মে আর পাইব না।"

মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো, আমার কি হ'ল! আমি কি আমার গৃহলক্ষ্মীর স্বর্ণ-প্রতিমা গঙ্গার বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিলাম! আর কি মার সেই স্নেহ-ভক্তি মাখান সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইব না? আমি কেমন করিয়া কি বলিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইব?"

নীলরতন বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা নীলরতন বুঝিতে পারিলেন না। বুঝি, মাতার ক্রন্দনে সেই ব্যথিত হৃদয়ে আরও বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়াই নীলরতন উঠিয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের সহযাত্রী রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "নীলরতন! আর শোক করা বৃথা। সকলই ভগবানের ইচ্ছা—যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। দেখিতেছ না, কত লোক মরিয়া যাইতেছে,—মনে কর, তোমার স্ত্রীও মরিয়া গিয়াছেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নীলরতন বলিলেন, "ব্যায়রাম হইয়া আমার কোলের উপরে মাথা রাখিয়া, যদি সোণামুখী মরিত, গঙ্গাতীরে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিতাম—এ ত তাহা নহে। তাহাকে কোথায় রাখিয়া চলিলাম, কাহার করে ডালি দিয়া গেলাম! কি বলিয়া মনকে বুঝাইব? হা ভগবান! না জানি, সে আমার কি বিপদে পড়িয়া কোথায় হাহাকার করিতেছে!"

রাম। তা আর কি হবে বল। এখন বাড়ী যাওয়া ভিন্ন আরও কোন উপায় দেখিতেছি না।

নীল। আজিকার দিনমানে একবার ভাল করিয়া খুঁজিতে যাইতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া সহযাত্রীগণের মধ্যে কেহ বলিলেন, আজি আর আমাদের খোরাকি নাই; কেহ বলিলেন, এ বেলা থাকিতে হইলে গাড়ীর ভাড়ার পয়সা খাইয়া ফেলিতে হইবে; কেহ বলিলেন, আমার শরীরটা বড়ই খারাপ হইয়া উঠিয়াছে—যেরূপ মড়ক, বাড়ী পঁহুছিতে পারিলেই বাঁচি। কোন স্ত্রীলোক বলিলেন, আমার বোনের ছেলেটিকে না দেখিয়া, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না; কোন কামিনীর

একটি লাউগাছ আছে, পাছে সেটা পাড়ার চোখ্‌খাগীদের গাভীকর্তৃক ভক্ষিত হয়, এই মহদাশঙ্কা জানাইয়া, থাকিবার একান্ত অসম্ভাবনা বিজ্ঞাপিত করিয়া দিলেন; কোন সঙ্গিনী বলিলেন, রায়দের নূতন জামাই আসিবার কথা আছে, জানই ত, বৌমা তার মেয়ের বরকে লইয়া আমোদ-পমোদের ভার আমার উপরই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন—কাজেই আমার আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করা নিতান্ত হৃদয়হীনার কার্য্য হইবে।

নীলরতন বলিলেন, "যদি তোমাদের থাকিবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমার শোকার্ত্তা মাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমি রাত্রির গাড়ীতে যাইব এখন।"

মাতা যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন। বলিলেন, "আমি কোন্ প্রাণে বাড়ী ফিরিব?".

রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দিনের গাড়ীতে বড়ই ভিড় হইবে—কোন মতেই তাহাতে যাওয়া যাইবে না। কতক যাত্রী চলিয়, গেলে, আমরা রাত্রির গাড়ীতেই যাইব।"

তখন বিনা ওজরে সকলেই তাহাতে স্বীকৃত হইল, এবং রন্ধনাদির উদ্যোগে মনঃসংযোগ করিল।

রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, নীলরতনকে সঙ্গে লইয়া সোণামুখার অনুসন্ধানার্থ বাহির হইলেন। প্রথমেই তাঁহারা গিয়া থানার উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গাস্নানের যাত্রী-জনতা হইবে জানিয়া, মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াছিলেন। ক্যাম্প হইতে তিনি তখন থানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। দারোগাবাবুর সঙ্গে ঐ বিষয়ক কথোপকথনই হইতেছিল—এমন সময় নীলরতন ও রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলরতনের চেহারা দেখিয়াই সহজে প্রতীয়মান হইতেছিল যে, এ ব্যক্তি কোন প্রকারে বিপন্ন হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে?"

নীলরতন বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "সাহেব! আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

ম্যা। তোমার কি প্রকার সর্ব্বনাশ হইয়াছে?

নীল। কা'ল সন্ধ্যার পরে, আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম, সেই সময় গঙ্গাতীরে ভারি একটা জনতা হয়, আমরা সেই ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম—অনেক কষ্টে বাহির হইয়া দেখি, আমাদের একটি স্ত্রীলোক নাই। তার পরে কত খুজিয়াছি, কিন্তু আর তাহার সন্ধান পাইলাম না।

ম্যা। সে স্ত্রীলোক তোমার কে হয়?

নীল। আমার স্ত্রী।

ম্যা। বয়স কত?

নীল। ষোল সতের হইবে।

ম্যা। তোমার সন্তানাদি হইয়াছে?

নীল। না।

ম্যা। হাঁ, হুজুর;—কা'ল সেই সময় হইতেই আমি গঙ্গার তীরে তীরে—গ্রামের মধ্যে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী, বাজারে যাত্রীগণের আবাসে আবাসে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—কিন্তু কোথাও সন্ধান পাই নাই।

ম্যা। থানায় এজেহার করিয়াছিলে?

নীল। হাঁ—কালই দারোগাবাবুর নিকটে এজেহার করিয়া গিয়াছিলাম।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব দারোগাবাবুর নিকটে "দৈনিক লিপি" পুস্তক চাহিলেন। দারোগা তাহা আনিয়া সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। পাঠ করিয়া সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি দংশন করিতে করিতে বলিলেন,—"শুধু উহার স্ত্রী নহে! একই সময়ে আরও একটি নবম বর্ষীয়া বালিকা অপহৃত হইয়াছে।"

দারোগাবাবু কর-কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"হাঁ,—এজেহার করিয়া গিয়াছে। আমরা লিখিয়া রাখিয়াছি।"

ম্যা। কেবল লিখিয়া রাখিয়াই তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ, না সন্ধানাদি কিছু করিয়াছিলে?

দারোগা। আজ্ঞা,—তদণ্ডেই সন্ধানার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু ফল কিছুই করিতে পারি নাই।

সাহেব অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। শেষে একখানা পত্র লিখিয়া দারোগাবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "মোড়ক করিয়া, এখনই ডাকে রওনা করিয়া দাও।

অতঃপর সাহেব উঠিয়া গেলেন। দারোগা বাবু সে পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন। উহা পুলিসের ইনস্পেক্টার জেনারেল সাহেবকে হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—"গঙ্গাস্নানের জনতায় নৈহাটীতে একটি যুবতী স্ত্রীলোক ও একটি বালিকা অপহৃতা হইয়াছে। স্থানীয় পুলিসের এবং তাহাদিগের অনুসন্ধানে কোন ফল হয় নাই। স্থানীয় পুলিসের দ্বারা এই ঘটনার তদন্তে সুফলের আশা করা যায় না। সুচতুর বদ্‌মায়েসগণ কর্ত্তৃক এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। অতএব অগৌণে একজন বিচক্ষণ গোয়েন্দা পুলিসকর্ম্মচারী পাঠাইবেন।"

নীলরতন রামগোবিন্দের সহিত সেখান হইতে বিদায় লইয়া, সমস্ত গ্রামখানি অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সোণামুখীর সন্ধান মিলিল না।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় গাড়ীতে উঠিবার জন্য নীলরতন নৈহাটী পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে তখনও তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া পশ্চাদ্দিকে

চাহিয়া দেখিতেছিলেন,—কিন্তু সে কি আর আসে।

ষ্টেশনে গিয়া নীলরতন গাড়ীতে উঠিলেন। শূন্যপ্রাণে, হতাশমনে নৈহাটীর দিকে চাহিলেন,—সেই দীর্ঘপথ, সেই আম্রবাগান, সেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষ—সকলই রহিয়াছে, আর বুঝি দেখা হইবে না। নীলরতনের বক্ষ ভেদ করিয়া শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ও ব্যথিত হৃদয়ের গভীর কাতরতা সেই সকলের অঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিল, নীলরতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে চলিলেন; এবং বাষ্পীয়যান সগর্ব্বে উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া বাহির হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সুখের সংসার।

(১)

পরিবর্ত্তনশীল অদৃষ্টচক্রের গতি বুঝা ভার। ইহা যে কখন কিরূপ ভাব ধারণ করিয়া ক্রীড়ার পুত্তলী মানবকে হাসায় কাঁদায়, তাহা কে বলিতে পারে। মহামায়া কুলীনের মেয়ে,—বড় গরীব হইলেও এতদিন সে বেশ সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে ছিল, স্বামী-সোহাগে জীবন-মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহার কোনও কষ্ট হয় নাই, সদাই হাস্যরসে প্রমত্তা হইয়া এই দুঃখের সংসারে সুখের খেলা খেলিয়া তিনজনে বেশ একভাবে জীবন কাটাইয়া আসিতে ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে কে কবে চির-সুখ ভোগের অধিকারী হইতে পারিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে মহামায়ার অদৃষ্টনেমী হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার পরম পূজনীয় স্বামী হঠাৎ কাল কবলে পতিত হইল, অভাগিনী মহামায়া জগতের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চির বৈধব্য-যন্ত্রণার অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। মহামায়ার বয়স এখন চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এতদিন স্বামীসুখে কাল কাটাইয়া জীবনের সন্ধ্যাকালে সে ঘোর অন্ধকারে ডুবিল; দুরন্ত কাল তাহার সংসার-সুখাভিনয়ের যবনিকা ফেলিয়া দিল। হিন্দু রমনীর বৈধব্যের তুল্য যন্ত্রণা আর কি আছে। সে জীবিত থাকিলেও মৃত, নিকটে থাকিলেও কেহ তাহাকে ডাকে না, কেহ তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না, তাহার ভাল কাপড় থাকিলেও পরিবার যো নাই, ভ্রমর কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশির সংস্কার করিবার তাহার অধিকার নাই, রূপ থাকিলেও তাহা দেখাইবার যো নাই, সে জগতের একটী প্রান্তে একাকিনী পড়িয়া সেই কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে। সহানুভূতি করিবার লোক এ জগতে তাহার আর নাই, মরিয়া গাইলেও কেহ তাহার প্রতি ফিরিয়া চায় না। হিন্দু বিধবার তুল্য

দুঃখভাগিনী বুঝি জগতে আর কেহ নাই? মহামায়া দরিদ্রের গৃহিণী হইলেও এতদিন সে কিছুই জানিতে পারে নাই। হিন্দু স্ত্রী স্বামী-সুখে সুখিনী হইতে পারিলে, অনন্ত দুঃখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে। স্বামী-সোহাগে থাকিয়া অন্যপ্রকার সহস্র দুঃখকেও হিন্দুরমণী দুঃখ বলিয়া মনে করে না। অন্যান্য জাতীয়া রমণীগণের অপেক্ষা এইটুকুই হিন্দুরমণীর বিশেষত্ব এবং এইজন্যই তাহারা সকলের আদর্শ।

মহামায়ার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পুত্র হইবার বয়স অতীত হইয়াছে দেখিয়া প্রতিবাসিনী সকলেই মনে করিয়াছিল—তাহার আর পুত্রাদি হইবে না, কিন্তু অদৃষ্টে ফল থাকিলে—তাহার অন্যথা হইবার নয়। কিছুদিন পরে তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে একটী কন্যারত্ন লাভ হইয়াছে। এখন শেটের কোলে কন্যাটীর বয়স একাদশ বৎসর—নাম কমলা। কমলা রূপে গুণে বড় মন্দ নহে, তবে তাহার রূপ যে কাঁচা সোণার মত বা স্ফুটন্ত গোলাপের মত ছিল তাহা নহে। যেরূপ থাকিলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহ আলোকিত হয়, যেরূপ থাকিলে কেহ ঘৃণা না করিয়া সকলেই তাহার হাতের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, কমলার রূপ সেইরূপই ছিল। কলিকা প্রস্ফুটিতা হইবার পূর্ব্বে স্বভাবতঃ সতেজ ভাব ধারণ করে। কমলা-কলিকার ফুটিবার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন সতেজভাব ধারণ করিয়া রূপের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এখন দেখিলে তাহাকে রূপসী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ রূপের সহিত তাহার সেই সলজ্জস্বভাবের সংমিশ্রণ হওয়ায় সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপ লজ্জার আবরণে আবরিত হইলে এইরূপ সুন্দর হইয়া থাকে। যাহার লজ্জা নাই, সে পরমাসুন্দরী হইলেও তাহার রূপ মনোনয়নের তৃপ্তিকর হয় না, নির্লজ্জা স্ত্রীলোকের রূপ থাকিলেও তাহার শোভা নাই। রূপের মাধুরী বাড়াইতে হইলে লজ্জাই তাহার একমাত্র উপকরণ।

(২)

মহামায়ার স্বামী ধর্ম্মানন্দ মুখোপাধ্যায় আজ এক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মানন্দ দেশীয় জমীদারের অধীনে সামান্য বেতনের গোমস্তাগিরি চাকুরী করিতেন। যাহা আয় ছিল,—তাহাতে একরূপ কষ্টে সংসার চলিত, তবে মহামায়ার ন্যায় গৃহিণীর গৃহিণীপনায় ধর্ম্মানন্দের সংসারে কোনরূপ অনাটন হইত না। মহামায়া নিজ কার্য্যদক্ষতা গুণে ঐ অল্প আয়েই বেশ গুছাইয়া চলিতেন। দেখিলে সহজে কেহই তাহাদের দরিদ্রতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিত না। ধর্ম্মানন্দ অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল প্রতিপালন করিতেন,

ত্রিসন্ধ্যা ও বিষ্ণুপূজাদি না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অবধি তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই জন্য তিনি ইংরাজী লেখা পড়া জানিলেও সরকারী চাকুরী করিতে পারেন নাই। ধার্ম্মিক ধর্ম্মানন্দ ধর্ম্মকার্য্যেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতিদিন আহারাদির পর অপরাহ্নে তিনি প্রভুর কাজে বাহির হইতেন। ইহকালের জন্য অল্প মাত্র সময় নষ্ট করিয়া পরকালের চিন্তাতেই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিব্রত থাকিতেন। উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি এ কার্য্যে তিলমাত্র অবহেলা করিতেন না। মহামায়াও সে কালের স্ত্রী, ধর্ম্মকর্ম্মে স্বামীর সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংসারে ধর্ম্মকে সহায় করিয়া মহামায়া স্বামী ও কন্যাটীর সহিত একদিনের জন্য কোন কষ্ট পান নাই। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না—চিরসুখ কাহার ভাগ্যে ঘটে না বলিয়া, মহামায়া স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ একবৎসর সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছেন।

বিলাসপুরে তাহার শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর দুহিতাকে লইয়া সেই নিবান্ধবপুরীতে তাঁহার থাকিতে আর মন উঠিল না। এখানে তাঁহার কোন আত্মীয় নাই, যে বিপদে আপদে তাহাদের দেখিবে। বিশেষতঃ কমলা বড় হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না, যেমন করিয়া হউক, এই বৎসর তিনি কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিবাহে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু তাঁহার ত অর্থ নাই, অবশেষে তিনি নিজের বাস্তু বিক্রয় করতঃ দুইশত টাকা মাত্র সংগ্রহ করিয়া পিতৃগৃহ কুমারপুরে আগমন করিলেন। পিতৃকুলে এখন তাঁহার বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠ সহোদর, বধূ ও দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান, ভ্রাতার অবস্থাও তথৈবচ, তিনিও ছাপোষা লোক। তবে হিন্দু হাজার দরিদ্র হইলেও এরূপ নিরাশ্রয় আত্মীয়কে ফেলিতে পারে না। ভ্রাতা রুদ্ররাম ভগ্নিকে আশ্রয় দিয়া নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। হিন্দু যতই দরিদ্র হউক না কেন, তাহারা চিরকাল এ প্রথার অনুমোদন করিবে।

রুদ্ররাম ভগ্নির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"দিদি! তুমি আর শোক করিও না, যদি আমরা দিনান্তে একমুঠা খাইতে পাই, তাহা হইলে কমলাও তুমি বাদ পড়িবে না।

মহামায়া বলিলেন—"ভাই! ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, পুত্রটী তোমার চিরজীবি হউক, চাট্টি ভাতের ভাবনা যে ভাবিতে হইবে না—তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই! এখন কমলার ভাবনাই আমার মহা ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দুইশত

টাকার মধ্যে যাহাতে তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর, এখন ত এ ভার তোমার উপরেই পড়িল, তুমি না করিলে আর আমার কে আছে? রুদ্ররাম বলিলেন—"দিদি! আমি সে বিষয় নিশ্চিন্ত নাই, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, এখন বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেই শুভ কার্য্য সমাধা হয়। এইরূপে ভ্রাতা ভগ্নিতে কমলার বিবাহের বিষয় লইয়া ঘোর চিন্তায় পড়িলেন। দরিদ্র কুলীনের ঘরে কন্যা বড় হইলে, তাহাদের যে কিরূপ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয়—তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

(৩)

পূর্ব্বে আমাদের সমাজে বিবাহের বড়ই বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল। এখন সে নিয়ম অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সমান ঘর ও সৎপাত্র না হইলে বিবাহ হইত না! এখন আর ঘর বর তত কেহ দেখে না। এখন অর্থের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, অর্থ থাকিলে, সে কুলীন না হইলেও কুলীন পদবাচ্য, সে নির্গুণ হইলেও গুনবান। পূর্ব্বে কিন্তু অর্থের জন্য কেহ জাতি মর্য্যাদা নষ্ট করিত না। যে যেমন ঘর, সে সেইরূপ ঘরেই কন্যা সম্প্রদান করিত। দেখিবার মধ্যে দেখিত কেবল পাত্রটীকে; পাত্রটী সৎপাত্র হইলেই তখনকার লোক কন্যা সম্প্রদান করিতে দ্বিধা ভাবিত না। এখন সৎপাত্র ও স্বঘর দেখিয়া বিবাহ হয় না, তাহার বিষয় আশার কিরূপ আছে—ইহা প্রথম লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছে। তখন সৎপাত্রে কন্যাদান সকলেরই লক্ষ্যছিল। হিন্দু চিরকাল অদৃষ্টবাদী; তাহারা জানিতেন অদৃষ্টে সুখ থাকিলে কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে না! বাস্তবিক পাত্র চরিত্রবান হইলে, তাহাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে কষ্ট হইবার কোন কারণ নাই; যেমন করিয়াই হউক, সে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে; নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে না পারিলেও চরিত্রবান স্বামী তাঁহার স্ত্রীপুত্র লইয়া এইরূপ সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, সে বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নতুবা তুমি যতই ধনীর পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান কর, তাহার সুখ হইবে না। আজীবন একটা না একটা মহা কষ্টে তোমার প্রাণের কন্যা দুঃখ পাইবে! এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা শত শত চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। রুদ্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বেশী না হইলেও তিনি পূর্ব্বের প্রথা বড় ভাল বাসিতেন। তিনি জানিতেন কন্যার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে; তবে পিতামাতা বা অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য যে যাহাতে কন্যা সৎপাত্রে পড়ে। আর তিনি ধনী সৎপাত্রই বা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবেন, সেরূপ পাত্রের মূল্য যে অনেক,

কাজেই তাঁহাকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ কমলার মুখের দিকে চাহিতে হইবে; জাতিকুল বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। রুদ্ররাম আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য মনে মনে স্থির করিয়া ভাগ্নেয়ি-টীর জন্য যথাসম্ভব সৎপাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৪)

আমরা যতই কেন আস্ফালন করি না, জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ বিষয়ে আমাদের কোন আস্ফালনই সাজে না! ইহা ঈশ্বরাধীন কার্য্য—ইহাতে মানবের কোন হাত নাই। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ভগবানের কৃপায় মাতৃ-স্তন্যে যেমন দুগ্ধের সঞ্চার হয়। কন্যা জন্মাইবার পূর্ব্বে তাহার পাত্রের জন্মগ্রহণও সেইরূপ বিধাতৃবিধান, তবে চেষ্টা করিয়া সেই পাত্রটীর সন্ধান করিতে হইবে, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা করিতে হইবে, আপনাপনি কোথা হইতে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কোন বাধাই মানিবেনা। যতদিন সেই বিধি-নির্দ্দিষ্ট পাত্রের সংযোগ না হইবে, তত দিন তুমি যত চেষ্টাই কর, একটা না একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে! ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই এই নিয়ম, এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। এই জন্যই বলিতে হয় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরা-ধীন, ইহাতে মানবের কোন সাধ্য নাই!

রুদ্ররাম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ তিন মাস হইল নানা স্থানে কমলার পাত্রের সন্ধান করিতেছেন। কমলার বিবাহের জন্য শুধু রুদ্ররামের ভাবনা নয়, তাঁহার জননী, ভগ্নি ও স্ত্রী সকলেই মহা ভাবিতা হইয়াছেন। চেষ্টা করিলে কিনা হয়; বিশেষতঃ যখন ভবিতব্যের ভাগ্য-সূত্রের আকর্ষণ রহিয়াছে; তখন চেষ্টা করিলেই অবশ্য পাত্র মিলিবে। যে যেমন, তাহার সেইরূপ সংযোগই হইবে। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" শাস্ত্রের কথাটা আদৌ মিথ্যা নহে। রুদ্ররাম বহুকষ্টে ছয় মাসের পর গোবিন্দপুরে নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহ কমলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দপুরের স্কুলে ২৫৲ টাকা বেতনের পণ্ডিতছিলেন। সংসারে স্ত্রী, চারিটী পুত্র আর এক কন্যা। কন্যাটীর বিবাহ দিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই দায়োদ্ধার হইয়াছিলেন। চারিটী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনমোহন গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল নয় বলিয়া তিনি ইচ্ছা আর পড়িতে পাইতেছেন না। ইহাতে সম্বেও তাহার মনে ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ অর্থাভাবে পড়িয়া পুত্রের ইচ্ছা সত্বেও তাহাকে পড়াইতে পারিতেছেন না;—ইহাতে তিনি যে হৃদয়ে কিরূপ দুঃখ পাইতেছেন তাহা সহজেই বিবেচ্য। পুত্রের

লেখা পড়া হইতেছে না। ইহাতে কোন্ পিতামাতা সুখি হন্। নিত্যানন্দ এক বেলা আহারের বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রের পাঠের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুইমাস পরে তিনি পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন কিন্তু এরূপ অল্প আয়ে সংসার চালাইয়া একটী পুত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান বড়ই কষ্টকর, নিত্যানন্দ ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে জগতের লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়—তাহাদের হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়, স্বার্থপর জগতের রীতিই এইরূপ। তোমার উন্নতিতে জগতের সকলেই হিংসা করিবে, প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষেও করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু পিতা অপেক্ষা পুত্র যদি ধনী বা শিক্ষিত হয়—তাহা হইলে তাহাতে কেবল পিতা মাতার কোনওরূপ হিংসার উদয় হয় না! পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইলে তাহার অল্প-শিক্ষিত পিতার মনে কোনরূপ নীচ প্রবৃত্তি প্রবল হইবে না। স্বার্থপর জগতে এমন নিঃস্বার্থ—পর বন্ধু, ইহকালের একমাত্র দেবতা, পুত্রের আর কে আছে?

নিত্যানন্দ যখন পুত্রের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মহা বিব্রতে পড়িয়াছেন, কি করিবেন, কি করিলে তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, এই চিন্তায় তিনি মহা চিন্তিত। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই সময়েই রুদ্ররাম বন্দোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রুদ্ররাম পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জ্ঞাতাংসের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মিনতি করিয়া তাঁহার নিকট পুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। প্রথমত এত অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতে নিত্যানন্দের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া শেষে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। কুলীনের মর্য্যাদা স্বরূপ দুইশত টাকা নগদ লইয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন—ভাই! আমার বিবাহ দিতে এখন ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু মনমোহনের পাঠের ব্যয়ানুকুল্য জন্য ২০০৲ টাকা নগদ গ্রহণ করিতেছি। তবে অন্য বিষয় আমার কিছু বক্তব্য নাই; তুমি যেরূপ করিলে কোনরূপ কষ্ট হইবে না—তাহাই করিবে, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এ বিবাহে ভবিতব্যের স্থির সংযোগ হইয়াছে বলিয়া, আর কোন গোল-যোগ হইল না।

(৫)

শুভদিনে শুভক্ষণে মনমোহনের সহিত কমলার শুভ পাণিগ্রহণ কার্য্য নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। মহামায়া আজ একটী মহা চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন! তাঁহার প্রাণের কন্যা কমলাকে প্রার্থনীয় পাত্রে সমর্পণ করিয়া সুখী হইলেন। রুদ্ররাম

ও একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম প্রতি পালন করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইলেন। মনমোহন নির্ব্বিঘ্নে কলেজে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার পিতার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, ক্রমশঃ নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি দৃষ্টি শক্তি হীন হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই মনমোহনের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হইল। মনমোহনের সমস্ত আশা ভরসা এককালে লোপ পাইল। অগত্যা তাঁহাকে কলেজের পাঠ বন্ধ করিয়া পিতার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। নতুবা তাহার পূজনীয় পিতামাতার ও স্নেহের ভ্রাতা দুইটীকে প্রতিপালন করিবে কে ?

দুঃখ যখন মানবকে আক্রমণ করে, তখন তাহার দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনমোহন বৎসরেক মাত্র পিতার পদে কার্য্য করিতে না করিতে তাহার জননী স্বামীর পীড়ার জন্য এবং অহোরাত্র সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অপটু হইয়া পড়িলেন। কাজেই মনমোহনকে বাধ্য হইয়া তাহার স্ত্রীকে আনিতে হইল, নতুবা তাঁহার সংসার অচল হয় ; সমস্ত দিন অর্থের চিন্তায় তাঁহাকে কার্য্য স্থানে থাকিতে হইল, কেইবা ছোট ছোট ভ্রাতাগুলিকে দেখে, আর কেইবা বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা শুশ্রূসা করে, একা ত সকল দিক বজায় রাখা যায় না ?

কমলা এখন গৃহের কাজ কর্ম্ম সমস্তই শিখিয়াছেন। জননীর ন্যায় গৃহিণীর নিকট গৃহকর্ম্ম শিখিতে তাহার কয় দিন যায়। বিশেষতঃ তিনি দরিদ্রের কন্যা, গৃহকর্ম্ম তাহার অবশ্য জানা কর্ত্তব্য। তাহা ব্যতীত কমলা রামায়ণ, মহাভারত বেশ পড়িতে পারিতেন। তাঁহার মাতা-মহী অবসর সময়ে কমলাকে কীর্ত্তিবাসী বা কাশীরাম দাসের রামায়ণ মহাভারতের বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিতেন। অকিঞ্চিৎকর নাটক, নভেল পাঠে তাঁহার তাদৃশ রুচি ছিল না। এখনকার স্ত্রীলোকেরা যেমন লেখা পড়া জানিলে একটু শিক্ষার অহঙ্কার দেখান তখন স্ত্রীলোকগণ শিক্ষার বিষয় কিম্বা আহারাদির বিষয় পুরুষের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইত।

কমলা আজ একবৎসর হইল, শ্বশুর বাটী আসিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই তিনি স্বামীর দুঃখের ভাগ লইতে শিখিয়াছেন, তিনি এখনকার রমণীগণের মত স্ব ইচ্ছায় কোন কাজ করিতেন না। গৃহকর্ত্রী শ্বশ্রূ-দেবীর মত হইয়া সমুদয় কাজ করিতেন। ছোট ছোট দেবরগুলিকে সহোদরের ন্যায় যত্ন করিতেন। কমলা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া কিসে সংসারের সংস্কুলন হইবে ; কিসে সংসার ভালরূপ চলিবে, কিসে স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতে পারিবেন—ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার গৃহিণী

পণা দেখিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। দরিদ্র কন্যা শ্রমশীলা না হইলে তাহার কষ্টের একশেষ হয়। মনমোহনের জননী বিন্দুবাসিনী বধূমাতার গুণে বশীভূতা হইলেন। কমলা এখন আর বৃদ্ধা শ্বশ্রূদেবীকে কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে দেন না। বিন্দুবাসিনীকে কেবল কর্ত্রীর কার্য্য করিতে হয়; কমলা শুক্রদেবী থাকিতে আর কর্ত্রী পদে নিযুক্ত হইতে চাহেন না। মনমোহন পিতার ন্যায় অতি অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন, সকলেই তাহার গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেনা; এক্ষণে তাহার স্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাহাদের এই শুভ মিলনের প্রশংসা করিতে লাগিল।

৬

কমলার আগমনে গৃহের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন পুনরায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। মনমোহন প্রতি মাসে সংসার খরচের দ্রব্যাদি জননীর নিকট আনিয়া দেন। জননী সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজের তত্বাবধানে রাখিয়া দৈনন্দিন খরচের সমস্ত দ্রব্যাদি বধূমাতাকে প্রদান করিতেন। কমলা সেই দৈনিক খরচের দ্রব্য দেড়দিন করিয়া চালাইতেন। শ্বশ্রূদেবী যে তণ্ডুল প্রত্যহ রন্ধন করিতে দেন, তাহা হইতেও কমলা একমুষ্টি বাঁচাইয়া রন্ধন করিতেন, "নিজের না হয় চাটি কম হইবে" এরূপ মনে করিয়া আজকের জিনিস কাল করিয়া সংসার চালাইতেন। কমলার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখিয়া মনমোহন স্ত্রীর নিকট দিন দিন বশংবদ হইতে লাগিলেন। এরূপ স্ত্রীর গুণে কোন স্বামী না মুগ্ধ হয়।

মনমোহন এত কষ্টে পড়িয়াও লেখা পড়ার উন্নতি করিতে একদিনের জন্য বিরত হন নাই। রজনীযোগে আহারাদির পর তিনি প্রায় সমস্ত রাত্রি রঘুবংশ, ভট্টি, কুমার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি বেশ সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শী হইলেন। এই সময় ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদশূন্য হইলে, মনমোহন আবেদন করিলেন, অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। মনমোহন প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া বেশ দক্ষতার সহিত বালকগণকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেতনও বৃদ্ধি হইল। সংসার বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। কমলার প্রাণান্ত পরিশ্রম ও মনমোহনের একান্ত অধ্যবসায় এবং একান্ত ধর্ম্মানুরাগে তাহাদের সংসার আবার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাঠক! বলিতে পারেন কি? ইহা কার গুণে। আমরা বলি—ইহা দুইটীরই গুণে? দুইটী জিনিস একত্র হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। দুই দ্রব্য একত্র হইলে; স্বামী স্ত্রীর

দুইটী মন একত্র সম্মিলিত হইলে সংসার শান্তিময় হয়। সে সংসারে থাকিয়া দুঃখ দাবদগ্ধ মানব অনায়াসেই সুখ লাভ করিতে পারে। সংসারাশ্রম মানবের পরীক্ষা স্থল। এস্থলে প্রবেশ করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে, সে ধর্ম্মবীর নামে খ্যাত হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বকালের পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কেহই সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলী প্রদান করেন নাই। সংসারে ধর্ম্মভাবে থাকিতে পারিলে সংসার তুল্য স্থান আর নাই।

বিবাহের আট বৎসর অতীত হইয়াছে, মনমোহন গোবিন্দপুরের বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতার কোন স্কুলে অধ্যাপনা করিয়া এবং ২।৩টী গৃহের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কালে তাহাদের সেই সুখের সংসারে একটী সুখের ফুল ফুটিল। কমলার একটী পুত্র সন্তান হইল। মনমোহনের তখন অর্থের তাদৃশ অপ্রতুলতা ছিল না। পিতামাতাকে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়া তাহাদের চিকিৎসা করাইয়া কথঞ্চিৎ আরোগ্য করাইয়াছেন। পুত্রের গুণে নিত্যানন্দ ও বিন্দুবাসিনী সংসারে পুনরায় সকল সুখে সুখী হইবেন। মনমোহন প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা মাতার পূজা করিয়া ধন্য হইল। সংসারে প্রেমের পথে ধর্ম্মই সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয়; ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিলে দুঃখের সংসারও সুখের হইয়া থাকে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিবেদন।—ভগবানের কৃপায় "আলোচনা" বৈশাখ মাস হইতে নবম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে সাময়িক পত্রের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, আলোচনা'র বড়ই সৌভাগ্য তাই সে এতদিন জীবিত থাকিয়া জন সমাজের কৃপালাভে বঞ্চিতা হয় নাই। গত বৎসরে আমরা অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে মূল্য প্রাপ্ত হই নাই। এবার আমরা আলোচনাকে নব কলেবরে, নূতন সাজ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাহাদের নামে মোট ২৲ টাকার ভিঃ পিঃ করিবার মনস্থ করিয়াছি, যাহাদের আপত্তি থাকে সত্বর জানাইবেন। গত বৎসরের আলোচনা পত্রিকার যে কোন সংখ্যা গ্রাহকগণের নষ্ট হইয়াছে বা প্রাপ্ত হন নাই, এই মাসের মধ্যে লিখিলে আমরা বেয়ারিং পোষ্টে পাঠাইতে পারি। বিলম্বে আর দিতে পারিব না।

মাসিক সমালোচনা।

আমরা বিগত বৎসর শ্রীযুক্ত কুমারনাথ শর্ম্মা প্রণীত "কপালিনী" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "যোগ ও সাধন

রহস্য" ঢাকা হইতে প্রকাশিত "নববিকাশ" নামক মাসিক পত্রের ১২শ সংখ্যা উপহার পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ শর্ম্মা প্রণীত "কপালিনী" সমাজিক নাটকখানি তদীয় পিতৃদেব, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ৺কালীময় ঘটক মহাশয়ের "ছিন্নমস্তা" উপন্যাসের কতিপয় আদর্শ চরিত্র লইয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথম উদ্যমে গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে বেশ কৃতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, লেখা বেশ সরল ও মধুর হইয়াছে, তবে গ্রন্থকারকে আমরা বলি যে, সামাজিক নাটক লেখায় পদ্যছন্দ ব্যবহার না করিয়া, চলিত ভাষা ব্যবহার করিলেই ভাল হইত, আর পুস্তকখানির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে পদ্যগুলিকে গদ্যের ভাবে না সাজাইয়া অন্যরূপ করিলে সকল দিক রক্ষা হইত। যাহা হউক গ্রন্থকারের উৎসাহ থাকিলে কালে উন্নতি হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায়। "যোগ ও সাধন-রহস্য" গ্রন্থকার সুরেন্দ্র বাবু একজন উদীয়মান লেখক ও সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। উপন্যাস রচনায় তাহার ন্যায় কৃতীত্ব দেখাইতে খুব কম লেখকই পারেন। এক্ষণে তাহার সেই সুমধুর লেখনী নিঃসৃত শাস্ত্রীয় উপদেশ উক্ত গ্রন্থে যেরূপ সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। তাহা সকলেরই বোধগম্য। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ যতই প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল। "নববিকাশ" শেষের একখানি মাত্র সংখ্যা পাঠে কিছুই বুঝা গেল না। অতএব সমালোচনা করা অসম্ভব।

মাসিক সংবাদ সংগ্রহ।

জনরব কি সত্য?—শুনা যাইতেছে,—ভারতের জঙ্গীলাট লর্ড কিচেনার শীঘ্রই পদ ত্যাগ করিবেন, কি কারণে তিনি ভারত ছাড়িবেন, তাহার কিছুই প্রকাশ নাই, তবে কি জনরব সত্য? সত্য হইলে কারণ অবশ্য প্রকাশিত হইবে।

সমর সংবাদ।—ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়া রুষীয় বালটিক নৌ বাহিনীর পরিচালক এডমিরাল রোজডেবাভেনস্কি প্রভৃত কয়লা ও খাদ্য সম্ভার সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া, জাপানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সমূহ তুমুল আন্দোলন করিতেছেন। এদিকে বিলাতের টাইমস প্রমুখ প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রও ফরাসীর আচরণে কুপিত হইয়া ইংরাজগণকে এংগ্লো জাপানী সন্ধি অনুসারে জাপানীগণকে সাহায্য করিতে বলিতেছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কিন্তু "আমরা যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা রক্ষার চেষ্টায় আছি" বলিয়া সকলকে স্তোক দিতেছেন। ফলতঃ আন্তর্জ্জাতিক নিরপেক্ষতা উপলক্ষে ফ্রান্স, জাপান ও ইংলণ্ডের রাজনীতিকসমাজে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে এই গোলযোগের সুমীমাংসা না হইলে পরিণামে যে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অবিলম্বে নিদারুণ সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ সন ১৩১২। { দ্বিতীয় সংখ্যা

ছায়াপথ।

কে তুমি হে ধরণীর চন্দ্রাতপ সম
আলো করি দশদিক স্বর্গীয় বিভায়?
তোমার কি দুই পাশে মন্দার বিমল
পবনে মিশায়ে রেণু সাজে থরে থরে?
কিম্বা পূত ধূলি তব অপ্সরা দলের
সশব্দ চরণ ক্ষেপে? অথবা তোমার
বিশাল উরস কিহে পুষ্পক রথের,
ঘূর্ণ্যমান অরশ্রেণী-ঘর্ঘর-নির্ঘোষে
কম্পিত হতেছে সদা? জান ছায়াপথ
যদি, বলহে আমারে—সর্ব্বদর্শী তুমি
তোমা অনুসরি' কিম্বা অন্যপথ ধরি,
পাইব তাঁহারে আমি, যাঁহারে পাইতে
আকুল—নিমগ্ন তপে হিমাদ্রি শিখরে
যোগীকুলশ্রেষ্ঠযোগী বৃষভ-কেতন।

শ্রীনকরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাবালেশ্বর।

কটক জেলায় একটী বালেশ্বর আছে, আমাদের আলোচ্য বালেশ্বর সেটী নহে। বোম্বাই নগরের ৭৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে ৩০ মাইল ব্যবধান সাহাদ্রিয়া গিরিপুঞ্জের উপর সংস্থাপিত মহাবালেশ্বর নামক একটী গ্রাম আছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য। কৃষ্ণ নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট বলিয়া তদ্দেশবাসী হিন্দুদিগের চক্ষে গ্রামটী অতি পবিত্র। তথায় মহাদেব নামক একটী শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন—তাঁহার মন্দিরের নাম মহাবালেশ্বর। এখানকার প্রধান দৃশ্য কৃষ্ণানদীর মন্দির। কৃষ্ণার উৎপত্তি স্থানের সন্নিকট প্রায় ১৩০ বৎসরের একটী পুরাতন প্রস্তরমন্দির লোকের ভক্তি ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর পরে বৃহস্পতি

কন্যা রাশিতে প্রবেশ করিলে তথায় একটী উৎসব হইয়া থাকে। তখন নিকটবর্ত্তী বহুতর স্থানের লোক সমবেত হইলে স্থানটি অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে। লোকে সেইদিবস কৃষ্ণায় অবগাহন করতঃ গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় করে। বারবৎসর পর বৃহস্পতিগ্রহ কন্যারাশিতে প্রবেশ করিলে গঙ্গাদেবী তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা কৃষ্ণাকে দেখিতে আসেন, তদ্দেশীয়দিগের ইহাই ধারণা। গঙ্গা আসিয়া নাকি একবৎসর তথায় অবস্থান করেন।

জনশ্রুতি এই যে, ঐ মন্দিরটি সাতবা ব্রাহ্মণ পরিবারের অনগল নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মন্দির পরিচালনের ভার এক 'কোলি' পরিবারের প্রতি অর্পিত হয়। তাহাদিগকে 'গঙ্গাপুত্র' বলে। যাত্রীগণ স্নানের পর যে সমুদয় দ্রব্য দেবতার নামে উৎসর্গ করে তাহা তাহাদের প্রাপ্য এবং স্নানের পূর্ব্বে যাহা উৎসর্গীকৃত হয় তাহা পুরোহিত গণের প্রাপ্য। মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় যে কোলির উপর উহা পরিচালনের ভারার্পিত হইয়াছিল, তাহারই বংশধরগণ উত্তরাধিকারী সূত্রে উহার কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়া আসিতেছে। 'গুরভ' পুরোহিতগণ পার্ব্বতীয় জাতির সহিত বিশেষ সম্পর্কিত, অন্যদেশবাসীগণের সহিত তাহাদের আদান প্রদান প্রায় দেখা যায় না। কৃষ্ণামন্দিরের উপর তাহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কোলিগণই তাহার সর্ব্বে সর্ব্বা। এই দুই মন্দির সংসৃষ্ট জনশ্রুতি আলোচনা করিলে ও তাহার ইতিহাসের সহিত উত্তর কানেড়ার গোকর্ণের মহাবালেশ্বরের ইতিহাস তুলনা করিলে কৃষ্ণা মন্দিরই প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মহাবালেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরে এক খানি প্রস্তরে জলপূর্ণ কতকগুলি গর্ত্ত আছে। লোকে বলে, ঐ গর্ত্তে কৃষ্ণা, বেণী, কোয়ালা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, ভাগিরথী এবং সরস্বতী এই পবিত্র সপ্তনদীর আদিম অবস্থান। এই গর্ত্তের সহিত কোনো প্রকারে কৃষ্ণামন্দিরের সংযোগ নাই, অথচ ইহার দুই একটীর স্রোত এই গ্রামের পাঁচটী নদীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এবং গো-মুখ হইতে নিঃসৃত যে জলধারা নিম্নস্থ চৌবাচ্ছায় পতিত হইতেছে, তাহার সহিতও ঐ পাঁচটী নদীর সংযোগ পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল নদীর মধ্যে কৃষ্ণাই প্রধান এবং ঐ মন্দিরের নিকট হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে কৃষ্ণার নাম শ্রুত হইতেছে এবং অষ্টাদশ প্রধান পুরাণের অন্তর্গত স্কন্দ পুরাণে কৃষ্ণামাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে ইহার পৌরাণিক ইতিবৃত্তও জানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার মাহাত্ম্য বা পুণ্যত্ব বহুপুরাতন বলা যায় না, কারণ

সংস্কৃত অভিধান অমর কোষে ইহার নাম নাই। প্রথম খৃষ্টাব্দের অতি প্রারম্ভে অমর কোষ সঙ্কলিত হয়। ভারতবর্ষের এই অংশে প্রচলিত অন্যান্য অভিধানেও কৃষ্ণার নাম নাই। বিষ্ণু ও অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণার নাম পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহার মাহাত্ম্য বোধ হয় সাতারা রাজগণের সময় হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারাই এই মন্দির ও মহাবালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মন্দির নির্ম্মাণ করান। শুনা যায়, ঐ প্রদেশে 'মোর' নামে একটী রাজা ছিল। এই রাজপরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীগণ ঐ মন্দিরে আসিয়া যে স্থানে অবগাহন করিত, যে স্থানে আদ্র বস্ত্র ত্যাগ করিত, সে স্থানে বেশভূষা করিত, লোকে এখনো তাহার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা বলে ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে মোর রাজা বিদ্যমান ছিল।

মহাবালেশ্বর মন্দির আধুনিক এবং উত্তর কানাড়ার গোকর্ণের মহাবালেশ্বর মন্দিরের আদর্শে নির্ম্মিত। বর্ত্তমান কারোয়ার হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে কানাড়া জেলায় গোকর্ণ অবস্থিত। মহাভারতের সময় হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, স্কন্দপুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে, বাঙ্গালা ধর্ম্ম গ্রন্থেও তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রী এই স্থানে আগমন করে; দক্ষিণ ভারতে ইহা একটী প্রাচীনতম শিবমন্দির। শিল্প ও কারুকার্য্য বিহীন মন্দিরটী সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যস্থিত লিঙ্গের নাম মহাবালেশ্বর। লঙ্কাধিপতি রাক্ষসেশ্বর দশানন সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে পূজামাহাত্ম্য প্রকাশ করেন।

মহাদেবের ভূষণ সর্প, কাজেই মন্দির গাত্রে সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত আছে। গোকর্ণের মহাবালেশ্বরকে একটি পাষাণময় সর্প বেষ্টন করিয়া আছে। লোকে বলিয়া থাকে একটী জাতিসর্পই নাকি কৃষ্ণামন্দিরের লিঙ্গকে রক্ষা করিতেছে। এই উভয় মন্দিরের পুরোহিতগণই অনার্য্য বংশ সম্ভূত, ইহাদের কেহ কেহ অন্য ব্রাহ্মণের হস্তে আহার করে না। তাহাদের সম শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই সকল মন্দিরের পৌরহিত্য করিতে পারে না।

পশ্চিম ভারতে প্রচলিত মহাবালেশ্বর-মাহাত্ম্য সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, সাহদ্রিয়া গিরি শ্রেণীর উপর মহাদেবের জটা হইতে উত্থিত কৃষ্ণা, বেণী, কাকুদমতি বা কোয়ানা, গায়ত্রী এবং সাবিত্রী এই পাঁচটী নদী আছে। কৃষ্ণা—বিষ্ণুর তুল্য, বেণী—শিবের তুল্য, কাকুদমতি; ব্রহ্মার তুল্য এবং অবশিষ্ট দুইটী ব্রহ্মার ভার্য্যা। মানবের পরিত্রাণ নিমিত্ত আটটী তীর্থ আছে,—(১) ব্রহ্মা (২) রুদ্র, (৩) বিষ্ণু, (৪) চক্র, (৫) হংস, (৬) অরণ্য,

(৭) মালাপা এবং (৮) পিতৃমুক্তিদা, তিনটী শিবলিঙ্গ আছে,—মহাবল, অতিবল এবং কোটীশ্বর। এই গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ ভাগকে ব্রহ্মারণ্য বলে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা নাকি এই বনে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তৎকালে গায়ত্রী ও সাবিত্রীর উদ্ভব হয়। বার বৎসর পর যখন বৃহস্পতি কন্যা রাশিতে গমন করেন তখন এখানে স্নান করিলে যেরূপ মহতী পুণ্য সঞ্চয় হয়, অন্য কোন তীর্থ স্নানে সেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় না। ইহাকে ব্রহ্মক্ষেত্রও বলে এবং উপাসনা উপযোগী স্থানকে বেদাশ্রম বলে। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণোক্ত কৃষ্ণা মাহাত্ম্যেও মহাবালেশ্বরের ইতিহাস আছে। প্রাচীন পুরাণাদির ভাষার সহিত মহাবালেশ্বর মাহাত্ম্যের ভাষা তুলনা করিলে শেষোক্ত খানি আধুনিক বলিয়া বোধ হইবে।

সাতারার মারাঠি রাজগণের সময় হইতে মহাবালেশ্বরের মন্দিরের গৌরব বিস্তীর্ণ হয়। শিবাজী এবং তাঁহার বংশধরগণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম ভারতে ইহা একটী প্রসিদ্ধ পুণ্য তীর্থ। গোকর্ণ-মহাবালেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় ইহা অতি প্রাচীন নহে এবং পূর্ব্বোক্তের আদর্শে ইহা নির্ম্মিত। শৈবগণ প্রত্যহ অর্চ্চনা কালে যে 'জ্যোতির্ম্ময়' লিঙ্গের নাম সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাহাতে ইহার নাম নাই এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কেদারখণ্ডে ও লিঙ্গপুরাণে ইহার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল কারণে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয় এবং মহাবালেশ্বর মাহাত্ম্য নামক ইহার পৌরাণিক ইতিবৃত্তকেও আধুনিক কালেরর চনা বলা যায়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

(Moore রচিত Thou ant O God!)

অবলম্বনে

সকলি তোমার!

(১)

হে প্রভু! সে তুমি, যাহা জীবের জীবন;
জগতের চারিধারে করি দরশন;
দিবসে কিরণ তুমি, জোছনা নিশায়;
সব তব প্রতিবিম্ব, তোমাতে মিলায়;
চারিধারে হেরি তব মহিমা অপার,
যা কিছু সুন্দর আছে সকলি তোমার!

(২)

অস্তগামী রবিকর ধীরে চলে যায়,
ফিরি ফিরি স্বরগের তোরণে দাঁড়ায়;
দেখিলে সে দৃশ্য হায়! স্বর্ণপথ দিয়ে
কত সুখ ছবি মনে, উঠেছে জাগিয়ে;
ঐ যে সুন্দরবর্ণ—অত নেত্র তৃপ্তি কর;
ঐ যে মধুর দৃশ্য—সকলি তোমার!

(৩)

সুরঞ্জিত পক্ষ মেলি যবে নিশা এসে—
তমসায় আচ্ছাদিত করেগো আকাশে ;
কৃষ্ণবর্ণ সুচিত্রিত বিহগের ন্যায়
যার পক্ষ বিভূষিত,—দীপ্ত তার কায় ;
সেই সে পবিত্রতমঃ—জ্যোতি স্বরগের ;
অস্ফুট ভাবের ছবি—সকলি তোমার !

(৪)

চারিধারে বহে যবে বসন্ত বাতাস ।
তোমারি প্রভাব তা'য় দেয় উষ্ণশ্বাস ॥
নিদাঘেতে যত পুষ্প বিকশিত হয়,
সে সব তো পায়, প্রভু ! তোমাতে আশ্রয়,
নয়ন ফিরালে হেরি মহিমা অপার,
যা কিছু সুষমা মাখা—সকলি তোমার !

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কারে চিত চায় ?

(১)

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি—
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সঙ্গোপনে কহে ডাকি,
তাঁরে চিত চায় যিনি উৎস করুণায়,
অন্তিমে করেন—যিনি ভবনদী পার ।

(২)

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সঙ্গোপনে কহে ডাকি,
তাঁরে চিত চায়, যিনি ভব-মূলাধার,
অন্তিমে যাঁহারে বিনা নাহিক নিস্তার ।

(৩)

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সঙ্গোপনে কহে ডাকি,
তাঁরে চিত চায় যিনি এই বসুধায় ;
সাম্যের নয়নে চেয়ে পালেন সবায় ।

(৪)

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সঙ্গোপনে কহে ডাকি,
তাঁরে চিত চায় যিনি বিপদে পড়িলে,
স্নেহে বাড়াইয়ে হাত টেনে লন কোলে ।

(৫)

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সঙ্গোপনে কহে ডাকি ;
তাঁরে চিত চায় যিনি সবারি "আমার",
সকলেরি প্রতি যার স্নেহ অনিবার ।

(৬)

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি
কারে চিত চায় ?
অমনি হৃদয় পাখি, সঙ্গোপনে কহে ডাকি !
তাঁরে চিত চায় যিনি আয় আয় ব'লে,
ভাঙিলে ভবের খেলা টেনে লন কোলে ।

শ্রীমহম্মদ মোজাম্মলহক ।

প্রার্থনা।

দিনান্তে আসিলে ফিরে'
হাসি মুখে দেখা দিও;
হেরিলে নয়নে অশ্রু,
অঞ্চলে মুছিয়া নিও!
দিবসের ক্লান্ত দেহে,
অবশে পড়িলে ঘুমি;
মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রে,
জাগাইয়া দিও তুমি!
অসহ্য বিরহে যদি
কেঁদে কভু ওঠে প্রাণ;
মধুর বীণায় তব
তুলিও মিলন তান!
হাসিও আনন্দে বসি'
নিভৃতে নিকুঞ্জ বনে;
জুড়াব প্রাণের জ্বালা,
রূপরাশি দরশনে!
সুশীতল সন্ধ্যানিল,
আনন্দে বহিলে ধীরে;
গোপনে গোপনে তুমি
আসিও,—মাথার কিরে!
হাসিলে গগনে বিধু,
অনন্ত মাধুরী খুলে;
তটিনী হইয়া তুমি,
ছুটিও তরঙ্গ তুলে;
হইয়া সুবর্ণ সিন্ধু,
আনন্দে করিও খেলা,—
সায়াহ্ন-গগনে যবে
ডুবে যা'বে স্বর্ণ বেলা!
প্রার্থনা ইহাই শুধু,
আর কিছু নাহি মোর;
অপূর্ণ থাকিতে যেন,
ভাঙ্গেনা এ ঘুম ঘোর!

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

ক্ষুদ্রের কথা।

ও কি! আমি কেবল মুখ দিয়া দুইটি মাত্র কথা বাহির করিয়াছি অমনি যে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক, তাচ্ছিল্যদ্যোতক ভ্রূকুটী আপনাদিগের সরলদৃষ্টিকে কুটীল করিয়া তুলিল! ক্ষুদ্রের কথা! সেটা কি আবার শুনিবার যোগ্য! তাহা শুনিয়া কি সময়ের অপব্যবহার করিতে আছে! আমাদের সময় অনেক বেশী মূল্যবান! আচ্ছা হাঁ সে কথা অবশ্যই সত্য আপনাদের সময়ের মূখ অনেক বেশী, তাহা সহস্রবার স্বীকার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া আমি ক্ষুদ্র আমার যে একটা কথা থাকিতেই পারেনা ইহার কি একটা অর্থ আছে? এসংসারে কথা কি কেবল মহতের জন্যই হইয়াছে? লোকযাত্রাতে এইরূপই দেখা যায় বটে—এ ভুবনে সকলেই কেবল

মহৎ লইয়া ব্যস্ত ! মহতের কথা থাকুক বা না থাকুক—তাঁহার কথা শুনিবার জন্য শতসহস্র লোক উদ্গ্রীব হইয়া আছে ! লক্ষ লক্ষ লোক উৎকর্ণ হইয়া আছে ! কোটি কোটি লোক উৎসুক হইয়া আছে ! কিন্তু আমি ক্ষুদ্র—আমার কথা যদি আমি গগনভেদী দুন্দুভি নিনাদের দ্বারা অনন্ত জগতের অনন্ত বায়ুতে অনন্তকাল প্রতিধ্বনিত করি তথাপি সে তরঙ্গ সংসারের কর্ণকুহর স্পর্শ করিবে না ! সংসার আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না। আর মহৎ যদি কোন কথা নাও বলিতেছেন তথাপি বলিতে পারে না বলিয়া ঐ দেখ সহস্র চক্ষু তাঁহার ওষ্ঠপুটের প্রতি অনিমিষ-দত্ত-দৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে !

এ সংসারে যাঁহারা বড়লোক বলিয়া খ্যাত আছেন একজন বলিতে দশজন তাহাদের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সশব্দে-সোল্লাসে প্রতিধ্বনিত করিতেছে তাঁহার অসুখ বিসুখ আছে কিনা, রাত্রিতে সুনিদ্রা, হইয়াছে কিনা, তাঁহার দুধের সর অতিরিক্ত পুরু বা অতিরিক্ত পাতলা হইয়াছে কিনা, তাহার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ঐ দেখ দ্বার দেশে অসংখ্য শুশ্রূষু অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র পাখাওয়ালা, আমি যে সারা রাত্রি জাগিয়া পাখা টানিতে টানিতে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হওয়াতে কশাঘাত লাভ করিয়া একহস্তে ব্যথিত স্থলে অবমর্ষণ করিতে করিতে অন্য হস্তে পাখা টানিতেছি রুধির স্রোতে আমার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার, তাহা দেখিয়া আহা বলিবার কি একজন ইহাদের মধ্যে আছে ?

সুতরাং তোমরা যে ক্ষুদ্রের আবার একটা কথা থাকিতে পারে ইহা ধারণাই করিতে পারনা—ক্ষুদ্রেরও যে একটা বেদনা একটা সুখদুঃখানুভূতি, একটা হর্ষ, একটা বিষাদ—হউক তা সব ক্ষুদ্র—হউক যত তুচ্ছ কিন্তু তবু যত ক্ষুদ্রই হউক যত তুচ্ছই হউক একটা কিছু আছে, সেটা তোমরা কল্পনাতে আনিতে পার না। ক্ষুদ্রের অস্তিত্বের একটা কিছু মূল্য আছে বলিয়াই তোমরা বুঝিতে পার না বা বুঝিতে চাও না। কিন্তু তাই তোমাদিগকে আমি সামান্য দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার কথা বেশী নহে সুতরাং একটু অনুগ্রহ করিয়া কথা কয়টা শুনিও, একটু বুঝিবার চেষ্টা করিও।

আমি ক্ষুদ্র—চিরকাল ক্ষুদ্র আছি—চিরকাল ক্ষুদ্র থাকিব ! কিন্তু আমি যে তোমাদের এত ঘৃণা এত অবহেলার পাত্র হইব, আমার অপরাধটা কি ? তুমি বলিবে ক্ষুদ্রত্বটাই তোমার অপরাধ। তুমি যদি নৈয়ায়িক হও—তবেতো আবার তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রত্বাবচ্ছিন্ন ভাবাদির সমাবেশ করিয়া আরও মাদৃশ ক্ষুদ্রের অবোধ্য করিয়া তুলিবে। ভাল, ক্ষুদ্রত্বটাই যদি আমার অপরাধ হইল, তবে

মহত্ত্বটাই বা তোমার অপরাধ না হইবে কেন! আমার ক্ষুদ্রত্বও যেখান হইতে, তোমার মহত্ত্বও সেইখান হইতে। সুতরাং আমি যদি ক্ষুদ্রত্বাবচ্ছিন্ন ভাবের জন্ত অপরাধী সাব্যস্ত হই, তবে তুমিই বা মহত্ত্বাবচ্ছিন্ন ভাবাবিষ্ট হইয়াও নিষ্কৃতি পাইবে কেন? যেদেশে সবাই এক অঙ্গুলিপরিমিত মানুষ সেখানে সাড়ে তিন হাত মানুষ গিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা তাহার সেই গুরুবপুষ্মত্তাকে নিশ্চয় একটা মহান অপরাধের মধ্যেই গণ্য করিবে। মূর্খের দেশে পণ্ডিত ও সুসংস্কৃত-বাক্য-কথন জনিত গুরুপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হন! অতএব তুমি যেমন এক হিসাবে আমাকে অপরাধী বলিতে পার, আমিও তেমনি সেই হিসাবে তোমাকে অপরাধী বলিতে পারি।

যাক্, তাও না হয় ছাড়িয়া দিলাম। আরও অনেক বিষয় আছে।

তোমরা যে ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা কর, যাহার অস্তিত্বের মূল্যই আদৌ বুঝিতে পার না সেই ক্ষুদ্রই যে তোমাদের মহত্ত্বের মূল সে কথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ? আমরা ক্ষুদ্রেরা আছি বলিয়াই যে তোমরা বৃহতেরা বৃহৎ হইয়াছ, মহতেরা মহান্ হইতেছ সেটা একবার প্রণিধান করিও। এ জগতে যদি আমরা এই ক্ষুদ্রেরা না থাকিতাম, তবে তোমাদের এ মহত্ত্বের বিকাশ হইত কেমন করিয়া? এ সংসারারণ্যে আমরা সব ক্ষুদ্র লতাগুল্ম আছি বলিয়াই তোমরা সহকার শাল তমাল সমূহ যথেচ্ছ শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ করিয়া অভ্রংলিহ হইয়া উঠিতে পারিয়াছ। যদি সকলেই একই ভাবে বৃদ্ধি পাইতাম, যদি এ জগতে ক্ষুদ্র না থাকিত তবে বৃহতের বৃহত্ত্ব, ও মহতের মহত্ত্ব কোথায় থাকিত, সে সম্মান, সে প্রতিপত্তি কোথা হইতে আসিত? আমরা ক্ষুদ্র আছি বলিয়াই তোমরা বৃহৎ—আমরা ক্ষুদ্র না থাকিলে তোমরা বৃহৎ ও থাকিতে না! অতএব বলিতে হয় যে আমরাই তোমাদিগকে রাখিয়াছি—তোমাদের অস্তিত্বের মূল আমরা। জগাই মাধাই ছিল বলিয়াই শ্রীচৈতন্যাদ্বৈতের গৌরব ফুটিয়াছিল—আস্‌সেওড়া কাঁটা নটে আছে বলিয়াই রসাল, কণ্টকীর মান! যে দেশের মধ্যে একটী গ্রামে মাত্র একটী উপাধিধারী আছেন সেখানেই তিনি একটা কিছু, কিন্তু যে গ্রামে ঘরে ঘরেই বি, এ, এম, এ, সেখানে কি আর তাঁদের খাতির আছে?

অতএব বুঝিয়া দেখ হে মহৎ, হে বৃহৎ, যে তোমরা, যে আমাদিগকে এত ঘৃণা এত অবহেলা কর যে আমাদিগকে স্পর্শেরও অযোগ্য বলিয়া মনেকর সেই আমরাই তোমার তুমিত্বের মূল। প্রজা আছে বলিয়াই রাজা, নতুবা রাজা প্রজা সবই এক! ক্ষুদ্র আমরা, তোমাদিগকে ফুটাইয়া রাখিবার জন্ত, তোমাদিগকে বিকশিত করিবার জন্ত

আমির বিসার্জ্জন দিয়াছি বলিয়াই তোমরা এখনও জীবিত আছ এখনও স্ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছ! অতএব বল দেখি হে মহৎ, হে বৃহৎ, কার নীতি প্রশংসনীয়? যে নীচকে সর্ব্বদা প্রকট করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে তা'র অথবা যে অন্যের সুখের জন্য, সম্মানের জন্য অবিরত নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেছে অবিশ্রান্ত নিজ স্বার্থ বলি দিতেছে তাহার? কাহার স্বার্থ ত্যাগ অধিক? কাহার পরহিতাকাঙ্ক্ষা প্রকৃষ্টতর? তুমি মহৎ, তুমিই এ প্রশ্নের সমাধান কর!

অতএব তোমরা যদি নিজ স্থায়িত্বের কামনা কর, নিজযশোঢক্কার দুন্দুভি নিনাদ শ্রবণে যদি আত্মার তৃপ্তি সাধনের ইচ্ছা তোমাদের থাকে তবে তোমাদের স্বীয় সমর্থসিদ্ধির উদ্দেশেই আমাদিগকে রক্ষণ করিবার প্রয়োজন তোমাদের আছে বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু তোমরা যদি অবিরাম আমাদের প্রতি এইরূপ ঘৃণা, এইরূপ অবহেলা এইরূপ নিষ্পীড়ন ও নিষ্পেষণ চালাইয়া শেষে আমাদিগকে আমাদের অটল—ধৈর্য্যহিমাচলকে টলাইয়া দাও, এবং আমরা যদি তৎকালে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব এ পৃথিবী বক্ষ হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার সংকল্প করি—সংকল্প করি কেন, যদি তাহা কার্য্যে পরিণতই করি তাহা হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গেই যে তোমাদের মহত্বও মুছিয়া যাইবে? তাইবলি হেমহৎ, তোমরা মহৎ আছ তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই তোমরা মহৎই থাক, কারণ তোমরা না থাকিলে আমরা নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না—আমরা তোমাদের বিনাশ কামনা করি না কিন্তু আমাদের প্রার্থনা এই যে আমাদিগের কথা, আমাদের বেদনা শুনিলেই সেটাকে একেবারে অবহেলা করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না;—আমরাও একটা জীব, ভগবানেরই সৃষ্ট এবং তাঁহারই প্রতিপালিত, একথাটা মনে রাখিলে কোন অপমান নাই।

তোমরা মহত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অনেক সময়েই আমাদের কথা এই ক্ষুদ্রদের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাও সেটাও আমাদের বড়ই দুঃখ! যেমন অনেক গরীব পিতামাতার গরীব সন্তান তাঁহাদের শোণিত-দ্রব-কারিণী চেষ্টা এবং ভিক্ষালব্ধ অর্থের সাহায্যে শিক্ষিত (!) হইয়া মুন্সেফ্ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শোভনীয় পদপ্রাপ্ত পুত্রক স্বীয় পিতামাতাকে ভুলিয়া যায় তাঁহাদের পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে, তেমনি আমাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফলস্বরূপে তোমরাও আমাদেরই দ্বারা মহৎ হইয়া আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ এ পরিতাপ রাখিবার স্থল আমাদের নাই।

তোমরা কংগ্রেস কর, কন্ফারেন্স কর, বক্তৃতা কর, সভা কর, কতই কি কর—

অথচ সে সবই ভাল কথা, কিন্তু তাহার মধ্যে আমরা ক্ষুদ্রেরা কতখানি আছি? আমরা উচ্চপদ চাহিনা, উচ্চ অধিকার চাহিনা, সে সব তোমাদেরই জন্য। আমরা চাহি মাত্র দুটো পেটের ভাত, আর একটু পরিবার কাপড়। এই আমাদের জোটেনা, তারই কোন উপায় আমরা করিয়া উঠিতে পারিনা, মনে ভাবি তোমাদের দ্বারা আমাদের একটা কিছু সুবিধা হইবে কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই আমাদের সে আশা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এখন আমরা বুঝিতেছি যে তোমরা মহৎ মহত্তের কথা লইয়াই আলোচনা করিবে। ক্ষুদ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর তোমাদের নাই। ইচ্ছা আছে কিনা সেও সন্দেহ!

দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে কি? তোমরা শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সভা সমিতি করিয়া দলে দলে ছেলেপিলে-দিগকে বিলাত পাঠাইতেছ, তাদের বৃত্তি দিতেছ বেশ ভাল, উদ্দেশ্য মহৎ, কিছুই সন্দেহ নাই কিন্তু আমি দেখিতেছি আমাদের ক্ষুদ্রদের তাহার দ্বারা বেশী কোন সুবিধার আশা নাই। আমি একজন ক্ষুদ্র, একটা ফন্দী কৌশল করিয়া একটা নূতন কিছু কল্পনা করিলাম কিন্তু তাহা খাড়া করিবার অর্থ সামর্থ্য আমার নাই—তোমরা কি আমাকে সাহায্য করিবে? কই তাতো বোধ হয়না। তোমরা জাপানী তাঁত, আমেরিকান্ তাঁত ইত্যাদি আনিবার বন্দোবস্ত করিতেছ, কিন্তু আমি একজন ক্ষুদ্র যদি ঐ রূপই একটা তাঁত করি তবে সেটার ব্যবসা খুলিবার সুবিধা তোমরা করিয়া দিতে পার না কি? তোমরা মহতেরা যখন মেলা কর তখন আমরা ক্ষুদ্রেরা বড় আশায় বুক বাঁধিয়া পরিবারের হাতের শাঁখা জোড়া বাঁধা রাখিয়াও টাকা জোগাড় করিয়া যদি একটা কিছু নূতন মত কাজ দেখাইলাম, তোমরা তাহার পুরস্কার স্বরূপ মুখের বাহোবা অথবা বড় জোর সুবর্ণের কি রৌপ্যের মেডেল দিয়া আপ্যায়িত করিলে? কিন্তু মেডেলে কি পেট ভরে—না বাহোবায় ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়? আমার সেই পুরস্কৃত জিনিস-টার কাটতির কোন একটা পথ যদি তোমা-দের ন্যায় মহতের দ্বারা না হইল, তবে আর আমাদের আশা কি?

তাই বলিতেছিলাম যে তোমরা মহতেরা মহৎ হইলে আর ক্ষুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-বার অবসর পাওনা—ক্ষুদ্র সেতো ক্ষুদ্র—চিরকালই ক্ষুদ্র—তার প্রতি দৃষ্টিপাত করাটা ক্ষুদ্রত্ব বই নয় বলিয়াই বোধ হয় উপেক্ষা কর। কিন্তু ভাই ক্ষুদ্র বলিয়া একেবারেই উপেক্ষা করিওনা। এ জগৎটাই ক্ষুদ্রের সমষ্টি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু সমবায়েই ইহার উৎপত্তি আবার অণু পরমাণুতেই ইহার লয়। স্বয়ং ভগবান্ও 'অণোরণীয়ান্' অথচ 'মহতো মহী-

য়ান্'। অতএব অত নাসিকা কুঞ্চিত না করিলেও পার। দেখ যাহাকে তুমি ক্ষুদ্র বল, সেও মহৎ হইতে পারে,যে মহৎ সেও আবার ক্ষুদ্রপর্য্যায়ে আনত হইতে পারে। দশাচক্র-নেমীর আবর্ত্তনের পদ্ধতিই এই। দেখ ক্ষুদ্র গণ্য বুয়ার সে দিন কি করিয়াছে—ক্ষুদ্র অসভ্য জাপান আজ কি করিতেছে! কোথায় মহৎ রুসিয়ার বলদর্প, আর কোথায় ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ক্ষুদ্রকায় জাপ্! কিন্তু অদ্য কাহার প্রতিষ্ঠা?

তাই বলি ভাই মহৎ, ভাই বৃহৎ, ক্ষুদ্রের প্রতি অবহেলা করিও না ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না ক্ষুদ্রেরও এ সংসারে স্থান আছে, প্রাণ আছে, কাজ আছে, কর্ত্তব্য আছে—প্রয়োজন আছে। ভগবানের রাজ্যে কিছুই নিষ্প্রয়োজনীয় নহে কিছুই বিনা কাজে নাই॥ ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। ক্ষুদ্র দোষ উপেক্ষিত হইলে তাহা শেষে জীবনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে ক্ষুদ্রগুণ অবজ্ঞাত হইলে তাহাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে পারে। সে দত্যাবায় ভাগীও তোমাকেই হইতে হইবে।

আজ তুমি দৈববলে মহৎ হইয়াছ—আজ তুমি পূর্ব্ব সুকৃতি বলে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছ কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্রকে পদদলিত করিও না ক্ষুদ্রের কাতর প্রাণের বেদনাকে উপেক্ষা করিওনা—ক্ষুদ্রের কাতর ক্রন্দনে বধির হইও না! যদিও এখন তোমারই সেবার জন্ম তোমারই সুখের জন্ম লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে কিন্তু তথাপি তাহার ক্ষুদ্রত্বের দোহাই দিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ পেষণের উপর পেষণ করিও না, তাহার ক্ষতস্থানে মলমের পরিবর্ত্তে,তপ্ত লৌহ প্রয়োগ করিও না, সকলেরই একটা সীমা আছে, মহত্বেরও সীমা আছে, ক্ষুদ্রত্বেরও সীমা আছে, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে পাছে তোমার এই মহত্বের পীড়নে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার মহত্বের অন্তিমদশা উপস্থিত হয় তাই একটু ইঙ্গিত করিলাম। সময়ান্তরে আরও কিছু হিতকথা তোমাকে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ।

একটী চিত্র।

(১)

নবীন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত যুবক। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে লেখা পড়ায় জলাঞ্জলী দিয়া বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা জননী মাতঙ্গিনী; স্ত্রী বিমলা দুইটী কনিষ্ট ভ্রাতা ও একটী ভগ্নী। আজ কাল এত বড় একটী সংসার প্রতিপালন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ আজ

কাল চাকুরীর বাজার যেরূপ মহার্ঘ তাঁহাতে বি, এ, পাশ করিয়া ২০৲ ২৫৲ টাকার বেশী উপার্জ্জন হয় না। কাজেই নবীন বাবুর সংসারে কষ্টের একশেষ হইয়াছে। মাতঙ্গিনী সেকালের স্ত্রীলোক, কষ্ট সহ্য করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শীনী; অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও যখন নবীন বাবু সংসারের সঙ্কুলন করিতে পারিতেছেন না; তখন জননী আর কি করিবেন, নীরবে কষ্ট সহ্য করিতেন, তথাপ পুত্রকে একটী দিনের জন্য কোনও কথা বলিতেন না, বরং অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট হইবার জন্য নবীনবাবুকে নিষেধ করিতেন। পুত্রগতপ্রাণা জননীর পুত্রের প্রতি এমনি মমতা। জগতে এমন মমতা এমন স্নেহ ভালবাসা আর কাহার নিকট আশা করিতে পারা যায় না। বিমলা আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা হইলেও শ্বশ্রূদেবীর শিক্ষা গুণে তাদৃশ প্রগল্ভা হইতে পারেন নাই। বিমলা বেশ লেখা পড়া জানিতেন। তাহার রূপও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার রূপসাগরে এখন যৌবনের একটানা স্রোত প্রবাহিত হইয়া দেহের সৌন্দর্য্য যে কিরূপ নয়নের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে; তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিশেষতঃ এই প্রথম সসত্ত্বা অবস্থায় তাহার রূপ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এরূপের তুলনা নাই। এই রূপসাগরে পড়িয়া শুধু নবীন বাবু কেন সংযমী পুরুষকেও যখন হাবুডুবু খাইতে হয় তখন নবীন বাবুত কোন ছার? বিমলা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। দুই একখানি গহনা তাহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন না করিলে তাহার মন ভাল থাকিত না। তবে যে তিনি স্বামীকে সে জন্য পীড়ন করিতেন, তাহা নহে। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা হইলেও তিনি স্বামীর মন কষ্ট দিতেন না; তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেন। নবীন বাবু স্ত্রীর গুণে সর্ব্বদাই মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন; সাধ্যানুসারে তাহার মনস্তুষ্টি করিতে, তাহার আব্দার সহ্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। নবীন বাবু পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর কোনও সরকারী আপিসে কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে অর্থের অনাটন ঘুচিতেছে না দেখিয়া আজ কয়েক বৎসর নিজ বুদ্ধি বলে একটী সামান্য ব্যবসা চালাইয়া বেশ সুখে কাল কাটাইতেছেন। এখন তাদৃশ অভাব নাই। নবীনবাবুর সকলেই ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সংসারে বেশ শান্তি-সুখানুভব করিতেছেন। পিতা বর্ত্তমানে কন্যাটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। নবীনবাবু এখন ভ্রাতা দুইটীকে শিক্ষা দান করিতেছেন; তাহারাও এই অল্প বয়সে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সৎদৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। মাতঙ্গিনী পুত্রগণের ও বধূটীর যত্নে বেশ সুখে আছেন।

বিমলা শ্বশ্রূদেবীকে বড়ই ভক্তি করেন, মাতঙ্গিনীও তাঁহার এই সসত্ত্বা অবস্থায় সাতিশয় যত্ন করিয়া থাকেন; বধূর যখন যাহা খাইতে বা পরিতে ইচ্ছা হয়, যখন যাহা আব্দার করেন, সাধ্যমত তাহা প্রতিপালন করিতে মাতাঙ্গিনী ক্রটী করেন না। বিমলা আসন্নপ্রসবা, মাতঙ্গিনী ভগবানের কৃপায় সকল সুখে সুখিনী হইয়াছেন; এক্ষণে দৌহিত্র মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিলেই তাহার জন্ম সফল হয়। গর্ভাবস্থা নারীজাতির বড়ই সঙ্কট সময়, এজন্য তিনি অহরহঃ বিমলার নিকটে থাকিয়া, যাহাতে প্রসবের সময় কোনও কষ্ট না হয় যাহাতে বধূ বিনাকষ্টে প্রসব হইতে পারেন, সে বিষয় নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ সুখ-স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। এরূপ সুখ শান্তির একত্র সম্মিলন কচিৎ কোনও সংসারে দৃষ্ট গোচর হইয়া থাকে।

(২)

চৈত্র মাস; সামান্য ব্যবসায়ীগণের এই সময় কষ্টের একশেষ হয়। এই সময় টাকার আদান প্রদান করিতে না পারিলে, মহাজনগণকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কারবারের স্থায়ীত্ব লোপ হইবার সম্ভবনা। ধনী ব্যবসাদারগণের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাহাদের তাদৃশ মূলধন নাই, কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও গতিকে বুদ্ধির সহিত কারবার চালাইতেছেন, তাহাদের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। নবীন বাবু ব্যবসা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন বটে কিন্তু তাঁহার তাদৃশ মূলধন নাই। নবীন বাবু ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক হইলেও তাঁহার মতিগতি সনাতন ধর্ম্মের প্রতি চিরস্থির বলিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই বলিয়া ভগবান তাঁহাকে এই সামান্য ব্যবসায়েই একরূপ আশাতীত ফল প্রদান করিতেছেন। বিগত কয়েক বৎসর তিনি এই সামান্য ব্যবসায়েই বিশেষ ভাগ্যবান হইয়া পিতার ক্রিয়াকলাপ সকল বজার রাখিয়াছেন। গৃহাদিও বেশ ভদ্রলোকের মত নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু বিগত বৎসর হইতে একটী জুয়াচোরের প্ররোচনায় পড়িয়া অনেক টাকা লোকসান হওয়ায় নবীনবাবু এই আখিরীর সময়ে বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছেন। জননী ও স্ত্রীকে তাঁহার এই উপস্থিত বিপদের কথা বলেন নাই; তাঁহারা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানে না। চির হাস্যময়ী, সরল প্রকৃতি বিমলা এখন আনন্দময়ী; এখন তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীর নিকট কত আবদার করেন। নবীনবাবু এই চিরানন্দময়ীর আনন্দ স্রোতে বাধা দিতে প্রাণে আঘাত পান বলিয়া কিছু বলেন না। কিন্তু আজ তাঁহার মন যেন বড়

ভার ভার। গৃহিণীর সহিত বচসা হইয়াছে; স্পষ্ট ঝগড়া নহে, সেই দুটী প্রাণে এক প্রাণের ভিতর কলহ হইতেই পারে না, তবে, সামান্য মনান্তর মাত্র। মহাজনগণের তাড়নায় তাহার মন ত পূর্ব্ব হইতেই খারাপ হইয়াছে; কি করিবেন, কি হইবে, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই ত চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাহার উপর অকালে স্ত্রীর সহিত একটী সামান্য বিষয় লইয়া বচসা হইয়াছে। এই জন্য তাহার মনে আজ কিছু মাত্র সুখ নাই; মন বড়ই ভার ভার। বহির্বাটীর একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া মুহুর্মুহু তাম্রকুট সেবন করতঃ চিন্তা-স্রোতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যে চিন্তা হৃদয়ের ভিতর একবার প্রগাঢ়রূপে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সামান্য তাম্রকূট সেবন জনিত মাদকতায় তাহার কি হইবে? নবীনবাবুর ললাটপটের শিরা কুঞ্চন ও ক্ষুন্ন বদন-সরোজের বিষাদমাখা ভাব দেখিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে চিন্তা রাক্ষসী তাহাকে ভীষণরূপ যাতনা প্রদান করিতেছে। মুখই হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ, মুখ দেখিয়া নবীনবাবুর হৃদয় বেদনা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি আজ স্ত্রীর সহিত মনান্তর করিয়া কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

এদিকে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া নবীনবাবু ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! আপনারা যদি ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আসুন, আমরা এই সময়ে একবার তাঁহার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করি।

(৩)

নবীনবাবু প্রত্যহ রজনীযোগে আহারাদির পর কারবার সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কার্য্য করিতেন কিন্তু আজ আহারাদির পর তাঁহার আর কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় শরীর অবসন্ন হইয়াছে কাজেই আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীকে শয়ন করিতে দেখিয়া তিনি তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা কথায় স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। বিমলা স্বামীর দুশ্চিন্তার বিষয়, তাঁহার কারবার সম্বন্ধীয় গোলযোগের বিষয় কিছুই জানিতেন না। অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। নবীনবাবু আসন্ন প্রসবা পত্নীকে বেশী রাত্রি জাগরণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি ঘুমাইবার চেষ্টা কর, নতুবা অসুখ হইবে। বিমলা এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই; এক্ষণে স্বামীকে কথা কহিতে দেখিয়া আবদারের সহিত বলিলেন—"তুমি যে কথা কহিলে তাই ভাল। সকাল বেলা একটী

জিনিস চাহিয়াছি বলিয়া কি এত রাগ করিতে হয়; দেখ আমি তোমার কাছে কখন কোন জিনিস চাহি না; এবার কিন্তু আমার ঐ জিনিসটী চাই, মুখ ভার কর্‌লে চল্‌বে না? নবীনবাবুর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল, তিনি প্রণয়িণীর মুখের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাতায়ন প্রবিষ্ট চন্দ্রালোকে দেখা গেল যে সে হাসিতে আনন্দের কোন চিহ্ন নাই; তাহাতে একটুও মধুরতা নাই, অথচ দায়ে পড়িয়া হাসিতে হইলে তাহা যেমন নীরস, কষ্ট হাসি বলিয়া বোধ হয়; এ হাসি সেই প্রকারের, ইহা কান্নার রূপান্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিমলা স্বামীর মনোভাব কিছু বুঝিতে পারেন নাই, অবথা তাঁহার এরূপ মনোভাব দেখিয়া বলিলেন—আজ সকাল থেকে এমনি মুখ ভার করেছ, যেন তোমার কি ভয়ানক বিপৎপাত হইয়াছে, দেখ মিত্তিরদের বড়-বৌয়ের সাধের সময় কেমন কুড়ি ভরির রতনচুড় হইয়াছে, আর আমি তোমার নিকট কখন কোনও জিনিস চাই নাই; আমার এই প্রথম সাধের সময় একছড়া চন্দ্রহার চেয়েছি, ইহাতেই তুমি অকুল পাথার ভাব্‌ছো; তোমার মত কৃপণ পুরুষ ত কখন দেখিনি।

রমণী সদাই বিলাসপ্রিয়; ভূষণ প্রিয় অঙ্গনাগণ ভূষণের জন্য স্বামীর নিকট আবদার করিয়াই থাকে, ইহা তাহাদের মধ্যে একটী স্বভাব সিদ্ধ, সংক্রামক রোগ বিশেষ; মিত্তিদের বড়বৌয়ের হইয়াছে, তিনিও স্বামীকে বলিয়া এবার একখানি গহনা লইবেন; এই সাধের সময় তাহার মনোসাধ মিটাইবেন। কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী ত আর অক্ষম নহেন, স্বামীও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তবে এখন একখানি অলঙ্কার চাহিতে দোষ কি?

বিমলা যুবতী রূপের তরঙ্গে এখন ভাটা পড়ে নাই; তাহার উপর নূতন গর্ভ সঞ্চার হইয়া রূপের জ্যোতি শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। গর্ভ সঞ্চার হইলে স্বভাবতঃই রমণীজাতির অনেক প্রকার সাধ হয় এবং তাহার এই সাধ মিটাইবার জন্য স্বামী মহাশয় শাস্ত্রসঙ্গত দায়ী, এই জন্য আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভ সঞ্চারের পর সাধ দিবার একটা নিয়ম আছে। নবীন বাবু স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন, আচ্ছা! আন্দাজ কত টাকা পড়িবে? বিমলা বলিলেন—কত আর পড়িবে, হদ্দ না হয় দুশো টাকা হউক?

নবীন বাবু টাকার কথা শুনিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আচ্ছা! এখনও ত সময় আছে। চেষ্টা দেখিব।" এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিদ্রা যাইবার ভান করিলেন। বিমলাও স্বামীকে উদাসভাব

দেখিয়া আর কোনও কথা না কহিয়া স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রিতা হইলেন। বলা বাহুল্য যে বেচারা নবীনবাবু সে রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। নানা দুশ্চিন্তার কঠোর দংশনে সে রাত্রি অমনি কাটিয়া গেল।

(৪)

নবীনবাবু প্রাতঃকালে পুনরায় বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। চিন্তা যার সহচরী তাহার কিছুতে সুখ নাই। নবীনবাবু গৃহের এটা সেটা নাড়িলেন; নাড়িতে নাড়িতে একটা কাঁচের গ্লাস ও একটা চিমনী ভাঙ্গিয়া গেল। এরূপে বেলা প্রায় নয়টা হইল; এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া তাহাকে দুইখানি পত্র প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। নবীন বাবু প্রথম পত্রখানি পাঠ করিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন; সে পত্রখানিতে টাকার দায়ে তাহার নামে ছোট আদালতে একটী গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে জানিতে পারিলেন। আর একখানি পত্র তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তাহাতে বন্ধুটী লিখিয়াছেন "যদি ব্যবসায় কোন সুবিধা করিতে না পার, যদি দেনার দায়ে তোমাকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে পত্র পাঠ আসামে আমার নিকট চলিয়া আসিবে। এখানে তোমার একটী ভাল চাকুরী হইতে পারে। নবীনবাবু দুই তিন দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে সুদূর আসাম প্রদেশে পলায়ন করিবেন; ইহাই স্থির করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং আহারে না বসিলে জননী ও স্ত্রীর আহার হইবে না, বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছা স্বত্বে একবার নামমাত্র আহারে বসিলেন। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—নবীন! এ কয়দিন যে তুমি কিছুই খাইতে পারিতেছ না। জননীর কথা শুনিয়া নবীনবাবু বলিলেন—মা! এ কয় দিন আমার শরীর বড় ভাল নাই। এই বলিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া বাটীর বাহির হইলেন। অতিরিক্ত চিন্তায় মানব মন উদাস হইয়া যায়; কোনও কথাই মনে থাকে না। বাটীর বাহির হইবার সময় পত্র দুইখানির কথা নবীনবাবুর আদৌ মনে পড়িল না। পত্র দুইখানি শয্যার উপর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি গৃহবর্হিগমন করিলেন।

(৫)

বিমলা মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যার উপর দুইখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে পত্র দুইখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি বেশ বাঙ্গালা জানিতেন, পত্র দুইখান পাঠ করিতে তাঁহার আগ্রহ হইল, হাতে তুলিয়া লইলেন। একবার মনে করিলেন—তাঁহার পত্র আমার কি পড়া উচিত, পরক্ষণেই মনে হইল—তাহাতে ক্ষতি কি? নির্ম্মল চরিত্র স্বামীর পত্র স্ত্রী পাঠ করিবে,

তাহাতে আর ক্ষতি কি? এই বলিয়া পত্র দুই খানিই আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল; স্বামীর নিকট অলঙ্কার প্রার্থনার কথা তাহার মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া তাহাকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন—হায়! হতভাগিনী আমি কি করিয়াছি; তাঁহার এই বিপদপাতের সময়; তাহার এই ভয়ানক দুর্ঘটনার সময়, আমি তাঁহাকে অলঙ্কারের কথা বলিয়া না জানি কতই মন-কষ্ট দিয়াছি। তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন বলিয়া এত দুঃসময়েও "অলঙ্কার দিতে পারিব না" বলিয়া একদিনের জন্ম মন কষ্ট দেন নাই; আর আমি এ কি করিয়াছি। না জানিয়া তাঁহার এই কষ্টের সময় কত মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত করিয়াছি। ধিক আমাকে, ধিক আমার অলঙ্কার পরিধানে; স্বামীর তুল্য ভূষণ রমণী জাতির আর ত্রিজগতে কি আছে! আমি সেই অমূল্য-ভূষণকে তুচ্ছ করিয়া; সেই ইহ ও পরকালের একমাত্র দেবতা স্বামীকে অবহেলা করিয়া, ছার অলঙ্কারের জন্ম তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়াছি? যাহা হউক আজ সেই সমস্ত স্বামীর মর্ম্মপীড়াদায়ক অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া আমার এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব,—স্বামীর দেনা পরিশোধ করিয়া দিব আর না বুঝিয়া কদাচ তাঁহার নিকট অলঙ্কারের প্রার্থনা করিব না এবং ঋণ পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাতে পুনরায় তাঁহার ব্যবসায় উন্নতির জন্ম মূলধন স্বরূপ প্রদান করিব। তথাপি অভাগিনীর ধনকে দেশান্তরে যাইতে দিব না। এই বলিয়া তিনি দাসীর দ্বারা ন'কর্ত্তাকে ডাকিতে পাঠাইলেন

পাঠক! হয় ত মনে করিতে পারেন, পূর্ব্ব প্রদত্ত অলঙ্কারের দ্বারা ত আর স্বামীর মর্ম্ম-পীড়া উৎপাদিত হয় নাই, তবে এ সকল বিক্রয়ের কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, পত্রে স্বামীর ঋণদায়ে জড়ীভূত হইবার কথা এবং যেই হেতু দেশান্তর পলায়নের কথা পাঠ করিয়া তিনি সমস্ত অলঙ্কারের প্রতিই বীতশ্রদ্ধা হইয়াছিলেন। ন'কর্ত্তা পার্শ্বস্থিত গৃহের মালিক, তাঁহার পিতার পরম বন্ধু; এমন কি বাল্যকালে তাঁহার পিতৃ বিয়োগের পর তিনি ন'কর্ত্তার দ্বারাই একপ্রকার মানুষ হইয়াছেন। এই জন্ম বিমলার নিকট যাইতে তাঁহার কোনও বাধা ছিল না। তিনি বরাবর বিমলার গৃহে গমন করিয়া বলিলেন – বিমলা আমাকে কেন ডেকেছিস্?

বিমলা নকর্ত্তাকে জেঠা বলিয়া ডাকিতেন,

তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি যেরূপে স্বামীর মনকষ্ট দিয়া অশেষ বিধি পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন—তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। নকর্ত্তা বিমলার প্রগাঢ় পতি ভক্তি দেখিয়া শতমুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া বিক্রয় করিয়া আসিলেন। বিমলা সমস্ত গহনা গুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন; কেবল দুইগাছি সুবর্ণ বলয় রক্ষা করিয়া সমস্ত বিক্রয় করিবার জন্য ন'কর্ত্তাকে দিয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ন'কর্ত্তা দুই হাজার টাকা আনিয়া দিলেন। বিমলা বলিলেন—জ্যেঠা মহাশয়! আপনি শ্রীধর বেনের ৫০০৲ টাকা ও রামধন দোকানির পাওনা ২০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া দুই খানি রসিদ লইয়া আমাকে দিন; নতুবা কিছুতেই আমার মনস্থির হইতেছে না। নকর্ত্তা আহ্লাদ করিলেন। বৈকালে দেনা পরিশোধ করিয়া দুই খানি রসিদ আনিয়া বিমলার হস্তে দিলেন। এবং বলিয়া গেলেন, আর কোনও চিন্তা নাই, তাহারা বলিয়াছে, কল্যই মকদ্দামা তুলিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে অলঙ্কার বিক্রয়ের কথা নকর্ত্তা ও বিমলা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না।

(৬)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। এখনও স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন না। বিমলা মহা ভাবনায় পড়িলেন; শয্যাতলে বসিয়া কেবল মধুসূদনের নাম করিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। সতী বিমলার এ ক্রন্দন বোধহয় ভগবানের কর্ণে পহুছিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১২টার সময় তাহার স্বামী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ম্লানমুখে গৃহে আসিলেন। এতক্ষণ বিমলা যেন শূন্য প্রাণে গৃহের ভিতর পড়িয়াছিলেন; এইবার তাঁহার জীবনের জীবনকে গৃহ প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার দেহে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীকে পা ধুইবার জল দিলেন; জলখাবার প্রদান করিয়া স্বহস্তে তামাক সাজিয়া দিলেন। নবীনবাবু সমস্ত দিনের পর জলযোগ করিয়া একটু সুস্থ হইয়া নিমীলিত চক্ষে তামাক টানিতে লাগিলেন॥ এইবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বিমলা ছল ছল নেত্রে তাহার নিকট গমন করিয়া রসিদ দুই খানি প্রদান করিয়া একধারে অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া নতাননে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন, নবীনবাবু ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ দুইখানি পাইয়া আগ্রহ সহকারে আলোর নিকট পাঠ করিয়া প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পরে বিমলার প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন; স্ত্রীকে নিকটে লইয়া তাহার রক্তিমাভ গণ্ডে একটী আনন্দ চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী

কর্ত্তৃক ঋণ পরিশোধ হইয়াছে দেখিয়া নবীনবাবু যে কিরূপ আনন্দানুভব করিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

নবীনবাবু স্ত্রীর অসামান্য চরিত্র ও ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া বিস্মিত ও আহ্লাদে গদ গদ হইলেন এবং মনে মনে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া তাহার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলাম না, আমার জীবনে ধিক্, এই বলিয়া তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন।

গৃহিনী স্বামীর এইরূপ বিলাপ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নিজ অঞ্চলে তাহার প্রাণাধিকের নেত্রজল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবীনবাবুর মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যেরূপে পারি আবার তোমার সোণার অঙ্গ সাজাইব নতুবা আর গৃহে আসিব না। বিমলা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—আমি তোমার অবস্থা না বুঝিয়া এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমায় ক্ষমা কর; তুমিই আমার অঙ্গের ভূষণ; মাথার মণি, আমার অন্য ভূষণে আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে স্বামীর পদধুলি জিহ্বায় লেহন করিয়া মস্তকে প্রদান করিলেন? সেই অবধি স্ত্রীপুরুষে অবস্থার বশীভূত হইয়া আন্তরিক সন্তোষ সহকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কালে বিমলার একটী পুত্র সন্তান হইল; অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া তাহারা পার্থিব ধন রত্নের চিন্তা ভুলিয়া ধর্ম্মভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবীনবাবু স্ত্রীপ্রদত্ত মূলধন লইয়া পুনরায় ব্যবসার উন্নতি করিলেন।

যে হিন্দুর পবিত্র গৃহে এরূপ আদর্শ নারী চরিত্রের পূত চিত্র সতত চিত্রিত, তাহাই স্বর্গের বিমল বিভায় বিভাসিত, তাহাই স্বর্গ। এ অতুলনীয় চিত্র হিন্দুর গৃহ ভিন্ন আর কোনও গৃহে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।।

সোণার পারিজাত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলরতন মাতাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন;—তাঁহার হৃদয় শূন্য, গৃহশূন্য, কাজেই জগৎশূন্য। যে পূর্ণ হৃদয় লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা নৈহাটীর গঙ্গাতীরে হারাইয়া আসিয়াছেন। মাঘমাসের শেষাবস্থা—জগতে বসন্তের ছবি আধফুটন্ত, কিন্তু নীলরতনের বোধ হইতেছে, জগৎটা পৌষের কুহেলিকায়, অথবা শ্রাবণের ধারা

ব্যবায় ডুবিয়া পড়িয়াছে, তাহার আহারে রুচি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, সংসারে মন নাই,—কাহারও সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ নাই, কথা কহিয়া সুখ নাই, ভ্রমণ করিয়া প্রীতি নাই, সর্ব্বদাই বসিয়া বসিয়া ভাবে—আর যন্ত্রণার বৃশ্চিক দংশনে অস্থির হইয়া উন্মাদের মত চারিদিকে উদাসনেত্রে চাহিতে থাকে, সে ভাবিত,—এত লোক মরিয়া গেল, সোণামুখী কেন মরিল না! সে কাহার নিকট অত্যাচারিত হইতেছে, কাহার নিকট পাপের প্রস্তাব শুনিয়া সহায়হীন অবস্থায় দাবানল মধ্যগতা কুরঙ্গীর ন্যায় হতাশে বিহ্বলে কাতরে শূন্যপানে চাহিতেছে,—হয়ত বা নারী কুলের পবিত্রনিধি—আমার বংশের পবিত্র নিধি—তাহার হৃদয়ের পবিত্রনিধি দস্যুকার দানব করে অপহৃত হইবে না হইতেছে!

নীলরতনের মস্তকের কেশরাশি ঊর্দ্ধে উৎথিপ্ত হইত, যন্ত্রণার দারুণ প্রদাহে ছটফট করিত, এইরূপে প্রায় একসপ্তাহ অতীত হইল।

একদিবস প্রাতঃকালে একখানা শীতের বস্ত্র গায়ে জড়াইয়া নীলরতন বাহির প্রকোষ্ঠের অলিন্দায় বসিয়া আছে, এমন সময় থানা হইতে পশ্চিম দেশীয় কনেষ্টবল রঘুবীর সিং তাহার কাণপুরে নাগরাজুতার শব্দ করিতে করিতে সগর্ব্বে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

নীলরতন রঘুবীরকে জানিতেন, কোন একটা অতীতের অশুভ সংবাদ পাইবার জন্য যেন তাহার ব্যথিত বিদীর্ণ হৃদয় উদগ্রীব হইল। নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রঘুবীর সংবাদ কি?"

রঘুবীর নীলরতনের নিকট স্বকীয় পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—"আপনাকে তলব।"

নী। আমাকে?

র। হাঁ, আপনাকে।

নী। কোথায়? থানায় কি?

র। না, আমাদের থানায় কাছে;—নৈহাটীর থানায়, পরোয়ানা আসিয়াছে।

নীলরতন পরওয়ানা চাহিলে, রঘুবীর তাহার স্কন্ধদেশ লম্বিত ঝোলার মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া নীলরতনের হস্তে প্রদান করিল।

নীলরতন তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন,—"আগামী কল্য ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ১৪ইর মধ্যে আমাকে নৈহাটীর থানায় উপস্থিত হইতে লেখা হইয়াছে।"

রঘুবীর মুরুব্বীআনার ভাবে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল,—পুলিসের কাজ, গাফিলাতি করিও না, অবশেষে ওয়ারেণ্ট হইলে, তখন দায় হইবে। সকালের গাড়ীতেই রওনা হইও, আমাকে একটা রসিদ লিখিয়া দাও।"

বড় অন্যমনস্কভাবে নীলরতন রঘুবীর প্রদত্ত একখানি কাগজ হস্তে করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রঘুবীরের হস্তে প্রদান করিল। রঘুবীর সেই কাগজখানি নিজের থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

নীলরতন অনেকক্ষণ বড় অন্যমনস্কভাবে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিল, অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পাড়ার মধ্যে দয়ালদাস মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানে বাহির হইল।

নীলরতন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বয়স ত্রিংশৎবর্ষের উপরে নহে। দেহ সুপুষ্ট—বর্ণ উজ্জল, যাদবপুর নিতান্ত গণ্ডপল্লী নহে -- অনেক ভদ্রলোকের বসতি ও গ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল, থানা, পোষ্টাফিস, বাজার প্রভৃতি সবই আছে, গ্রাম্যস্কুলে পাঠ করিয়া নীলরতন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ;—কিন্তু সেই সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় আর অপর স্থানে গিয়া অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হয় নাই, তাঁহার পিতার তিনি একমাত্র পুত্র, পৈত্রিক লাখেরাজ জমি, বাগান ও দুইটি পুষ্করিণী ছিল, তাহার আয়ে তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার একরূপ বেশ চলিয়া যাইত, কিন্তু সে সকলের তত্ত্বাবধান না করিলে চলে না, বলিয়াই তাহার বিদেশ যাইয়া বিদ্যাভ্যাস বা অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয় নাই। বর্ত্তমানে গ্রাম্যস্কুলে পঞ্চদশমুদ্রা মাসিক বেতনে সে মাষ্টারি করিত। অধুনী অপ্রবাসী হইয়া; মাতৃ স্নেহের ক্ষীরধারায়,—পত্নী প্রেমের পুত প্রবাহে সুখেই দিন কাটাইতে ছিল। কিন্তু কুক্ষণে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছিল, কুক্ষণে বুঝি জীবনের অতিগণ্ডযোগে, অথবা মঘার অভিসপ্ত তিথিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল ;—তাই হৃদয়ের শান্তি, গৃহের শান্তি, সংসারের শান্তি, জীবনের শান্তি, ধর্ম্মের শান্তি, সুখের শান্তি হারাইয়া আসিয়াছে।

দয়াল মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে ডাক হাঁকের লোক। অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে। তিনি সকল কাজেই আছেন, গ্রামের রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তিনি সংলিপ্ত। দলাদলি মামলা মোকদ্দমা ইহাতেও একদলে না একদলে আছেন। ফলকথা তাঁহার সম্পত্তির যে আয় আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার সংসারের ব্যয় সুন্দর রূপেই নির্ব্বাহ হইয়া যাইত,—বরং বৎসরে বৎসরে কিছু সঞ্চয়ও হইত, তিনি ঐ সকল কার্য্য লইয়া নিষ্কর্ম্মা জীবনটাকে সকর্ম্মক রূপে বজায় রাখিতেন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রতাপ অক্ষুন্ন,— সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে বাধ্য, অনেক লোকজন তাঁহার হাতের মধ্যে, তিনি লোকের বিপদে অগ্রসর হয়েন,—প্রজার পক্ষ হইয়া জমিদারের সঙ্গে মোকদ্দমা করেন; অপর জমিদারে অভি-

দারে যখন লড়াই ঝগড়া, মামলা মোকদ্দমা বাধে, তখন একপক্ষে অবলম্বন করিয়া অপরের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন, সদয়বাবু বুদ্ধিমান ও কাজের লোক বলিয়া গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হইয়াছে;—পূজা আহ্নিকে কখনও মনঃসংযোগ করেন কি না, কেহ সে সংবাদ দিতে পারে না, কিন্তু মস্তকে একটি শিখা সগর্ব্বে দুলিয়া দুলিয়া হিন্দুয়ানীর পরিচয় প্রদান করিত।

যখন নীলরতন তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন, তখন সদয়বাবু দীর্ঘোন্নত স্থূল নাসিকার উপরে একখানা চশমা সংস্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি কাগজপত্র উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতেছিলেন। নীলরতনের পায়ের শব্দ পাইয়া ঈষদুন্নত চাহনীতে চাহিয়া দেখিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

যে মাদুরের উপরে বসিয়া সদয়বাবু কাগজ দর্শন করিতেছিলেন, সেই মাদুরের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নীলারণ বলিলেন,—"আপনার নিকটে একটা কথা শুধাইবার জন্য আসিয়াছি।"

স। কি?

নী। এই মাত্র থানার কনষ্টবল্ রঘুবীর সিং আমাকে এক পরোয়ানা দিয়া গেল, ১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে নৈহাটীর থানায় উপস্থিত হইবার জন্য তাহাতে আমার প্রতি আদেশ করা হইয়াছে।

স। কিজন্য?

নী। কিজন্য, তাহা অবশ্য তাহাতে লেখা নাই!

স। যাইবার প্রয়োজন কিছুই বুঝা যায় না, তুমি একটা বিবাহ কর,—তোমার বিষয় আশয় আছে, যাইহোক্ মাসে মাসে কিছু রোজগারও করিতেছ,—বয়সও অল্প; তোমাকে সাধিয়াই লোকে মেয়ে দেবে।

নী। বিবাহের জন্য ভাবিতেছি না। এখন আমার যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, তাহারই পরামর্শ জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।

স। হাঁ, একবার যাইতে হইবে, পুলিসের আদেশ অমান্য করিলে, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

নী। আপনি কি কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন;—কি জন্য আমাকে ডাকিয়াছে।

স। দুইটি কারণ থাকিতে পারে,—এক হয়ত তোমার স্ত্রীর অনুসন্ধানের জন্য পোঁন আয়োজন করিতেছ, তাই তোমার নিকটে তাহার বিষয়, তাহার চেহারা—তাহার নামাদি জানিয়া লইবে; আর নয়ত তাহার সন্ধান পাইয়াছে।

"তাহার সন্ধান পাইয়াছে!'—নীলরতন বসিয়া ছিল, লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল।

সদয়বাবু তাহাকে বসিতে বলিলেন, স্থির হইতে বলিলেন। নীলরতন নিজের অবস্থা ভাবিয়া অপ্রতিভ হইল, এবং যেখানে বসিয়া ছিল, ম্লানমুখে পুনরপি সেই স্থানে বসিয়া পড়িল, সদয়বাবু বলিলেন,—"যদি তোমার স্ত্রীকে পাইয়া থাকে, তবে কি করিবে ?'

নী। কি করিব ? কিছুই করিব না, —যদি সে আমার কথা শোনে, ডাকিয়া বলিব সোণামুখি ! গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলে, আর বাড়ী যাওয়া হবেনা। গঙ্গার ঐ শীতল জলে শয়ন করিয়া, গঙ্গালাভ কর।

কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলিয়া ভাসিতেছিল, সদয়বাবু বলিলেন,উপযুক্ত পরামর্শ স্থির করিয়াছ, কখনও তাহাকে বাড়ী আনিও না। যে যুবতী, এতদিন অমুদ্দিষ্টা —কোথায় ছিল, কে লইয়া গিয়াছিল, যাহার স্থিরতা নাই —তাহাকে হিন্দুসমাজ কখনই গ্রহণ করিবে না, কখনও তাহাকে বাড়ী আনিয়া বংশের কলঙ্ক করিও না।

নীলরতনের বক্ষঃ পাঞ্জর বসিয়া যাইতে ছিল, নিদাঘের আতপ-তাপ-বিদগ্ধ, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-ধূলিকণা-লাঞ্ছিত শুষ্ককণ্ঠ পথহারা পথিকের পাদমূলে কালভুজঙ্গ বিষ ফণা উত্তোলন করিয়া দাড়াইলে,সে যেমন ব্যথিত, উৎকণ্ঠিত, দিশেহারা ও জগৎসংসার ঘূর্ণিত, বিচলিত, বিদলিতও জ্বালাময় দেখে, নীলরতনেরও তাহাই হইল। কি করিতে হইবে, কি বলিতে হইবে—সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, অনেকক্ষণ দীর্ণ, বিদীর্ণ ব্যথিত মথিত বক্ষঃ ধরিয়া সেখানে বসিয়া থাকিল,—তারপরে অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, যদি সোণামুখী বলে, আমায় নিঃসন্দেহ গ্রহণ কর, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র আছি।

স। কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করিবেনা।

নী। না করে, —তাহাকে লইয়া এক-ঘরে হইয়া থাকিব।

স। জগতে আপনার পক্ষ সমর্থনার্থে সকলেই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, সোণামুখী যদি আত্মদান করিয়া থাকে, তবে সে কিছু তাহা ইচ্ছা করিয়া করে নাই ; হয় বল প্রকাশে নয়, ভয়েই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সে কিছু সুখী হয় নাই,—আবার ঘরে ফিরিতে পারিলে,—ঘর সংসার পাইলে, শাশুড়ী ননদ পাইলে, তোমাকে পাইলে সুখী হইবে—কাজেই সে মিথ্যা বলিতে পারে। সে বলিতে পারে, তাহার দেহ নিষ্পাপ, জীবন অকলঙ্কিত আছে। তুমি নিশ্চয় তাহাকে কোন্ প্রমাণের বলে পবিত্রা প্রণয়িনী বলিয়া গ্রহণ করিবে। কেন বংশ মর্য্যাদা, ধর্ম্ম ও পিতৃকুল কলঙ্কিত করিবে ! তুমি আর তাহাকে গ্রহণ করিও না। রন্ধনগৃহে কুকুর প্রবেশের সন্দেহ হইলেই হিন্দুগণ হাঁড়ী ফেলিয়া দেয়। তুমিও তাহাই করিও।

নীলরতনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আগের গিরির তীব্র অনল ছুটিয়া যাইতেছিল। তিনি আর শুনিতে পারিলেন না। আর কোন কথাও কহিলেন না। অতি দ্রুতপদে, উন্মাদের ন্যায় চলিয়া গেলেন।

তারপর বৈকালে পুরোহিত দয়ানন্দ শিরোমণি ঠাকুরের নিকটে গিয়া নীলরতন বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য সকালে নৈহাটী যাব।—সেখানকার পুলীস আমাকে যাইবার জন্ত পরোয়না দিয়াছে। আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, যদি আমার স্ত্রী সোণামুখীকে পাওয়া গিয়া থাকে! বাড়ী আনিতে পারিব কি না?"

শিরোমণি ঠাকুর তাঁহার কেশবিরল মস্তক মধ্যস্থ সুদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ একবার আন্দোলিত করিয়া বলিলেন,—"তা হইতেই পারে না। যে রমণী গৃহ হইতে তথা আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্না—অপহৃতা তাহার পবিত্রতা কোথায়?"

আর কোন কথা কহিতে শ্রদ্ধা হইল না,—ইচ্ছা হইল না, ক্ষত-মস্তক কুকুর যেমন স্থির হইতে পারে না; কোথায় যাইবে, কি করিবে—কোথায় গেলে তাহার যাতনার লাঘব হইবে, তাহা বুঝিতে পারে না—কিন্তু স্থির হইতেও পারে না; অনির্দ্দিষ্ট পথে আত্মহারা, আকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় সে দিবস নীলরতন সেরূপ ভাবেই ছুটিয়া বেড়াইল। রাত্রিতেও নিদ্রা হইল না, পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পুত্রবধুশোকাকুলা জননী আরও ব্যথিতা ও চিন্তান্বিতা হইলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সংবাদ।

সহরে গত কয়েক দিবস হইতে অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সর্দ্দিগর্ম্মিতে কয়েক দিবসের মধ্যে কয়েকটী ঘোড়া ও গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ডাক্তার উমেশচন্দ্র ঘোষ খিদিরপুর রোডে সর্দ্দিগর্ম্মি রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

হরিমোহন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি ডোমজুড়ে কোন আত্মীয়ের বাটী বিবাহোপলক্ষে গমন করিয়াছিল। সে অন্যান্ত ব্যক্তির সহিত ছাদে শয়ন করিয়াছিল। হঠাৎ সে ছাদ হইতে ২০ ফিট নিম্নে পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তাহাকে হাওড়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি পার্জ্জিটার সাহেব ১লা আগষ্ট হইতে এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

এখন হইতে নিয়ম হইয়াছে যে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬ বৎসর কাল পড়িতে হইবে।

সোণার পারিজাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বড় যন্ত্রণায়, বড় দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হইতে না হইতে নীলরতন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, এবং মাতাকে ডাকিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক রেলওয়ে ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখনও গ্রাম সুপ্ত। নীড়ে প্রায় সকল বিহগ নীরব—কেবল নদীকূলে দূরে একটা বকুল শাখায় একটা দয়েল প্রভাতী ধরিয়াছে। তখন দিনের আলো উত্তমরূপে প্রকাশ পায় নাই,—গগনের গায়ে তারকারাজি ম্লান—কিন্তু নিভে নাই। দূরে বৃক্ষ শাখায় তখনও অন্ধকার জড়াইয়া আছে,—নদীর জল তখনও কাল। পূর্ব্ব গগনের উপরে খানিকটা ধূসর—নিম্নে পাটখিলে রং ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নীলরতন একা, ধূলিময় পল্লীপথে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, ষ্টেসনাভি মুখে চলিয়াছেন, পথে একখানা ছইঘেরা গরুর গাড়ী ধূলি উড়াইতে উড়াইতে তাহার স্বাভাবিক মন্থর গমনে ষ্টেসনের দিক্ হইতে আসিতেছিল,—দেখিয়া নীলরতনের প্রাণ একবার চমকিয়া উঠিল, তারপর স্থির হইল, তাহার মনে হইয়াছিল—হয়ত সোণামুখীকে পুলিস আমার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু অচিরে গাড়ীর মধ্যে এক বিপুলদেহী কাবুলী ও তাহার পর্ব্বতাকার মোট দর্শন করিয়া নীলরতন গাড়ীর পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

যাদবপুর হইতে রেলওয়ে ষ্টেসন চতুর্দ্দশ মাইল ব্যবধান হইবে, সুতরাং ষ্টেসনে পহুছাইতে তাঁহার প্রায় বারটা বাজিয়া গেল। অনাহারে ইচ্ছা নাই, তবে রৌদ্রে পথ হাঁটিয়া বড় তৃষ্ণা হইয়াছিল,—তাই এক পয়সার বাতাস কিনিয়া একঘটী জলে ফেলিয়া তাহাই পান করিয়া লইল।

তারপরে একটার সময় গাড়ী আসিলে, তাহাতে উঠিয়া বসিল। বসন্তের প্রথমাগমন—সমস্ত রাত্রি শীতের প্রাদুর্ভাব এবং দ্যাহ্নের অলস উদাস—বিহ্বল বসন্তের আবির্ভাব। সর্ব্বত্র উদাস আকুল উচ্ছ্বাস। নীলরতন গাড়ীর এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রির জাগরণ, পথশ্রান্তি—আর বসন্ত মধ্যাহ্নের অলসিত গতি—এক একবার নীলরতনের তন্দ্রা আসিতেছিল, সে এক একবার ঝিমাইতেছিল। মধ্যাহ্নের গাড়ীতে লোক সংখ্যা খুব কম। দূরে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তিনি ডাকিয়া বলিলেন,—"নিদ্রা

আসিতেছে, গাড়ীতেও লোক নাই, একটু শুইয়া ঘুমাও না কেন?"

নীলরতন একবার উদাস দৃষ্টিতে বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া, কাপড়ের পুঁটুলটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, কিন্তু শয়ন করিলে আর সহজে নিদ্রা আসিল না, নানাবিধ চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে আকুল করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই চিন্তাকে পরাস্ত করিয়া নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিদ্রা গাঢ় নহে, স্বপ্নে জড়িত।

নীলরতন। নিদ্রিত হইবামাত্র স্বপ্নে দেখিতেছিলেন,—"চারিদিকে অন্ধকার—মণ্ডলে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকার- যেমন অন্ধকার, তেমন সূচ্যভেদ্য অন্ধকার নীলরতন কখনও চক্ষে দেখে নাই—সেই অন্ধকার রাশির মধ্যে এক একবার ভীষণ বজ্রাগ্নি চমকিয়া উঠিতেছে—আর কোথা হইতে করুণতমস্বরে কত নর নারী চীৎকার করিতেছে। নীলরতন চীৎকার শুনিতেছিল, কিন্তু যাহারা চীৎকার করিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিবা চেষ্টা করিও দেখিতে পাইলনা। কিন্তু মুহুর্মুহুঃ সেই অন্ধকার রাশিভেদ করিয়া—সেই বজ্রাগ্নির ক্ষণ বিকার, আর আর্ত্তস্বরের করুণচীৎকার। নীলরতন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

সহসা নীলরতনের কণ্ঠ বিশুষ্ক, সমস্ত শরীরের রক্ত হিম ও চেতনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে স্তব্ধ নয়নের স্থির দৃষ্টিতে নীলরতন চাহিয়া দেখিল সেই অন্ধকার রাশিভেদ করিয়া একটি রমণী ভাসিয়া আসিতেছে,—সে রমণী সোণামুখী, সোণামুখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি পুরুষ মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল,—পুরুষটিকে দেখিয়া সোণামুখী ফিরিয়া দাঁড়াইল, সে আসিয়া হাসিতে হাসিতে সোণামুখীর হাত চাপিয়া ধরিল। সোণামুখীও প্রেমের হাসি হাসিয়া আদরে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া গলা ধরা ধরি করিয়া দাঁড়াইল। তারপর, পুরুষটি অঙ্গুলী হেলনে সোণামুখীকে নীলরতনের দিকে চাহিতে ইঙ্গিত করিল। সোণামুখী পাষাণী সোণামুখী উপেক্ষার বক্রত হাসি হাসিয়া পুরুষটির প্রতি সোহাগের চাহনি চাহিল। গভীর গর্জ্জনে বজ্র ডাকিয়া উঠিল—নরকের আগুণ তাহার বিশ্বগ্রাসী লহ লহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সোণামুখী ও তাহার প্রিয়তমকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

নীলরতনের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। অন্তর্দাহের অনল—যাতনায় তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; ঘামিয়া চীৎকার করিয়া সে উঠিয়া বসিল। চারিদিকে যেন সে বজ্রহুঙ্কার আর নরকাগ্নির ভীষণতা দর্শন করিতে লাগিল। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—

বুঝিল, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন কি সত্য? কে বলিয়া দিবে, স্বপ্ন সত্য নহে—অমূলক চিন্তামাত্র। যে বলিবে, তাহার কথা অক্ষর অমর ও সত্য হউক। কিন্তু সে কি সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছে না কোন দৈবীশক্তি তাহাকে সোণামুখীর বর্ত্তমানও ভবিষ্য অবস্থা—বর্ত্তমান ও ভবিষ্য দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত করিয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিল না—গাড়ী তখন দক্ষিণে, বামে বহুল বিটপী, বহুল গ্রাম, বহুল জলাশয় রাখিয়া ছুটিয়া চলিতেছিল, এবং গাড়ীর মধ্যের সেই ভদ্র আরোহীটি আপন মনে সুধাকণ্ঠ নীলকণ্ঠর গীত গাহিতেছিলেন,—

"সজল জলদ অঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে;
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটবর কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে?
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে!
এমন মনোহর মাধুরী না হেরি মহীমণ্ডলে।
উচ্ছ শিখিপুচ্ছ শিরে উচ্চ চূড়া বামে হেলে,
তুচ্ছ করে জাতি ধর্ম্ম, মূর্চ্ছা করে নারীকুলে।
মধুর মৃদু হাসি রাশি সুধা ঝরিত করে;
বাজ করি বাঁশী মন উদাসী করিতে পারে।
নীলকণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে
অচেনায় চিনিতে পারে,
চিনিতে পারে জিনিতে পারে
কিনিতে পারে বিনামূলে॥

গানের স্বরে নীলরতনের প্রাণে কোন্ অদূরে ভবিষ্যতের একটু শান্তি ঢালিয়া দিবার জন্ত আশা প্রদান করিল;—নীলরতন মনে করিল, আরও একটু অগ্রসর হইয়া গায়কের নিকটবর্ত্তী হয়,—বুঝি তাহার গানের মধুর সুরে তাহার দগ্ধপ্রাণের ভীষণ যন্ত্রণার উপরে একটু শান্তি ঝরিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহার মনের বাসনা মনেই রহিল,—সেই সময় গাড়ীর গতি স্থির হইল, আর উচ্চকণ্ঠে বাঁকা ভাষায় একজন কুলী ডাকিয়া গেল—"না—ঈ—হাঁটী।" নীলরতন গাড়ীর দরোজা টানিয়া নামিয়া পড়িল, এবং যন্ত্রণা জড়িত হৃদয়ের উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপরে পুল পার হইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

থানা যে স্থলে অবস্থিত, তাহা নীলরতনের জানা ছিল, সুতরাং কাহাকে কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই নীলরতন একেবারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন,—বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

থানার দারোগা যেমন একটি গোলাপ পুষ্প বামহস্তে লইয়া প্রাঙ্গণ-পাতিত একখানি কেদারায় বসিয়া সুগন্ধি তামাকুর ধূম পান করিতেছিলেন। ধীর পাদক্ষেপে নীলরতন গিয়া তাঁহর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু তাঁহার মুখের দিকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?"

নীল। আমার নিবাস যাদবপুর—যাদব-

পুরের থানার কনষ্টবলের হস্ত হইতে আপনার একখানি আদেশ পত্র পাইয়া আমি আসিয়াছি, আমার নাম নীলরতন রায়।

দা। হাঁ হাঁ—আপনাকে আসিতে বলা হইয়াছিল,—বসুন, রামচরণ!

একজন কনষ্টবল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দারোগাবাবু বলিলেন,—"কলিকাতা হইতে যে দারোগাবাবু আসিয়াছেন, তিনি থানাঘরে শুইয়া আছেন, ডাকিয়া আন। বলিস্, যার বৌ হারিয়েছে,* সেই লোক এসে পৌঁছেছে।"

রামচরণ চলিয়া গেল। নীলরতন ঘৃণায় লজ্জায় জড় সড় হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণপরে কলিকাতার দারোগা বাবু উঠিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। একবার নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া, দারোগাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই ভদ্রলোকেরই বুঝি সেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে?"

কথাটা অনেকটা সুশান্ত ও ভদ্রতার সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্থানীয় দারোগা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, ওরই বৌ হারিয়েছে।"

* কলিকাতার দারোগা অর্থে তিনি রিজার্ভ ডিটেক্টিভ পুলিসের ইন্সপেক্টর। নাম যদু বাবু,—যদুবাবু বি এ পাশ করিয়া পুলীসে প্রবেশ করিয়াছেন।

যদুবাবু বলিলেন,—"আপনাকে আসিতে লিখিয়াছি, আমিই আপনার মোকর্দ্দমার তদন্ত করিবার জন্য আমাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি।—প্রাণপণে আপনার স্ত্রীর অনুসন্ধান করিব—কিন্তু সেই অনুসন্ধান কার্য্যে আপনার সহায়তার প্রয়োজন।"

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীলরতন রায় বলিলেন,—আমার অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই।"

য। কেন?

নী। আর তাহাকে খুঁজিয়া কি হইবে? হিন্দুসমাজ—পদ্ধতি অনুসারে আর তাহাকে গ্রহণ করা যাইবে না। নিজের মনও ভাল বলিবে না।

য। তথাপি অনুসন্ধানে সাহায্য করিতে হইবে। সরকারি কার্য্য বলিয়াই আমার সাহায্য করিতে হইবে।

নী। আমার কি করিতে হইবে?

য। অদ্য রাত্রেই আমার সহিত কলিকাতায় যাইতে হইবে।

নী। কিন্তু আমি দরিদ্র,—পরের চাকুরী করিয়া খাই, সত্বরেই আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

য। দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাইতে পারিবেন। একণে বেড়াইয়া আসুন, সন্ধ্যার পরে কলিকাতায় রওনা হইব।

নীলরতন থানা হইতে বাহির হইল, কিন্তু কোথায় যাইবে? একবার গঙ্গাতীরে গেল—যেখানে সোণামুখী অদর্শন হইয়াছিল, সেখানে যাইয়া চহিয়া চাহিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল,—তাহার জ্ঞান হইতেছিল, সোণামুখী বুঝি তাহারই প্রতীক্ষায় এমনও কোথায় লুকাইয়া আছে। সে ডাকিলেই বুঝি সাড়া দিবে—কিন্তু ডাকিতে গিয়া থামিয়া পড়িল, বেদনাপ্লুত চক্ষু দিয়া জলরাশি ঝরিয়া পড়িল,—তিনি ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ভাগীরথীর দিকে চাহিলেন—ভাগীরথীর জলচর সঞ্চার চঞ্চল জলরাশি স্থির, এবং অস্তগিরির সমুজ্জ্বল শিখরে রজনীর সুদীর্ঘ পক্ষছায়ায় দিবসের শেষ কনক কিরণ আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

চণ্ডীদাসের প্রেম।

প্রথম প্রস্তাব।

অজয় নদীতীরের রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিভোর কবি তরল সংস্কৃতে কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে পর, একই জেলাবাসী আর একজন প্রেমিক, তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বহুত রস ছড়াইয়া বঙ্গবাসীকে এক অপূর্ব্ব অননুভূত অমৃত মদিরাতে বিহ্বল করিয়াছিল। তদবধি একাল পর্য্যন্ত কত শত কবির আবির্ভাব হইল, কত কতজন বৈষ্ণবীয় সখ্য দাস্যের নিগূঢ়তত্ত্ব নিকাষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁদের নাম সরস, সরল,স্বাভাবিক কথায় রাধাকৃষ্ণের সহিত সেরূপ সখ্যতা, সেরূপ দাস্যতা এবং সর্ব্বোপরি সেরূপ প্রণয়ানুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই! চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম এমর জগৎ ছাড়াইয়া অমানুষী প্রেমরাজ্যের সামগ্রী হইয়া আজপর্য্যন্ত আমাদের ভক্তি ও বিস্ময় উদ্রেককরতঃ সগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত আছে। জননী বঙ্গভূমির শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত শান্ত শীতল ক্রোড়ে এখন কোনে সুসন্তান ঘুমঘোরে অচেতন আছেন কিনা, যিনি অদূর ভবিষ্যতে নিদ্রোত্থিত হইয়া সেই অমর কবির রচিত কাব্যোদ্যানের পারিজাত —মধুর কণিকামাত্রেরও অধিকারী হইবেন, তাহা ভবিতব্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন নীরব গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি একই সময়ে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা পদ্য সাহিত্যের উন্নতি কল্পে লেখনী ধারণ করেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া আমাদের ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, সাহিত্যের উন্নতি কল্প তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা। তিনি একনিষ্ঠ

চিত্তে সরল প্রাণে নিজের উদার হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা অবিরনিছনিসুরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—সেই সুর আজিও আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতেছে। তিনি যৎকালে এইরূপ মর্ম্মকথা উদ্ঘাটনে ব্রতী ছিলেন। ভাষা তৎকালে চিরাশ্রিতা দাসীর ন্যায় তাঁহার পদানুসরণ বিশাল সাহিত্য-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে বিদ্যাপতির আশঙ্কা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সংসাধনে প্রধাবিত হইয়াছিল। তাঁহার পদাবলী বহুত উপমা বাহুল্যে ও অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বরে কলঙ্কিত। টিকা টিপ্পনীর সহায়তা ব্যতীত তাহা সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নহে। এক কথায় বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করা আয়াস সাধ্য ব্যাপার। এতৎবিষয় আমি মৎপ্রণীত চণ্ডীদাস চরিত পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

গীতিকাব্যে চণ্ডীদাসের ন্যায় উচ্চস্থান আর কোনো কবিরভাগ্যে ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবে কিনা তাহাও ঘোর সন্দেহ স্থল। চণ্ডীদাস খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এ অংশে বিদ্যাপতিও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস দেখাইয়াছেন যে, প্রেম করিতেই হইবে কিন্তু তাহাতে দুঃখ অনেক, বাধা বিপত্তি প্রচুর। এতৎসত্বেও তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেনা, কেননা দুঃখ কষ্ট আছে বলিয়াই প্রেমে এত সুখ। কঠিন শিলাখণ্ডে ঘসিয়া যেমন চন্দনের সৌরভ বাহির করিতে হয়, দুঃখের পাষাণে প্রেম যত ঘষিবে, ততই উহার সৌরভ বিচ্ছুরিত হইবে।

> যেন মনরঙ্গ অতল,
> অধিক সৌরভময়।
> শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐজন,
> দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।

চণ্ডীদাসের প্রেম কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। এ প্রেম কঠোর দুঃখ তপস্যা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। 'পিরীতি, পিরীতি' তো সকলেই বলিয়া থাকে কিন্তু পিরীতিকি সহজ কথা? পিরীতিকি 'বিরিখের ফল' যে যেখানে সেখানে পাওয়া যাইবে? তাহারই প্রেম তপস্যা সার্থক যে,—

> পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে,
> পিরীতি সাধিবা যে।
> পিরীতিরতণ লভিল সেজন,
> বড় ভাগ্যবান্ সে॥

সেই প্রেমিক, যে—

> পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া,
> পরেতে মিশিতে পারে।
> পরকে আপন করিতে পারিনে।
> পিরীতি মিলয়ে তারে॥

পরকে আপন করিতে পারিলে পিরীতি পাওয়া যায়। নিজকে পরের সম্পূর্ণ অধীন করতঃ তাবেরই ইচ্ছানুসারে চালিত হওয়া

কি সাধারণ তপস্যার কথা? তাই কবি গাহিতেছেন,—

পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশা॥

প্রেম তপস্যা বড় কঠিন। যদি প্রেমে মজিতে চাও, ভেদ জ্ঞান মিটাইয়া এক হইতে চেষ্টাকর। নতুবা তোমার কাদা মাখা সার হইবে, মাছ ধরিতে পারিবেনা। কিন্তু কবি এ কঠোর সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার ও একটু আব্‌ছায়া দেখাইয়াছেন,—

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

এই পথে ধীরে অতি সন্তর্পনে অগ্রসর হইতে হইবে, খুব সাবধান—পদে পদেই পদ স্খলনের সম্ভাবনা। পথ চলিতে আর পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িবে, দুই ঘুচাইয়া এক হইতে চেষ্টা করিবে, কারণ—'ইহা বই নাহি ,আর।' প্রাণের আড়ালে জগৎ ঢাকা আছে। পিরীতি' বলিয়া অক্ষর তিনটী ত্রিভুবনের মধ্যে সারবস্তু আর।

পরাণ সমান পিরীতি রতন,
জুকিনু হৃদয়তুলে।
পিরিতি রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল ফুলে॥

কবি-কল্পনা এখানেই অসীম ছাড়াইয়া অসীমে পৌঁছায় নাই। কবি-তুলাদণ্ডে মাপিয়া জানিলেন, পরাণ হইতে প্রেম অধিক ভারী, কিন্তু এখানেই উহার শেষ পরিণতি নহে; উহা আবার

নিতই নূতন পিতি দু'জন,
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়॥

শেষে মীমাংসা কি হইল?—প্রেমের পরিণাম নাই। চণ্ডীদাস যখন যে বিষয় লিখিয়াছেন, তখনি তিনি তাহাতে ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন। কবিদিগের যাদু ক্ষমতা—হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করা! সে ক্ষমতা চণ্ডীদাসের পূর্ণমাত্রায় ছিল এবং ইহারই জন্ত তিনি প্রকীর্ণ কবিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার স্তায় এরূপ গভীর প্রেমচিত্র আর কোন কবি অঙ্কন করিতে পারেন নাই—বিদ্যাপতিও পারেন নাই। বিদ্যাপতির একটী মাত্র পদ চণ্ডীদাসের পদের সহিত তুলনা হইতে পারে, তাহা অনেকে অনেক-বার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, আমরাও এস্থলে সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি-লাম না।—

সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হামরূপ নেহারিনু।
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু।
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু।
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু।
তবু হিয়ে জুড়ানা গেল॥
যত যত রসিকাজন রস অনুগমন।
অনুভব কহে না পেখে।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলিল একে॥

বিদ্যাপতির ভাষার মাধুর্য্যও রচনার পারিপাট্য আছে, এ বিষয়ে তিনি অধিক প্রশংসনীয় কিন্তু চণ্ডীদাস যে ভাব—যে নূতনত্ব ঢালিতে পটু, তাহাতে তিনি অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাসের ভাষায় শব্দাড়ম্বর কিছুমাত্র নাই, যে কথা বলিলে ভাল শুনায় বা মানায়, সে কথাটি না বলিলে নয়, কেবল সেই কথাটি অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে বসাইয়া তিনি পাঠকের চিত্ত সিধেল চোরের ন্যায় হরণ করিয়াছেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

জীবনের কর্ম্মশেষে কোথা গেলে চলি
ভাবুক প্রবর তুমি গৌরব-কেতন ?
ক্ষণেকের তরে উদি, দীপ্তসূর্য্য যথা,—
বিকাশিয়ে জ্ঞানদীপ্তি, জাগায়েছ তুমি
অলস মানবে স্নিগ্ধ গম্ভীর আরাবে ;
যে আলোক জ্বালায়েছ, ধার্ম্মিক মহান্
মানব-মানস-পটে দীপ্ত-রশ্মি তা'র
রহিবে হে চিরকাল অক্ষয় রূপেতে।
লভিয়ে অশেষ জ্ঞান অতৃপ্ত পিয়াসা
লয়ে সাথে চলিলে কি অজ্ঞাত প্রদেশে
অধিক শিক্ষার তরে, ছাড়ি এ সংসার
ছিন্ন করি স্নেহ মায়া প্রেমের বন্ধন
অথবা বিশ্রাম হেতু শান্তিময় স্থানে ?
যাও তুমি সগৌরবে শান্তিলাভ আশে।
সংসার মরুভূ মাঝে চিরকাল ধরি
কাঁদি মোরা সবিষাদে তোমার বিহনে।
সংসার অনলে তুমি আর না জ্বলিবে
অনন্তকালের তরে জ্বলিব আমরা।
সৃজেছ জগৎ কেন ? হা বিধি নির্ম্মম !
এক ঝঙ্কারেতে যদি চূর্ণিবে পর্ব্বত,
অস্তাচল শিরে যদি পূর্ণ সুধাকর
নিশান্তে পড়িবে ঢ'লি প্রফুল্ল কমল
দিনান্তে যদি গো মুদে সুন্দর বয়ান।
হায় মাগো বঙ্গভূমি, অভাগিনী তুমি
উন্নতি সোপানে উঠ যাহার প্রভাবে
সেই মাগো চলি যায় ছাড়িয়ে তোমায়।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অহল্যা-উদ্ধার।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সুনীতিপূর্ণ সুপবিত্র চরিত কবিগুরু বল্মীকির মোহকরী বর্ণনার প্রভাবে জগতে অক্ষয়বর্ণে বিরাজ করিতেছে। এই চরিত্র সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। মহাকবি ভবভূতি ইহাকে চারিত্র-পঞ্জিকা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। *। বাস্তবিকই ইহা সুচারিত্র্যের পঞ্জিকা ও সুনীতি রত্নাকর স্বরূপ। কবিগুরু বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের মহনীয় চরিত্র এইরূপে গাথাবদ্ধ করিয়া ভারতের যে, অশেষ মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, আজি অধঃপতিত অবস্থায় আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বহুবিধ ধর্ম্ম ও সামাজিক বিপ্লবের পরেও ভারতীয় আর্য্যগণ পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ও দাম্পত্য-প্রণয় প্রভৃতি পবিত্র গুণাবলী অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে এবং আত্মোৎসর্গ ও লোকানুরঞ্জনের এখনও যে, এত আদর রহিয়াছে, বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ তাহার প্রধান কারণ।

মিথিলা রাজ্যের প্রান্তভাগে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম। মুনিপত্নী অহল্যা পতিশাপে সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া সেই তপোবনে উৎকট তপস্যায় নীরত ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার পূর্ব্বশাপ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীরামকে বলিলেন "এই দেবরূপিণী মহাভাগা অহল্যাকে উদ্ধার কর।" গৌতমের শাপে অহল্যা এতদিন সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন; কিন্তু শ্রীরামের আগমনে এক্ষণে নিজ শাপাবসান-কাল অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরামলক্ষ্মণ তাঁহার সেই তপঃকর্ষিত তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া সানন্দে তদীয় চরণ যুগল গ্রহণ করিলেন। গৌতমের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া সাধ্বী অহল্যা শ্রীরামলক্ষ্মণকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন। সেই সময়ে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি নাদিত হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল। দেবগণ তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমবশানুগা সাধ্বী অহল্যায় সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। এই সময়ে মহাতেজা গৌতম হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অহল্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরামকে বিধিবৎ পূজা করিয়া স্ত্রীপুরুষে মহাতপশ্চরণ করিতে লাগিলেন।

বাল্মীকীয় রামায়ণে অহল্যা-উদ্ধার সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে অতিপ্রাকৃতের অল্পই ছায়া

* "প্রতিমন্বন্তরং ভূতৈর্গীয়মানা চরিষ্যতি।'
প্রাতঃ পবিত্রং লোকানামিয়ং চারিত্রপঞ্জিকা।

দেখিতে পাওয়া যায়। বিষয়টী অতীব গুরুতর; সুতরাং বিশদরূপে আলোচনা করা যাইতেছে। গৌতম ইন্দ্রকে শাপ দিয়া অহল্যাকে বলিতেছেন :—

"ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি।
যদা ত্বেতদ্বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি।
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জ্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি॥" *

অনাহারে বাত ভক্ষণ করিয়া তপঃ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা হইয়া এই আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর ভস্মশয়নে বাস করিবি। তাহার পর দশরথাত্মজ দুর্দ্ধর্ষ রাম যখন এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুই পবিত্রতা লাভ করিবি। রে দুর্বৃত্তে! লোভ মোহ বর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিয়া সানন্দে পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলিত হইবি এবং নিজ দেহ ধারণ করিবি।

কথিত আছে অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণী হইয়াছিল, এস্থলে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। পুনশ্চ অহল্যার উদ্ধারকালে বাল্মীকি যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত হইল।

"বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশহ॥
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ
প্রযত্নান্নির্ম্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব।
সাহি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূবহ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্রামস্য দর্শনম্॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা॥
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ।
পাদ্যমর্ঘ্যন্তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা॥"

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন;— করিয়া তপস্যা দ্বারা দ্যোতিতপ্রভা ও সুরাসুরের দুর্নিরীক্ষ্যা মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন বিধি যেন তাঁহাকে পরম যত্ন সহকারে দিব্য মায়াময়ীর ন্যায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃতা অভ্রাম্বিতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা, ও সলিল মধ্যস্থ দীপ্ত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় দুরাধর্ষা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। গৌতমের বাক্যানুসারে শ্রীরামের দর্শন পর্য্যন্ত তিনি ত্রিলোকেরও দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। এক্ষণে

---

* । বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৯ সর্গ।

শাপাবসানে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে আরূঢ় হইলেন। তখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ সহকারে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিলেন এবং অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসমাহিত চিত্তে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য করিলেন।

এস্থলেও পাষাণের মানবীকরণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। অহল্যা গৌতম শাপে সর্ব্বভূতের দুর্নিরীক্ষ্যা অথচ তপস্যা দ্বারা দ্যোতিত প্রভা হইয়া ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা ও সলিল মধ্যস্থা প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি যে পাষাণী হইয়া নির্জ্জীবভাবে তথায় পতিত ছিলেন, একথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মহর্ষি বাল্মীকির এই কয়েকটী কথার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অহল্যা-উদ্ধার ব্যাপারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দেব-ভাবের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। অহল্যা গৌতমের বাক্যে সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন, শ্রীরামকে দেখিয়া সকলের সম্মুখে দেখা দিলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার পাদযুগল স্পর্শ করিলেন। শ্রীরামের আগমনে তাঁহার শাপকালের অবসান হইল জানিয়া তিনি সকলকে দেখা দিলেন। সুতরাং তিনি যে এতদিন পাষাণীর ন্যায় নির্জ্জীব ভাবে ছিলেন এবং রামের পাদস্পর্শে মানবী হইলেন, ইহার কোন স্থলেও সেরূপ কোন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি অহল্যা-উদ্ধারকে শ্রীরামের অতিপ্রাকৃত কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; অপিচ এ কার্য্যে যে শ্রীরামচন্দ্রের দেবভাবও আরোপিত হয় নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অতএব অহল্যা-উদ্ধার বাল্মীকির মতে শ্রীরামের অতিপ্রাকৃত কার্য্য নহে এবং এ কার্য্যে শ্রীরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হয় নাই; বরং একস্থলে নির্ব্বিশেষণ শুদ্ধ দশরথাত্মজ শব্দ দ্বারা শ্রীরামের মানবত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। গৌতম অহল্যাকে শাপ দিয়া বলিলেন "দুষ্টে! তুই পরমেশ্বর শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমার এই আশ্রমস্থ শিলাতলে থাকিবি *।" তাহার পর তাঁহার উদ্ধারের উপায় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, "এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন দশরথাত্মজ শ্রীমান্

* অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড পঞ্চম অধ্যায় ২৭।২৮ শ্লোক।

রামচন্দ্র অনুজ লক্ষণের সহিত আগমন করিয়া চরণ দ্বারা তোর আশ্রয়শিলা স্পর্শ করিবেন, তখনই তুই শাপ হইতে বিমুক্ত হইবি *।" শুদ্ধ ইহাই নহে, শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অহল্যা যে কয়েকটী স্তোত্র দ্বারা শ্রীরামের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তন্মধ্য হইতে কেবল একটী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণীশ্বর নাম ভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা।" †

ইনিই একাকী বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা ; স্বীয় মায়াজনিত সত্ত্বরজস্তম প্রভৃতি গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরিঞ্চি, বিষ্ণু ও শিব এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকেন ; পরন্তু ইনি স্বতন্ত্র, অব্যয়, পরিপূর্ণ পরাত্মা।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামের পূর্ণব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হইলেও, কিরূপ অতিপ্রাকৃত কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে ; সেই সঙ্গে, অহল্যা উদ্ধার উপাখ্যানটী ঐতিহাসিক কি না তাহারও যথাসাধ্য সমালোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বাল্মীকীয় রামায়ণে লিখিত আছে শ্রীরামকে দর্শন করিবা মাত্র অহল্যা পতিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিতেছেন যে, শ্রীরাম স্বীয় চরণ দ্বারা অহল্যার সেই আশ্রয় শিলা-স্পর্শ করিয়াই সেই তপস্বিনীকে দেখিতে পাইলেন ; অর্থাৎ শ্রীরামের চরণস্পর্শে অহল্যার পাপ বিমুক্ত হইবা মাত্র তিনি সকলকে দেখা দিলেন। (বলা বাহুল্য এতদিন তিনি সর্ব্বজীবের অদৃশ্যা হইয়াছিলেন।) অহল্যা উদ্ধার সম্বন্ধে বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণকারের যে, ঐকমত্য নাই, এস্থলে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অহল্যার শাপ ও উদ্ধার প্রসঙ্গে স্বয়ং বাল্মীকি, গৌতম, অহল্যা বা বিশ্বামিত্র কেহই এস্থলে শ্রীরামকে পূর্ণব্রহ্ম অথবা তাঁহার অন্যতম গুণাত্মক বিষ্ণু বলেন নাই *। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার

*। আধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ৩০।৩১ শ্লোক।

†। অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ৫৪ শ্লোক।

* রামায়ণ উত্তরকাণ্ড, ৩৫ সর্গে এ সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। তাহার একস্থলে শ্রীরাম নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তদ্যথা,—

উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি

তাঁহাকে একেবারেই পরাৎপর পরব্রহ্ম নারায়ণ রূপে অবতারিত করিয়াছেন। অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণ যে, অধ্যাত্ম রামায়ণের বহু-পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং বাল্মীকীয় রামায়ণের ছায়া অবলম্বনে যে, অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হইয়াছে, একথাও বলা অন্যায় নহে। মূল গ্রন্থে যাহা নাই, অনুকরণে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই নাই; কেন না অধ্যাত্ম রামায়ণকার শ্রীরামের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ॥
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যে কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাস বর্ণিত আছে, অনেকে সেগুলিকে বাল্মীকি-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই সর্গটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। যদিও বাল্মীকি শ্রীরামের পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ সংক্রান্ত বিবরণ বর্ণন করিবার সময় তাঁহাকে নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি অহল্যা-উদ্ধারের মৌলিক উপাখ্যানে শ্রীরামচন্দ্রের বিষ্ণুত্বের অণুমাত্রও উল্লেখ না থাকাতে একটা বিষম সন্দেহ রহিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ অহল্যাহরণ বৃত্তান্ত বাস্তবিক ঐতিহাসিক কি না এস্থলে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রামায়ণের পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে অহল্যা ও গৌতমের এরূপ কোন বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থেই বিশেষতঃ মহাভারতের স্থানে স্থানে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অহল্যা-হরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায় *। উত্তরাকাণ্ডে অহল্যার জন্ম, বিবাহ, হরণ ও উদ্ধার সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। তাহাতে অহল্যা সৃষ্টির প্রথমা রমণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বয়ং পিতামহ, অমরেন্দ্রের নিকট অহল্যার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহা-দিগের এক বর্ণ, সমান ভাষা, ও একই প্রকার রূপ ছিল; তাহাদিগের দর্শনে বা লক্ষণে কিছুই প্রভেদ ছিল না। সেই প্রজা-কুলের সেইরূপ ভাব দর্শনে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং তাহাদিগের পার্থক্য

---

*। "অহল্যা ধর্ষিতা পূর্ব্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।
জীবতো ভর্ত্তু রিন্দ্রেণ স বঃ কিন্ন নিবারিতঃ॥"
অপিচ, মহাভারতের অন্যত্র ;—
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব।
"অথ শপ্তশ্চ ভগবান গৌতমেন পুরন্দরঃ।
অহল্যাং কাময়ানোঽৈব ধর্ম্মার্থঞ্চ নঁ হিংসিতঃ॥"

সাধন করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎকৃষ্টাংশ লইয়া একটী রমণী সৃষ্টি করিলাম। তাহারই নাম অহল্যা।" অনন্তর ব্রহ্মা অহল্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রকে বলিতেছেন, "হল অর্থে বৈরূপ্য; সেই হলে অর্থাৎ বৈরূপ্যে যাহার জন্ম, তাহাকে হল্যা বলা যায়। যাহার হল্য নাই, অর্থাৎ যে রূপবতী; সেই রমণীই অহল্যা। সেই জন্যই আমার সেই সৃষ্টা বামলোচনা অহল্যা নামে প্রসিদ্ধ।" ইহার পর মহর্ষি গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ; ইন্দ্রকর্ত্তৃক অহল্যা-হরণ, গৌতমের শাপ এবং পরিশেষে অহল্যার শাপ-মোচন প্রভৃতি বিবরণ পূর্ব্বের ন্যায় একরূপই দেখা যায়। কেবল একটী স্থানে অল্প মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয়;—আদি কাণ্ডে অহল্যার শাপমোচন সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহার কোন স্থানেই শ্রীরাম বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু এই উত্তরকাণ্ডে তাঁহার বিষ্ণুত্বের উল্লেখ দেখা যায় *। সে যাহা হউক, অহল্যা যে সৃষ্টির আদ্যা স্ত্রী নহেন, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। তবে এ অহল্যা কে? সেই গৌতম, সেই ইন্দ্র, সেই শ্রীরাম,—সকলেরই উল্লেখ এবং সেই একই রূপ সমাবেশ দেখা যাইতেছে, অথচ আদৌ অহল্যাকে লইয়া বিষম সমস্যা। গৌতম-পত্নী অহল্যাকেই আদ্যা মানবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রবচনের সহিত বিষম বিরোধ ঘটিবে। শ্রুতি স্মৃতির সহিত এস্থলে মহাকাব্যের বিরোধ উপস্থিত; সুতরাং এস্থলে শ্রুতিস্মৃতির বচনই গ্রাহ্য; অতএব এ উপাখ্যানটী কতদূর মৌলিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনেকেই ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যানকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ত বলিবেনই; ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন আচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বামীও ইহাকে রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এস্থলে অহল্যা রজনী এবং ইন্দ্র সূর্য্যের অর্থে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য রজনীকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া রজনীর অর্থাৎ অহল্যার জাররূপে আখ্যাত হইয়াছেন *।

* । পূর্ব্ববর্ত্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

* । (ক) "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

(খ) প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ম্যাক্স্‌মূলর

ইন্দ্রের অহল্যা হরণ বৃত্তান্তের ন্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সাবিত্রী, গায়ত্রী বা শতরূপার হরণ বিবরণও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থ পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে আদৃত

সাহেবও এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তৎপ্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ৫২৯ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

(গ) কিছুকাল পূর্ব্বে "প্রচার" নামক মাসিক পত্রিকায় ইন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে একটী নূতন মত প্রকটিত হইয়াছিল। প্রয়োজন বোধে এস্থলে তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। সেই প্রবন্ধের লেখক অহল্যাকে ভূমি এবং ইন্দ্রকে আকাশ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিতেছেন :—

"সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না,—কঠিন অনুর্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এইজন্য ইন্দ্র অহল্যাজার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন; এইজন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন।"

"প্রচার" ১ম বর্ষ, এবং "বঙ্গ-দর্শন" ১২৮১ সাল ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে, এরূপ রুচি-বিগর্হিত ঘৃণাকারজনক অথচ ব্যাপারের উল্লেখ থাকিবে, এবং যে সকল দেবতা হিন্দুর পরম আরাধ্য বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে, আপনাদের দেবত্ব ভুলিয়া নিকৃষ্ট কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এরূপ পৈশাচিক বা পাশব-ব্যবহার করিবেন, এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে। যদি ইন্দ্রের গুরুপত্নী-হরণ এবং ব্রহ্মার কন্যাভিগমন বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের দেবতার আসন পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পশুর মলদিগ্ধ মহাতলে অথবা পিশাচের প্রেতভূমে বাস করা উচিত ছিল। শাস্ত্রকারগণ যে শাস্ত্রের ও যে সকল দেবতার প্রকৃষ্টতা সাধন করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত অংশ সমুদায়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে, জানিয়া শুনিয়া এরূপ নিকৃষ্ট, হেয় ও ঘৃণ্য ব্যাপারের উল্লেখ করিবেন, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আর একটী বিষয় এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ঋগ্বেদাদি অতি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে "ইন্দ্র" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;—কোথাও সবিতা, কোথাও সূর্য্য, কোনও স্থানে বা আকাশের অর্থে ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পৌরাণিক শচী

পত্তি ইন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র নহেন। পুরাণকারেরা ইন্দ্রের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র সগুণত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদে সেরূপ কিছুই নাই। বৈদিক ইন্দ্রের এইরূপ নানারূপত্ব পৌরাণিক উপাখ্যান রচয়িতৃগণের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে নানা আকারে কল্পিত হইয়াছে; এমন কি ব্রহ্ম, সূর্য্য বা আকাশ বাচক এক একটী শব্দ অথবা বিশেষণ পদ লইয়া পৌরাণিকেরা এক একটী উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের অধিকাংশ আদৌ কাল্পনিক হইলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া প্রায়ই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের অহল্যাহরণ বৃত্তান্ত যে, ইন্দ্রের সেই রূপ রূপক অথবা গুণবাচক বাক্য অবলম্বনে উপাখ্যানাকারে রচিত হয় নাই, তাহা সহজে বলা যাইতে পারে না। বেদে যে পদ বৈদিক ইন্দ্রের সামান্য গুণবাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পুরাণে ও মহাকাব্যে হয়ত তাহা শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব ও অতিপ্রাকৃত কার্য্যের প্রমাণ রূপে একটী উপাখ্যানের আকারে বিস্তৃত হইয়া থাকিবে। পরন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

অহল্যা-হরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখকের রচিত "বীরমালা" নামক বিশাল গ্রন্থে দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে।

আং সং।

গৃহীর কর্ত্তব্য।

হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সকলের শ্রেষ্ঠ। এখানকার যাবতীয় নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে মানব অনায়াসেই ভোগ মোক্ষ করতলগত করিতে সমর্থ হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া গৃহীগণকে পদে পদে পরীক্ষা প্রদান করিয়া আত্মোন্নতি করিতে হয়। ধর্ম্মের সহায় ব্যতীত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আর কোন উপায় নাই। ধর্ম্মই গৃহস্থগণের প্রধান বল, এই বলে বলীয়ান হইতে না পারিলে কেহই সংসারে থাকিয়া উন্নতি করিতে পারিবে না। গৃহ ধর্ম্মময় না হইলে গৃহী ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী না হইলে সংসারে তাহার শ্রেয় নাই। গৃহী মিথ্যাকথা কহিতে সতত ঘৃণা করিবেন, যাহাতে সদাসর্ব্বদা সত্যবাদী হইতে পারেন সে বিষয় সচেষ্ট হইবেন। তবে সত্য কথা বলিয়া কাহার হৃদয়ে যদি আঘাত লাগে কিম্বা কাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে কোনও কথা বলা উচিত নয়। এই জন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন "সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয় ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

গৃহী ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সেবা করিবেন কথনও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেন না।

অথচ কোনও ধর্ম্মের নিন্দা করা কদাচ উচিত নহে, কারণ সকল ধর্ম্মের মূল এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি যেরূপ ভাবেই ধর্ম্মচর্চ্চা করুণ না কেন; সকলেই যে সেই পরম-কারণ, বিশ্বজীবন পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য লালায়িত তাহা কেনা স্বীকার করিবে। প্রথমতঃ নানাবিধ শিক্ষার দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া আপনার চরিত্র মার্জ্জিত করিতে হইবে। অমার্জ্জিত চরিত্র ব্যক্তি কখনও গৃহীনামের যোগ্য হইতে পারে না। চরিত্র মার্জ্জিত না হইলে কখন ধর্ম্মে মতি স্থির থাকিতে পারে না। যে গৃহের গৃহীধর্ম্মে অচলা ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই সংসারে প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ। ধর্ম্মই মানবজীবনের একমাত্র সহায় এবং সেই ধর্ম্মের ধন ভগবানই আমাদের পিতামাতা এবং সর্ব্ববিধ সুখ-দাতা। সংসারে আমরা যখন যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন; সেই একমাত্র কর্ত্তা ভগবান সকল অবস্থার ভিতর হইতেই আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন; এইরূপ বিশ্বাস করিলে —তাঁহাকেই আমাদের একমাত্র মঙ্গলময় নিয়ন্তা জানিলে আর আমাদের ভাবনা কি? এইরূপ বিশ্বাস মনোমধ্যে দৃঢ়তর হইলে আমাদের পাপে দেহমন কলঙ্কিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। গৃহীর ধর্ম্ম বিনা গতি নাই; প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু গৃহস্থের ধর্ম্ম কার্য্য আরম্ভ হয়, হিন্দুর জীবনে এমন কাজ কিছুই নাই, যাহা ধর্ম্মের সহিত সংবদ্ধ নহে? প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়াহ্ন হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত গৃহী যাহা করে, তৎসমস্তই ঈশ্বর পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

প্রাতঃরুত্থায় সায়াহ্নাং, সায়াহ্নাৎ প্রাতঃরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত তদেব তব পূজনং।

প্রত্যহ যাহা করিবে সমস্তই ঈশ্বরোদ্দেশে, —তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য করিবে— ইহাই শাস্ত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন। দেবতার প্রতি যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আনুগত্য প্রদান করিতে হয়; আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা জনক জননীর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধাদি প্রদর্শন করা উচিত, না করিলে প্রত্যব্যায়ভাগী হইতে হয়। ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ পিতামাতাই আমাদিগকে জন্মদান করিয়া লালন পালন করিয়াছেন, ইহ জীবনে আমরা যাহা কিছু সম্ভোগ করিতেছি তৎ সমস্ত তাহাদেরই শ্রীচরণ প্রসাদাৎ অতএব তাহাদের তুষ্টি সম্পাদন করা গৃহী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা মাতা ব্যতীত অন্যান্য গুরুজনগণকেও যথা সম্ভব ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। ভাই ভগ্নী এবং আত্মীয়

স্বজনকে স্নেহ চক্ষে দর্শন করিয়া তাহাদের সেবা করিবে; দাস দাসীগণকে কখনও কটু কথা প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানলাভ না করিলে গৃহী কখনই সংসারে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না। নানা শিক্ষায় পারদর্শী হইলে পর গৃহী ব্যক্তি ধর্ম্মশীলা, সদাচারিণী, গৃহধর্ম্ম সুদক্ষা, সুশিক্ষিতা এবং সদ্গুণ সম্পন্না, সদ্বংশজা জায়ার পাণিগ্রহণ করিবেন। গৃহীর পক্ষে বিবাহ একান্ত আবশ্যক; লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিনীই গৃহের একমাত্র আলোক স্বরূপিণী, অবস্থানুসারে নির্ব্বাচন করিয়া এই রত্ন গ্রহণ করা উচিত, অঙ্গহীনা রুগ্না বা ব্যাধিগ্রস্তা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে। মানুষ যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না।

নির্ব্বাচন সময়ে কোনরূপ রিপু পরবশ বা লোভের বশবর্ত্তী হইলে সে নির্ব্বাচন কখনই মনোমত হইবে না—তাহাতে কখনই সুফলের আশা করা যায় না। একের অধিক পত্নী গ্রহণ করা সংসারীর কোনক্রমে উচিত নহে। আমাদের আর্য্যঋষিগণ প্রায় সকলেই গৃহী ছিলেন; সকলেই মনোমত ধর্ম্ম পত্নী গ্রহণ করিয়া সংসার ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গৃহীর গৃহ একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব বিশেষ; গৃহী ও গৃহিণী এই রাজত্বের রাজা ও রাণী; এই রাজা ও রাণী স্বরূপ গৃহী ও গৃহিণী গার্হস্থ্য ধর্ম্মে পাকা না হইলে, অপরিপক্ক নাবিক কর্ত্তৃক তরণীর অবস্থার ন্যায় সংসার-তরণী ও সর্ব্বদা বানচাল হইয়া থাকে; এইজন্য অধীনস্থ জনগণের কষ্টেরও একশেষ হইয়া থাকে। সংসারী ব্যক্তি নিজ গৃহিনীকে লক্ষ্মী স্বরূপা জানিয়া তাঁহাকে সদা সযত্নে প্রতিপালন করিবেন; অন্তরের সহিত ভাল বাসিবেন। অন্ন বস্ত্র এবং যদি অবস্থা অনুকূল হয় তাহাহইলে অলঙ্কারাদির দ্বারা তাহার মনস্তুষ্টি করিতে অবহেলা করিবে না। সে সংসারে স্ত্রীপুরুষে এক ঐক্য হইয়া সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহাই স্বর্গের সমান এবং তথায় ধর্ম্মের স্রোত স্বতই প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এইজন্য ভগবান যাজ্ঞবল্ক তদীয় সংহিতায় বলিয়াছেন;—

যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে"

স্বামী স্ত্রীর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত হইবেন, স্ত্রীও তদ্রূপ পতিকে আপন দেবতা জ্ঞানে তাঁহার সদ্‌দৃষ্টান্ত প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইবেন; পারিবারিক উন্নতির জন্য তিনিও ভর্ত্তার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। সদা সর্ব্বদা দয়া মায়া ও দানে গৃহীগণ মুক্ত হস্ত হইবেন। পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম যেমন দান, স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম তেমনি সতীত্ব রক্ষা করা—ইরূপে নিগূঢ় প্রেমসূত্রে

আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইহলোকেই স্বর্গ সুখাস্বাদন করিবেন। পত্নীর সহায়তা ভিন্ন গৃহী ব্যক্তির সংসারে কল্যাণপ্রদ অন্য কিছু নাই।

গৃহী ব্যক্তি কখন স্ত্রীপরবশ হইবে না, অথবা স্ত্রীর সহিত কখন কুব্যবহার করিবে না। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তাহার যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করা গৃহীব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। সেই গর্ভে কন্যাই হউক কিম্বা পুত্রই হউক তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাদিগকে লালন পালন করিবে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যত্নের সহিত লালন পালন করিয়া, পরে বিদ্যা শিক্ষার জন্য সতত প্রয়াস পাইবে, কারণ পিতা মাতার উপরই পুত্র কন্যাগণের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুত্রগণ যাহাতে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে, সেবিষয় পিতা মাতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত উচিত। গৃহীগণ সদাচার পরায়ণ না হইলে তাহার সংসারে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না। এই জন্য চলিত কথায় বলিয়া থাকে "আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত"।

পুত্র কন্যাগণ বিবাহোপযুক্ত হইলে; যথার্থ পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কেবল অর্থের লোভে নির্গুণ পাত্র কিম্বা দুঃশীলা পাত্রী নির্ব্বাচণ করিয়া শান্তিময় সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্জলিত করিবে না। অতি লোভ পরিত্যাগ করিবে, সৎপথে থাকিয়া যাহা উপার্জ্জন হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কখন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবে না। প্রাপ্ত-বস্তু পরিত্যাগ করা গৃহীর কর্ত্তব্য নয়। এইজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন "অতি লোভং নকর্ত্তব্য, লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ, অতিলোভাভীভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে।" প্রত্যহ অতিথি সৎকার না করিয়া গৃহী ব্যক্তির জলগ্রহণ করা উচিত নহে। সামান্য ইতর ব্যক্তি হইতে ধনী ব্যক্তির প্রতি সমান সদ্ব্যবহার করিবে। তিনি আয়ের অধিক ব্যয় করিবেন না, সকল বিষয়েই পরিমিত ব্যয়ী হওয়া উচিত। অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া জীবনধারণ করাই গৃহব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। সংসারী ব্যক্তি ঋণ গ্রহণই করিতে বা ঋণ প্রদান করিতে বিশেষ সাবধান হইবেন। এতদুভয়ের অন্তরে থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ঋণপ্রদান করিতে হয়; তাহা আর প্রতিগ্রহণের প্রত্যাশা করিবেন না। ঋণদান করিয়া পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে ভ্রাতার অভাবে সাহায্য করিয়াছেন ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। কাহার নিকট ঋণগ্রহণ করিলে তাহা প্রতিজ্ঞামত যথাসময়ে প্রদান করা উচিত। গৃহী ব্যক্তির মামলা মকর্দ্দামায় লিপ্ত থাকা কখনই উচিত নয়। তবে যদি একান্ত বাধ্য হইয়া লিপ্ত হইতে হয়; তবে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ

করিবেন না। গৃহীমাত্রেরই ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তির বা নিজের পীড়া হইলে অবহেলা না করিয়া অবস্থানুসারে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা রোগের চিকিৎসা করান একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা পাপভাগী হইতে হয়। শোক-দুঃখ ও অভাব জনিত দুঃখে অধৈর্য্য না হইয়া ভগবানে মতিস্থির রাখিলে তাহা অচিরেই বিনষ্ট হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্য স্মৃতি বলিতেছেন "স জীবতি গুণা যস্য যস্য ধর্ম্ম স জীবতি, গুণধর্ম্ম পরিভ্রষ্টো জীবন্নপি ন জীবতি। অর্থাৎ সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আর ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ জীবিত; গুণহীণ অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সংসারে জীবিত থাকিয়াও মৃত। অতএব ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান মানবই যথার্থ সংসারী হইবার যোগ্য; চরিত্রই মানবের প্রকৃত অর্থ; এই অর্থ বিতরণ করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিয়ম প্রণালী শিক্ষা দিয়া মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করিয়াছেন।

গৃহীর সকল বিষয়েই নিয়ম পরতন্ত্র হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার স্নান ও ব্যায়ামাদির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হইবেন; অতি ভোজন, রাত্রিজাগরণ এবং আলস্য পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরনিন্দা, পরকুৎসায় রত থাকা গৃহীব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে মানসিক বলের হ্রাস ও ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। গৃহী ব্যক্তির বাস গৃহ সুসজ্জিত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। গৃহটী দেখিলেই যেন লক্ষ্মীর গৃহ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক গৃহীর গৃহে দেবোপাসনার জন্য এক একটী পবিত্র গৃহ বা ঠাকুরদালান থাকা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল অনেকেই সে প্রথা পরিত্যাগ করিতেছেন। আজ কাল সকলেই ইংরাজী ধরণে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, দেবগৃহ বা ঠাকুরদালান পরিবর্জ্জন করিয়া এখন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের মতে হিন্দুর পবিত্র গৃহ গৃহদেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বর্জ্জিত হইলে তাহা যেন যবনের গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

সংসারী ব্যক্তি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। সংসারীরই পক্ষে সংসারই তাহার ধর্ম্মশিক্ষার আদর্শ স্থান; বাস্তবিক ধর্ম্মের সংসার করিয়া সংসার পাতিতে পারিলে, সে সংসারে ভয়ের কোনও কারণ নাই; মৃত্যু তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না। পাপীই মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে, যে সংসারী পুণ্যাত্মা-ধর্ম্মই যাহার একমাত্র সহায়-সম্বল, তাহার মৃত্যু ভয় কোথায়? সেত সকল সময়েই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, সেত অম্লান বদনে সাহস পূর্ব্বক বলিবে—

"যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
নিয়ত লোলুপ মম মন মধুকর,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত
হে মৃত্যু তুমি তাহার শরণি নিশ্চয়।

কোন রূপে অতিক্রম করিলে তোমায়
সফল হইবে আশা যাইব তথায়।"

গৃহী ব্যক্তি এইরূপ ভাবে নির্লিপ্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সংসারে সকল কাজ করিবেন পুত্র কলত্রাদি প্রতিপালন করিবেন। মাছ ধরিবেন কিন্তু গাত্র যেন কর্দ্দমাকীর্ণ না হয়, এইরূপ ভাবে মতি যেন সেই চিদানন্দ চিন্ময় ভগবানের প্রতি স্থিরা থাকে? কারণ ইহা যে তাহার চিরস্থায়ী বাসস্থান নহে। ইহা যেন মনোমধ্যে সতত জাগরুক থাকে। যখন জগতে আসিতে হইয়াছে, তখন একদিন না একদিন যাইতে হইবে—মৃত্যু আসিয়া একদিন তাহাকে ভবধাম হইতে অনন্তধামে লইয়া যাইবে। সে দিন নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ সে দিনমনি সুতের আগমন অবশ্যম্ভাবি। কখন যে তাহার আবির্ভাব হইবে—তাহা কে বলিতে পারে? এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত থাকা দেহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মৃত্যু কেবল দেহত্যাগ মাত্র; গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

বাসাংশী জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

আমরা ইহজীবনে যেমন ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি। পরজীবনেও সেইরূপ আমরা তাহাকে প্রাণের দেবতা জানিয়া তাহার পদে লীন হইতে পারি। কারণ তথায় একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কেহ সহায় নাই। এক ভগবানের চরণ তরণী ভিন্ন মৃত্যুকালে এই দুস্তর ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি যেন ঈশ্বরের আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, সকল আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া, ভগবদেচ্ছায় ইহ জীবন ধর্ম্মভাবে সম্পূর্ণ হইল ভাবিয়া, তাহারই জয় গান করিতে করিতে মহানন্দে মহাপ্রস্থান করিতে পারিলেই তাহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পতিপালন করা সার্থক হইল। তিনিই যথার্থ ধর্ম্মবীর বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং অন্তকালে তিনি যে সেই ত্রিলোকের কর্ত্তা, ভক্তবৎসল ভগবানের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

সম্পাদক।

অতীতের স্মৃতি।

ডিহিরি অন শোন।

ডিহিরি ও তন্নিকটস্থ মনোরম দৃশ্যাবলীর বিষয় শুনিয়া অবধি ডিহিরি দর্শনাশা বহুদিনাবধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম।

দৈবানুকুল্যে ১৯০৪ জানুয়ারী মাসে ঐ স্থান সমূহের সার্ভে করিতে আমাদের প্রতি আদেশ হয়। ৩রা জানুয়ারী বাঁকিপুর হইতে আমরা ডিহিরি যাত্রা করি। বাঁকিপুর দিয়া ডিহিরি যাইতে হইলে গয়া দিয়া যাইতে হয়। আমরা বেলা ৮টার মধ্যে দক্ষিণহস্তের ব্যাপার শেষ করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। হরি! হরি! এখনো ট্রেন ছাড়িবার একঘণ্টা বিলম্ব। জিনিস পত্র সমস্ত গুছাইয়া লইয়া একখানি ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ি দখল করিয়া, আমরা ট্রেন ছাড়িবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ৩৫কমাস তাঁবুতে বাস করিতে হইবে; সুতরাং শীতের সরঞ্জম প্রচুর পরিমানে লইতে হইয়াছিল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। বাষ্পীয় অশ্ব শ্যামলক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গন্তব্য পথে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে পুনপুনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুনপুন বাঁকিপুর হইতে ৮ মাইল। গয়াধামে গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদানের পূর্ব্বে পুনপুন নদীতে স্নান ও তর্পনাদি করিতে হয়। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানি এখানে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার সময় দিয়াছেন। বেলা ১২ টার সময় গয়া ষ্টেসনে গাড়ি থামিল। গাড়ি কিছু দেরিতে আসিয়াছিল, আমাদের জন্য ডিহিরির গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইলাম। গয়া ষ্টেসনটি বেশ বড়। মোগল সরাই গয়া ও লক্ষীসরাই গয়া লাইনের ইহাই জংসন। আমরা মোগলসরাই লাইনের গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

বেলা ৩টার সময় বারুণ বা ডিহিরি ইষ্ট-ব্যাঙ্ক (Dehri East Bank) ষ্টেসনে গাড়ি থামিল। এখান হইতে প্যালামো যাওয়া যায়। প্যালামো ও ডালটনগঞ্জে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। ছুধির যাইতে হইলে এই পথদিয়া যাইতে হয়। বারুণ শোণনদের তীরে অবস্থিত, ইহা একটি ক্ষুদ্র পল্লী। অপর পারে ডিহিরি, মধ্যে সুদীর্ঘ্য রেলওয়ে পোল। এখানে শোণ নদের প্রস্থ ২½ মাইল।

অনেকে বলেন স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডণ্ডি সহরের টে পোল (Tay Bridge) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ডিহিরির শোন পোল (Sono Bridge) দ্বিতীয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে Progress এ চীন দেশের অন্তর্গত সাঙ্গঙ্গের (Sangong) নিকট পীত সাগরের (Yellow Sea) উপর সিংহ পোল (Lion Bridge) সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে সিংহ পোলকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিতে হয়। পাঠক ও পাঠিকা বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তিনটি পোলেরই দৈর্ঘ্যতা দেওয়া গেল।

সিংহপোল (Lion Bridge) ২৭, ৭২০ ফিট।
টে পোল (Tay Bridge) ১০, ৫২৭ ফিট।
শোনপোল (Sone Bridge) ১০, ০৫২ ফিট।

ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা অপেক্ষা বড় পোল অদ্যাপি নির্ম্মিত হয় নাই। এই পোলটি ৯৩টি প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত থামের উপর নির্ম্মিত। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৩ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৯০৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা খোলা হয়। পোলের দৈর্ঘ্যতা ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই। ইহা অপেক্ষা কইলবারে শোনের উপর যে পোল আছে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর।

পোলের উপর হইতে আমাদের তাঁবু ফেলা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়াই একা করিয়া তাঁবুতে চলিলাম। এখানকার একায় চড়িয়া ডি, এল রায়ের 'বেখোরে বেহারে' একা চড়ার কথা মনে পড়িল। এ একায় চড়িলে প্রাণ 'ছক্কা পঞ্জা' করেই বটে!

তাঁবুতে আসিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। শীতকালের বেলা, ধরণী দেবী ধীরে ধীরে তিমিরাবৃতা হইতে লাগিলেন। ক্ষুধায় পেটে 'দাবানল' জ্বলিতেছিল। কুমুদিনি প্রিয়তমের অভ্যর্থনার জন্য কিরূপ বেশভুষায় সজ্জিত হইতেছিলেন—তাহা দেখিবার অবকাশ ছিল না। তৈজসপত্র ফেলিয়া বামনকে 'চা' তৈয়ার করিতে বলিলাম। চা পানান্তর সর্ব্বশ্রম সংহারিণি তামাকু দেবীর অর্চ্চনায় মনোযোগ দিলাম। রাত্রে আহারাদির কোনই কষ্ট হইলনা, 'চাল চিঁড়ে' বাধিয়াই আনিয়াছিলাম।

প্রাতে উঠিয়াই পোল ও এনিকাট (Annicut) দেখিতে বাহির হইলাম। ইংরাজের বাহাদুরিতে শোননদের দুরাবস্থার পরাকাষ্ঠা। এখানে শোনের প্রস্থ ২½ মাইল হইলেও নদের এপার হইতে অপর পার অবধি প্রকাণ্ড বাঁধ বা এনিকাট দিয়া জল বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। একদিকে কেবল ধু ধু করিতেছে বালুকাময় প্রান্তর। গেটের ছিদ্র দিয়া সামান্য জল যাহা নির্গত হইতেছে তাহাই ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। এনিকাটের অপর পার্শ্বে বেশ জল আছে। এই স্থান হইতে নদের উভয় পার্শ্ব দিয়া ২টি কেনাল (Canal) দীঘাঘাট ও আরা অভিমুখে চলিয়াছে। এই এনিকাটের যে সমস্ত গেট আছে, তাহা খোলা ও বন্ধ করিবার অতি সুন্দর বন্দবস্ত আছে। এত বৃহৎ বৃহৎ গেট একটি কল টিপিলেই সশব্দে খুলিয়া যায় ও বন্ধ হয়। ইহা ১৮৭৪ সালে নির্ম্মিত হয়।

এখানকার সরকারি কারখানা দেখিবার উপযোগী। কলে লোহা কাটা হইতেছে, কাট চেরা হইতেছে, ঢালাই হইতেছে, সমস্তই কলে কাজ হইতেছে।

ডিহিরি হইতে ৬ মাইল দূরে ধাক্ভার পাহাড়ে Stone quarry দেখিতে একদিন গিয়াছিলাম। ডিহিরি workshop হইতে quarry অবধি ট্রলির (Trolley) লাইন আছে। স্থানীয় ওভারসিয়ার বাবু আমাদের

২ খানি ট্রলির বন্দবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। quarry হইতে ২ মাইল দূরে একটি জল প্রপাত (waterfall) আছে। দুধারে সুউচ্চ পাহাড় মধ্যে জল প্রপাত। বর্ষার সময় এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোরম। অন্য সময়ে সামান্য ঝরনায় ন্যায় জল উপর হইতে পড়িতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য এই জলে খেলা করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

পাহাড়ে পাহাড়ে ২ মাইল আসিয়া বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরিষ্কার স্থান পাইয়া এখানে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। আমাদের মধ্যে একজন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গান ধরিলেন।

"নীলাময় নীলানাথ সকলি তোমারি।
ভবলীলা বশে, উদাসীন বেশে,
ভ্রমি নাথ বনে বনে হয়ে ব্রহ্মচারী॥
তুমি ধাতা, তুমি পাতা, তুমিহে জগত পিতা,
তুমি বিশ্ব ভয় ত্রাতা গর্ব্ব খর্ব্ব কারি॥"

বন্ধুবরের গানে তন্ময় হইয়া নীলাময়ের বিচিত্র লীলা কাহিনীর কথা ভাবিতেছিলাম। এমন সময়ে কে বলিল 'গা বেটা গা' চাহিয়া দেখি এক সন্ন্যাসী অদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভরে সকলে প্রণাম করিলাম। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন 'গা বেটা গা'। বন্ধুবর আবার গান ধরিলেন।

"সুন্দর হৃদি রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বনে নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিরত;
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।
ঝলকিছে শত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ,
চরণ ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ,
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন ধায় তোমা পানে
যত ক্রন্দন,
লও হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।"

সন্ন্যাসী আমাদিগকে তাঁহার কুটীরে অতিথী হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমাদের সেই দিনই না ফিরিলে নয় সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তাঁবুতে ফিরিলাম। তাঁবুতে আসিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল।

ডিহিরি হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে সসারাম Sasaram এ হুমায়ন বিজয়ী দিল্লির বাদসাহ সের সাহের সমাধি মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির বাদসহ তাঁহার জীবিত কালে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি একটি পুষ্করণীর মধ্যস্থানে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে একটি ঘণ্টা ঝুলান আছে। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল এত সুন্দর যে প্রত্যেক দ্বার হইতে বিভিন্ন রকম দেখা যায়। মধ্য স্থানে সের সাহের সমাধি ও পার্শ্বে তাঁহার বেগম দিগের সমাধি। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার সমাধি হয়। ১৮৮২ খৃঃ

অব্দে বঙ্গের লাট্ রিপন সাহেব ইহার মেরামত করাইয়া দিয়া তাঁহার মন্দিরের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। সমাধি মন্দিরের অনতিদূরে তাঁহার প্রসাদ অতীতের স্মৃতি স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদ হইতে পুষ্করণী অবধি একটি সুড়ঙ্গ ছিল। বেগম সাহেবরা এই পথে স্নান করিতে আসিতেন। সের সাহের অক্ষয় কীর্ত্তি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড (Grand Trank Road) ডিহিরির মধ্য দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।

ডিহিরি হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণে সূর্য্যবংশ কুলতিলক মহাবীর কুশের নির্ম্মিত রোহিতাসগড়। (Rohtus) অনেকে বলেন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ডিহিরি হইতে গো শকটে যাইতে হয়, ভাড়া ৩৲ টাকা। আমরা একদিন সন্ধ্যা ৬টার সময় আহারাদি করিয়া গো শকটে রোহিতাসগড় গিয়াছিলাম। পথ বড়ই দুর্গম। দু-ধারে কেবল ধূ ধূ করিতেছে মাঠ, মধ্যে মধ্যে জঙ্গল। এই সব স্থানে ব্যাঘ্রের বড়ই উপদ্রব। শুনিয়াছিলাম গাড়ির পশ্চাতে পশ্চাতে লাফাইতে লাফাইতে বাঘ আসে। জ্যোৎস্না রাত্রি, গাড়িতে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। মনে ভয় আছে, বাঘের সাম্‌নে না পড়ি। অতি প্রত্যূষে আকবরপুরে আসিয়া আমরা গাড়ি হইতে নামিলাম। এখান হইতে আমাদিগকে পাহাড়ে উঠিতে হইবে। উপরে খাবার পাওয়া যায় না, সুতরাং খাবার সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। সু-উচ্চ পাহাড় খাড়াই উঠিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। পৌষ মাস তথাপি দর দর ধারে ঘাম পড়িয়া জামা ভিজিয়া গেল। একটুদূর উঠিয়াই বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপ ২।৩ বার পথে বিশ্রাম করিয়া উপরে উঠিলাম। এইখানেই গড়ের সীমা আরম্ভ। প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। কালের করাল কবলে দুর্গ-প্রাচীর লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রায় একমাইল সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া সৈন্য নিবাস দেখিতে পাইলাম। সৈন্য নিবাসের অদূরেই সের সাহের প্রাসাদ। এত-দিনের প্রাসাদ কিন্তু এখনও বেশ রহিয়াছে। সমস্তই পাথরের তৈয়ারী। এখানকার পাথরের খিলান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখান হইতে সাসারাম অবধি এক সুড়ঙ্গ ছিল। সেরসাহ এই সুড়ঙ্গ খনন করাইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। সুড়ঙ্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

পাহাড়ের উপর এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিলাম। সংস্কারাভাবে ইহাতে সকল সময় জল থাকে না। যে সামান্য জল আছে, তাহা শৈবালে পরিপূর্ণ। পাহাড়িয়ারা ইহার নিকটে মহিষ চরাইতেছে। প্রত্যেক মহিষের গলায় এক এক প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাঁধা। ইহার কারণ

অনুসন্ধানে শুনিলাম, পাছে জঙ্গলে হারাইয়া যায়, এই জন্য ঘণ্টা বাঁধা আছে। এখানে বাঘের উপদ্রব খুব আছে। দিবাভাগেও বাঘ দেখা যায়। এস্থানবাসীরা সকল সময় এক-খানি ক্ষুদ্র কুড়ালি সঙ্গে রাখে। কুড়ালি লইয়া বাঘ তাড়াইয়া থাকে। গড়ের সীমা প্রায় ১২ মাইল, দূরে শোননদ সর্পের ন্যায় বক্রভাবে ভাগিরথীর উদ্দেশে চলিয়াছে। এখান হইতে নিম্নের শোভা বড়ই মনোহর।

রোহিতাসগড় আসিবার পথে শিলোটিয়া গ্রামে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দেওয়ানের শিবা-লয় আছে। সমস্তদিন গড়ে অবস্থান করিয়া সন্ধ্যায় সময় নীচে নামিলাম। আহারাদি করিয়া গাড়ি ছাড়া হইল। অতি প্রত্যূষে ডিহিরি ফিরিয়া আসিলাম।

ডিহিরির জল বায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। অনেকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। শোননদের তীরেই ৫।৬ খানি বাঙ্গালা আছে। ভাড়া পাওয়া যায়। এখানে বাঙ্গালির সংখ্যা বড় বেশী নয়। ষ্টেশনের নিকট পল্লিতে জনকয়েক বাঙ্গালি বাস করেন। ডিহিরি বাজারেও জনকয়েক আছেন। রেলওয়ে ও কারখানায় ইহারা কর্ম্ম করেন। ডিহিরি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইলেও এখানকার বাজারে মাছ, মাংস, তরি তর কারি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে হরিণ শাবক ১॥০, ২৲ টাকায় পাওয়া যায়। অনেক সাহেব এখানে শিকার করিতে আসেন। শোননদে প্রচুর চক্রবাক দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে ষ্টীমারে আরা যাওয়া যায়। কেনাল দিয়া যাইতে হয়। এখানে একটি রেলওয়ে ও একটি সরকারি হাঁসপাতাল (Hospital) আছে। এখান-কার রেলওয়ে ক্লবের সহিত আমরা মধ্যে মধ্যে ফুটবল ম্যাচ খেলিতাম। এখানকার প্রধান অভাব স্কুল। স্থানীয় বাবুরা মনোযোগ করিয়া একটি স্কুল স্থাপিত করিলে সাধারণের সুবিধা হয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উষা। মাসিকপত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। ইহা দেখিয়া জানা গেল যে পত্রিকা-খানি দুই বৎসর চলিতেছে এবং নড়ালের জমীদার বংশের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইতেছে। কাগজ ও ছাপা ভাল। প্রবন্ধগুলি আরও একটু ভাল হইলে হইত ভাল।

যমুনা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পত্রিকাখানি বেশ চলি-তেছে, জ্যৈষ্ঠের যমুনায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "নটবর" নামক একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন হইল আমরা এরূপ কবিতা পাঠ করি নাই। ইহাতে পূর্ণবাবুর পূর্ণশক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য কবিতার অংশ কিছু বাদ দিলে ভাল হয়। বৈশাখের যমুনা মোটের উপর মন্দ হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এক পূর্ণ-বাবুর কবিতা ভিন্ন উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ দেখিলাম না।

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ। } শ্রাবণ, সন ১৩১২। { চতুর্থ সংখ্যা।

সম্রাট হুমায়ন

(১)

সম্রাট হুমায়নের এক ভৃত্যের নাম ছিল—জোহর। সম্রাটের পানীয় ও স্নানীয় সর্ব্ব-প্রকার প্রয়োজনের জল তাহাকে যোগাইতে হইত। এই কার্য্য-ব্যপদেশে জোহর সর্ব্বদাই সম্রাটের সঙ্গে থাকিত এবং সম্রাটের মৃত্যুর পরও অনেকদিন জীবিত ছিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ন পরলোক গমন করেন, ইহার ত্রিশ বৎসর পর জোহর 'তেজকিরাত উল-ওকিয়ত' নাম দিয়া পারস্য ভাষায় সম্রাটের রাজত্বকালের এক ইতিহাস প্রকাশিত করেন। অনেকানেক ইংরেজ ঐতিহাসিক এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রায় ৬০ বৎসর হইল, ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রচার করেন। উক্ত পুস্তক অবলম্বনেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

হিন্দুস্থানের সম্রাট হুমায়নের পিতার নাম বাবর, পিতামহের নাম ওমার সেখ, প্রপিতামহের নাম আবু সৈয়দ, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম মহম্মদ মীর্জ্জা, তস্য পিতার নাম মিরণ হোসেন এবং তাঁহার পিতার নাম তাইমুর।

হুমায়নের পুত্রের নাম সম্রাট আকবর এবং আকবরের পুত্র ও ওয়ারিশগণের নাম যথাক্রমে—জাহাঙ্গীর, শাজাহান, আলমগীর আরঙ্গজীব, বাহাদুর শা, ফরাকাশীর, মোহম্মদ, আহম্মদ, আলমগীর দ্বিতীয়, শা আলম, আকবর দ্বিতীয়।

৯১৩ হিজরীতে (১৫০৮ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ন কাবুলে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসরেই তাঁহার পিতা বাদশাহা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কামরণ, তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দল এবং চতুর্থ ভ্রাতার নাম আসকারি। ইঁহারা সকলেই মীর্জ্জা (যুবরাজ) উপাধি স্ব স্ব নামের সহিত ব্যবহার করিতেন। *

* মুসলমানদিগের প্রত্যেক নামের অর্থ আছে। হুমায়ন অর্থ শুভ, কামরণ অর্থ কৃতকার্য্য, হিন্দল—ভারতীয়, আসকারি—শিবিরে সঞ্জাত। অনেকে আসকারিকে জারজ সন্তান বলিয়া মনে করেন।

৯৩২ হিজরীতে (১৫২৫ খৃঃ অঃ) বাবর যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সৈন্য-ব্যূহের দক্ষিণ ভাগ পরিচালনের ভার হুমায়নের প্রতি অর্পিত হয়। হুমায়ন সর্ব্ব প্রথম আফ্‌গানদিগের বিরুদ্ধে সমর-যাত্রা করেন। পাণিপাতের যুদ্ধের পর তিনি আগরানগরী দখল ও সুলতান ইব্রাহিমের ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করিতে প্রেরিত হন। ভাগীরথীর পূর্ব্ব-প্রদেশস্থিত ভূস্বামীগণের সম্মিলিত সৈন্যের গতিরোধার্থ যে সম্রাটসেনা নিযুক্ত হয়, হুমায়ন তাহার অধিনায়ক ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেই তিনি সিদ্ধকাম হওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক ১ কোটী ৭০ লক্ষ দাম (১) পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি আগরায় আস্‌বাব সহ একটী প্রাসাদও পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জোয়ানপুর নগর অধিকার করতঃ বিয়ানার সন্নিকট হিন্দু রাজাদিগের সহিত যে লোমহর্ষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই আহবে ও হুমায়ন মোগল—সৈন্যের সহিত যোগদান করেন। এই যুদ্ধেও তিনি প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন।

যদিও ভারতবর্ষে তাইমুরের সাম্রাজ্যকে মোগল সাম্রাজ্য বলে, কিন্তু তৎপরিবারের ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাহারা প্রধানতঃ 'জাগ্‌তায়ী তুর্কি' ইহারা মোগল অথবা তাতার অপেক্ষা উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু তাহাদিগকে কন্‌ষ্টান্‌টিনেপোলের তুর্কী হইতে বিভিন্ন রাখিবার জন্য এই প্রস্তাবে তাহাদিগকে মোগল আখ্যাতেই অভিহিত করা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটুকু জোহর লিপিবদ্ধ করেন নাই, তিনি হুমায়নের সিংহাসন আরোহণের সময় হইতে ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ সৌকার্য্যার্থে আমরা অতি সংক্ষেপে এই পূর্ব্ব কথাগুলি বলিয়া লইলাম।

সম্রাট হুমায়নের সিংহাসন আরোহণের পর প্রথম ঘটনা,—সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগে বিন্ ও বইজিদ্, আফগান ও মোহম্মদ লোদীর বিদ্রোহ। এই সকল বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে সম্রাট কালিঞ্জার হইতে জোয়ানপুর অভিমুখে সৈন্য পরিচালন করিলেন। গুম্‌তীনদীর তীরে তাঁহার শিবির স্থাপিত হয়, তথায় ৯৩৮ হিজরীতে বিদ্রোহী-দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। বিজয়-লাভের পর সম্রাট, প্রসিদ্ধ শের খাঁর পুত্র জেলাল খাঁর অধিকৃত চুণার দুর্গাভিমুখে সসৈন্য অগ্রসর হইলেন। চারিমাস অবরোধের পর জেলালখাঁ আত্ম সমর্পণ করিলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধিমূলে শেরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল রশিদ তাঁহার অধীন আফগান সৈন্য সহ সম্রাটসেনার সহিত

(১) ৪০ দামে এক টাকা।

যোগদান করেন। অতঃপর তাঁহারা মোগল রাজধানী আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।*

(২)

মোগল সেনা গুজরাট যাইবার পথে চেতুর (Chetur) দুর্গের নিকট পৌঁছিলে, সম্রাট গুজরাটের সুলতান বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি পত্র পান। সুলতান তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, তিনিই কাফেরদিগকে (Infidels) পরাভূত করতঃ মুসলমান ধর্ম্মের কিরণ-রশ্মি উজ্জল করিবার আশায় চেতুর অবরোধ করিয়াছেন। সুতরাং সম্রাট যেন ইহাতে এখন হস্তক্ষেপ না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

সম্রাট স্বধর্ম্মের অনুরাগ বশতঃ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন, এবং দুর্গ হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত সসৈন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুলতান বাহাদুর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে, বাহরক্ষুর জেলার অধীন মারে নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীর অভিমুখে সম্রাট অগ্রসর হইলেন।

এখানে সুলতান বাহাদুরের সেনা তাঁহার গতিরোধ করে। সম্রাট কি ভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহা সর্দ্দারগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে লড়িবেন, এমত অভিমত প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সম্রাট শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিতে ও তাহাদের রসদ্ প্রভৃতি সংগ্রহের পন্থা রোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই আদেশানুসারে কতিপয় মোগল-সরদার কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শত্রু-শিবিরে যাহাতে কোনপ্রকার খাদ্য-শস্য প্রবেশ না করে, তাহার প্রতিবিধান কল্পে 'কসাক্' স্বরূপ কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইভাবে প্রায় তিন মাস যুদ্ধ চলিলে, শত্রুদিগের খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হইল, তাহারা উদরের জ্বালায় অশ্ব-মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই দুঃসময়েও সম্রাট-সৈন্য প্রত্যহ খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিত।

একদা রজনীতে শত্রু শিবির হইতে ভয়ানক গোলযোগ কোলাহল উত্থিত হইল। ইহার অত্যল্পকাল পরেই প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আলা কুলী-সম্রাটের তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইল, সম্রাট তাহাকে গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুলী বলিলেন যে, তিনি অনুমান করেন, শত্রু-সৈন্য পলায়ন করিতেছে, তাহাদের অস্ত্রাগারের 'অধিনায়ক

---

* See History of Bengal, Page 138.

'নেসার-উদ্দীন' হুমায়নের উপাধি। জেহের উদ্দীন ও নেসার উদ্দীন প্রকাশ্য-বাচক,—ধর্ম্মের রক্ষক। প্রত্যেক মুসলমানই মোহম্মদ উপনাম গ্রহণ করিতে পারে।

রুমী খাঁ 'লিলি' এবং 'মুেনোন' নামক দুইটী বৃহৎ কামান ফাটাইয়া ফেলিয়াছেন। এই কথোপকথনের সময় শত্রু-শিবির হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, সুলতান বাহাদুর তাহার সেনা লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। সম্রাট সর্ব্বশক্তিমানকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। পরে সম্রাট অশ্বারোহণে সুলতানের অনুসরণ করিলেন, পথিমধ্যে রুমী খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বলেন যে, তিনি বিপক্ষ পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতে আসিয়াছে।

সংবাদ আসিল সুলতান মালোয়া প্রদেশের মান্ডু দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। বিজয়দৃপ্ত মোগল সেনা তথায় অগ্রসর হইয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কিয়দ্দিবস অন্তর সুলতান মান্ডু দুর্গ হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া চাম্পানীয়ারের সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে মোগল-সেনা মান্ডু দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় বহুতর ধন রত্নাদি পাইল। সম্রাট তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বিপুল আগ্রহের সহিত সুলতানের অনুসরণ করিয়া গুজরাটের রাজধানী চাম্পানীরে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। * এই অবরোধ সময়ে একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া গোপনে সম্রাটকে জানাইল যে, সে একটী পর্ব্বতের শিখর দিয়া একটী সহজ পথ দেখাইয়া দিতে পারে। আগন্তুকের কথায় বিশ্বাস করিয়া সম্রাট গোপনে কেবলমাত্র দুইজন রণবাদ্যকর, কয়েকজন তুরী নিনাদকারী ও একদল সাহসী যোদ্ধা লইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন এবং অতি কষ্টে একটী পার্ব্বতীয় বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশলাভে সক্ষম হইলেন। সম্রাট অতঃপর রণবাদ্য বাজাইতে ও তূর্য্য-নিনাদ করিতে আদেশ করিলেন এবং সরদারগণ একত্রে চারিধার হইতে বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। অসতর্কিত বিপক্ষ সৈন্য এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া, পরিত্রাণের উপায় দেখিতে লাগিল, কয়েকটী বিপক্ষদল দুর্গ হইতে পলায়ন করিল, সুলতান বাহাদুরও ক্যাম্বের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এবম্প্রকারে সম্রাট এই প্রসিদ্ধ নগর উঁহার সমুদয় রসদাদি সহ স্বাধিকারে আনয়ন করিলেন কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কোন ধনরত্ন পাইলেন না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর আলমখাঁ নামক সুলতান বাহাদুরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী সম্রাট সদনে আসিয়া কুর্নিশ করিলেন। ঐ নগরের ধনরত্নাদি কোথায় লুকাইত আছে তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য, সম্রাটানুচরগণ আগন্তুককে বন্দী ও যাতনা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল কিন্তু

* See dow's History of Hindustan, Vol II, Page 144, and also Ediuburgh Gazetteer.

সম্রাট বলিলেন,—"এই ব্যক্তি স্বইচ্ছায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহার উপর বল প্রয়োগ করা অসাধুতার পরিচায়ক। যদি নম্র ব্যবহারে কার্য্য উদ্ধার হয় তবে রূঢ় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন কর এবং তাহাকে মদ্য দ্বারা একবারে সংজ্ঞাশূন্য কর। তৎপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও এনগরের ধনরত্ন কোথায় আছে?"

সম্রাটের আদেশানুযায়ী একটী ভোজের আয়োজন হইল, সেই দিবস আলমখাঁকে অতিরিক্ত মদ্য পান করাইয়া মত্ত করিয়া অনুচরগণ ধনরত্নের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। আলমখাঁ মোগলের এই সাদর সমাদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিল, উক্ত প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসিত হইবা মাত্র তিনি বলিলেন, সম্রাট যদি সুলতানের ধনরত্ন লইতে ইচ্ছা করেন, তবে গোসলখানার জলরাশি অপতারিত করা হোক্। এই সংবাদ সম্রাটকে জ্ঞাপন করা হইলে, তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হইতে চলিল, যখন মোগল ভৃত্য সকল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত, আলমখাঁ তৎকালে তথায় যাইয়া বলিল যে, এভাবে কার্য্য করিলে পাওয়া যাইবে না। তিনি ভৃত্যাদিগকে স্নানের স্থানের নিম্নে খনন করিতে উপদেশ দিলেন, তাহাতে একটী পয়ঃপ্রণালী ও একটী মুখ আচ্ছাদিত গর্ত্ত প্রকাশিত হইল। গর্ত্তের আচ্ছাদন উন্মোচন করতঃ জলরাশি নির্গত করিলে প্রচুর পরিমাণে ধনরাশি বাহির হইল। ঐ ধনরত্ন তৎক্ষণাৎ মোগল সেনাগণের মধ্যে বিতরিত হইল, প্রত্যেকে স্ব স্ব পদ মর্য্যাদা অনুরূপ ধন প্রাপ্ত হইল। তাহারা তৎপর স্বর্ণ ও রৌপ্য পূর্ণ একটী কূপ আবিষ্কার করিল। ঐ ধাতুদ্বয় গলাইয়া Ignot হইয়াছিল, সুতরাং তাহা সৈন্যগণ স্পর্শ করিলনা।

সম্রাট তৎপর তার্ডিবেগকে চাম্পানীরের অধিনায়ক করিয়া সুলতান বাহাদুরের অনুসরণে ক্যাম্বে অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীগণ ছলনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, এই অভিযোগের যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুলতান বাহাদুরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করা, তাহা ভগবানের কৃপায় সম্রাটের সিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রভূত ধনরত্নও হস্তগত হইয়াছে। এখন সৈন্যগণকে দুই এক বৎসরের অগ্রিম মাহিয়ানা দিয়া অবশিষ্ট টাকা ভবিষ্যতের প্রয়োজনের নিমিত্ত আয়ত্ত মত রাখা এবং সুলতান বাহাদুরকে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ গুজরাট প্রদেশের শাসন কর্ত্তা পদে নিযুক্ত করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করি। ইহাতে সম্রাটের সদাশয়তা প্রকাশিত হইবে ও বংশঃ সৌরভের গৌরব বৰ্দ্ধিত

হইবে। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের নিজের রাজ্যের অপর অংশের প্রতি বিশেষতঃ রাজধানী আগরার সুব্যবস্থা করার অবসর হইবে। কারণ তথা হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে যে, মোহম্মদ জেমান সুলতান এবং আরো কতিপয় প্রধান প্রধান সরদার বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ অযাচিত উপদেশ শ্রবণে সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তরবারীর সাহায্যে এই মূল্যবান প্রদেশ পদানত করিয়া কি খালি খালি ছাড়িয়া দিব? না, আমি ইহা রক্ষা করিব এবং দিল্লী সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিব।"

মন্ত্রীগণ যখন দেখিলেন যে, সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না, তখন তাঁহারা যুবরাজ আসকারীকে (হুমায়নের ভ্রাতা) তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া চলিয়া যাইতে এবং দিল্লী প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আসকারী তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে যুবরাজ যোজগার নাসির গোপনে চম্পানীরের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিলেন যে, সম্রাট তাঁহাকে দুর্গের ও রাজ-কোষের ভার লইতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাডিবেগ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, সম্রাটের নিকট ঘটনা লিখিয়া পাঠাইয়া আদেশ প্রার্থনা করেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন যে, দুর্গও ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ তুমিই করিবে। কিন্তু সম্রাট যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মন্ত্রীগণই যুবরাজ ও সরদার গণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, এবং নানাস্থানে সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহার বলক্ষয় করিতেছে, তখন তিনি সৈন্যগণকে একত্রিত হইবার আদেশ দিয়া আহাম্মাদাবাদ (১) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি নানারকম বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি সুস্থ শরীরে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সম্রাট আগরায় প্রত্যাগমন করিলে সুলতান বাহাদুর সুরাটের পর্ত্তুগীজদিগের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং তাহাদেরই সাহায্যে ৬০০০ হাজার আবিসিনিয়ান ও নিগ্রো সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আহাম্মাদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

হুমায়নের গুর্জরাজ অভিযানের মধ্যে যে বিদ্রোহীতা প্রকাশ পায়, তাহারই বিবরণ এখন লিপিবদ্ধ করিতেছি। সম্রাট যে সময় গুজরাট পদানত করিতে ব্যস্ত, মোহম্মদ জেমান সুলতান (তাইমুরের বংশধর (২)

(১) এখন গুজরাটের রাজধানী; ১৭৮০ ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

(২) সুরাটের প্রসিদ্ধ সুলতান হোসেনের পুত্র। See Catalogue of Tipoo's Library.

ও ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের প্রিয় পাত্র) সম্রাটের অবর্ত্তমানে সুযোগ বুঝিয়া, ভাগীরথীর উত্তর পূর্ব্বের প্রদেশ সমূহ অধিকার এবং বেলগ্রামে নিজ আবাস নির্দ্দিষ্ট করেন। তাঁহার পুত্র আলেগমীর্জ্জা একদল শক্তিশালী সৈন্য লইয়া জোয়ানপুর কুর্‌রা এবং মানিকপুর প্রদেশ আক্রমন করিতে প্রেরিত হন। আগরার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা সম্রাটের কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ হিন্দল এই সংবাদ জ্ঞাত হইবা মাত্র সসৈন্য কনোজ (Canowge) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুলতান মোহম্মদও তাঁহার সেনাদল একত্রিত করিল, গঙ্গার উত্তর তীরে মোগল সেনার প্রতিধ্বনীতা করিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। উভয় পক্ষের সেনা দল এই স্থানে অনেকদিন অবস্থান করে। হিন্দলের চর কনোজের দশ মাইল উপরে গঙ্গার এক স্থানে অল্প জল দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে যুবরাজ বিপক্ষের অলক্ষ্যে রজনীযোগে সৈন্য সামন্ত লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন।

রজনী প্রভাত হইলে উভয়পক্ষ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম হইতে ভয়ানক ঝটিকা উত্থিত হইয়া ধুলিপটলে আকাশ মার্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, দিবাভাগে এমনি অন্ধকার হইল যে বিদ্রোহীগণ শত্রু ও মিত্র সহসা চিনিতে অক্ষম হইল। এমতাবস্থায় তাহারা জোয়ানপুর অভিমুখে পলায়নপর হইল। যুবরাজ হিন্দল বেলগ্রাম দখল করিয়া, বিপক্ষের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া অযোধ্যার সন্নিকট আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রবল হওয়ায়, খণ্ড যুদ্ধে অনেকদিন অতিবাহিত হয়। অবশেষে মোহম্মদ সুলতান যখন শুনিলেন যে, সম্রাট সুস্থ শরীরে এবং নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি আর বেশীদিন যুদ্ধ করিতে আশঙ্কা করিয়া, সপরিবারে বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী কুচবিহার প্রদেশে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ হিন্দল জোয়ানপুরে অগ্রসর হইয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

আসিবে বলিয়া।

তুমি আসিবে বলিয়া হে।
আমি তারকা কুড়ায়ে মালিকা গেঁথেছি,
নবীন নীরদ ধরে শূন্যতা সৃজেছি;
আমি কুড়ায়ে রেখেছি হে।
চাঁদিমা হরিয়ে হৃদি চাঁদেরে গঠেছি,
মারুত কণায় কত নিশ্বাস ফেলেছি;
তুমি আসিবে বলিয়া হে।
যেখানেতে যত যা কিছু সুন্দর হেরি,
লাল নীল আভা কিবা মনোহর মরি;
সব কুড়ায়ে রেখেছি হে।

তুমি আজিকে আসিবে আগে বলেছিলে,
তাই ধরিয়ে-রেখেছি বসন্ত অনিলে ;
তুমি আসিবে বলিয়া হে।
নীলাম্বর হয়ে নিজ অম্বর রচেছি,
বিহগের গীত শুনে আপনি গেয়েছি ;
শুধু তোমার তরেতে হে।
কুসুম সুবাস হরে সুবাস মেখেছি,
শশধর হাসি হরে অধরে রেখেছি ;
তুমি দেখিবে বলিয়া হে।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষায়।

(কবি ও কবি-প্রিয়া)

কবি। প্রিয়ে, হের কি সুন্দর, নব-জলধরে
বিজলী-তরঙ্গ ভঙ্গ।
ক-প্রি। ওমা! মেঘ দেখে যেগো,
ভয়েতে আমার
শিহরি উঠিছে অঙ্গ!
কবি। হের, খেলিছে দু'জনে,
সোহাগে কেমন
পবিত্র প্রেমের ভরে ;
ক-প্রি। ওই আসিতেছে বৃষ্টি,
ভিজিয়া মরিব,
এই বেলা চল ঘরে।
কবি। হায়, পিপাসীচাতক,
আমি যে তোমার,
তুমি মম কাদম্বিনী,
ক-প্রি। কেন, গ্লাস ভরা জল,
ছিল যে শিয়রে,
ঘুম হ'তে উঠে খাওনি?
কবি। হায়, আজন্ম-তৃষিত হৃদয় আমার,
কর প্রেম সুধা দান,
ক-প্রি। ওই পিঁড়ি দিয়ে ঢাকা,
রয়েছে ওখানে,—
করে এস জলপান!
কবি। এস, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রেম-আলিঙ্গনে,
জুড়াই হৃদয় খানি,
(হস্ত ধারণ)
ক-প্রি। র'য়ো, জলপ'ড়ে বুঝি,
ভিজিতেছে খোকা,—
বিছানা সরায়ে আনি।
কবি। যাক্ দূর হক্ মেনে,
হতভাগ্য খোকা,
বাধা দিতে চাহে প্রেমে,
ক-প্রি। ছাড়, খোকা যে আমার,
ভিজে সারা হ'ল,—
কেঁদে কেঁদে গেছে ঘেমে!
কবি। হায়, ধিক্ বঙ্গনারী,—
আব অশিক্ষিতা,—
ধারেনা প্রেমের ধার,
(হস্ত ত্যাগ।)
ক-প্রি। ওগো, তোমাদের মত,
শিখিতাম যদি,
সবি হত ছারখার!
শ্রীঅটলবিহারী দাস।

গুরু ও গুরু-বাক্য।

"গুরু" শব্দের প্রাণী বাচক ব্যুৎপত্ত্যর্থ;—ঈশ্বর বা শ্রেষ্ঠব্যক্তি। অন্যত্র;—ভারি বা কঠিন পদার্থকে "গুরু" বলে। যিনি;—সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশের কর্ত্তা (পরমেশ্বর); তিনি সকলেরই গুরু। তিনি ব্যতীত;—নিজাপেক্ষা বলবান, জ্ঞানবান, ধনবান ও সম্পত্তিশালী অথবা যে কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে এবং কঠিন, কোমল, সুন্দর, ভারি, মূল্যবান্ ও আয়তন বিশিষ্ট পদার্থকে "গুরু" শব্দে অভিহিত করা যায়। সুতরাং মজুর হইতে রাজ রাজেশ্বর পর্য্যন্ত এবং কীট পতঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠতম প্রাণি-সমাজ পর্য্যন্ত অথবা সামান্য তৃণ-গুল্ম হইতে বৃহৎ পর্ব্বত-দেহ ও বনস্পতি পর্য্যন্ত এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকা-রেণু হইতে বিরাট আয়তন বিশিষ্ট অগণ্যগ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত, মানবীয় ধারণার অতীত অসীম সৌর-জগৎ পর্য্যন্ত; কাহারও কোথায়ও গুরুর অভাব থাকিতেছে না। গুরু, সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহে অবস্থিত। তিনি;—বিপদে সকলের সাহায্যকারী; সম্পদে—সহানুভূতিকারক। তাই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অবনমিত মস্তকে গাহিয়াছেন;—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥"

আবার গাহিয়াছেন;—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥"

শাস্ত্রে লিখিত আছে; মনুষ্য-সমাজে পাঁচ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। যথা;—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনিতাচোপনেতাচ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ; যিনি প্রতিপালক (প্রভু); যিনি ভয়ে বা বিপদে মুক্ত করেন (রাজা বা সমাজ পতি); যাঁহার কন্যাকে বিবাহ করা গিয়াছে (শ্বশুর); পিতা এবং উপদেষ্টা (মন্ত্র দাতা বা শিক্ষক); এই পাঁচ জনেই পিতৃ-পদে বরিত হন। অর্থাৎ;—তুল্যরূপে সকলেরই গুরু হন।

সামান্য জলাশয়াপেক্ষা লঘুতর "গোষ্পদ" এবং বৃহৎ জলাশয়কে "গুরু" বলাযায়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বৃক্ষ "লঘু";—বৃহৎ বৃক্ষ "গুরু"। ইতরপ্রাণী হইতে ইতরেতর প্রাণী "লঘু";—শ্রেষ্ঠপ্রাণী "গুরু"। রাজা অর্থাৎ জন—সাধারণের প্রতিনিধি হইতে, প্রজা অর্থাৎ জনসাধারণ—"লঘু"; প্রজা হইতে রাজা "গুরু"। ভারবহনে অর্থাৎ মোট বা বোঝা হইতে এবং রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিতে, আমাপেক্ষা আমার কুলি-মজুর "গুরু";—বিলাসিতায় আবার তাহাদের অপেক্ষায় আমিই "গুরু"। এইরূপ; পরস্পরের তুলনায় পরস্পরের "লঘুত্ব—গুরুত্ব" অনুমিত

হইয়া থাকে। পাঠক! লঘুত্ব-গুরুত্ব কিম্বা গুরু শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন? এখন গুরুর মহত্ব এবং গুরু-বাক্য যে বেদতুল্য অলঙ্ঘনীয় তাহাই বিবৃত হইতেছে।

যিনি জন্মদাতা (পিতা); সকলের তিনি মহাগুরু। কারণ যে; তাঁহারই প্রসাদে—অস্থি, মাংস, বসা, শোণিতও সুখ-দুঃখ বিজ্ঞড়িত, দিব্যজ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্য-জীবন লাভকরা গিয়াছে। এবং সন্তান কিরূপে সুশীল, সুবিদ্বানও অতি সুখী হইবে; এচিন্তা তাঁহারই মনে সতত উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং; জগতে তাঁহার তুল্য গুরু আর কেহই নহেন। তাঁহার আদেশ অভিলাষ সর্ব্বথা রূপেই পালনীয়। কিন্তু;—শৈশবে আবার তাঁহারই শাসন নিতান্ত অসহনীয় হয়। কারণ যে; সমবয়স্কদিগের সহিত স্বেচ্ছামত অধিকক্ষণ খেলা করিতে কিম্বা বেড়াইতে দেখিলে—তখনই রুষ্ট হইয়া থাকেন। অশনে, বসনে আমোদে, আহ্লাদেও তাঁহার সতর্কতা লইতে কোনও দিন ত্রুটি দেখা যায় না। বলিতে কি? তাঁহারই ভয়ে শৈশবে আমার কোনরূপ কুইচ্ছাই সাধিত হইতে পারে নাই। তাঁহার এইরূপ দুরপনের কঠিন শাসনাধীনে থাকিয়া;—আমার শৈশব কালটি গত হইতে না হইতেই বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকের হস্তে সমর্পিত হইলাম। সেখানে গিয়া, আরও অধিক বিপদ গণিতে হইল। খেলা করিয়া, বেড়াইয়া কিম্বা আমোদ—আহ্লাদ করিয়া যদি সময় নষ্ট করি; সেই জন্য, সদ্য আনীত চোরের ন্যায় আমার হাত, পা বাঁদা না থাকিলেও; শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ ব্যতীত, মুহূর্ত্তকালের জন্যও গৃহের বাহিরে যাইতে কিম্বা বসিবার আসন খানিও কোন দিন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। দিবসের অর্দ্ধভাগ কেবল একস্থানে বসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত, একটী কথা কহিবার যো ছিল না। অতঃপর উত্তমরূপে শিক্ষা পাইতে, তাহার প্রত্যেক কথায় মনোযোগ না রাখিলে; আমার নিস্তার ছিল কি? এইরূপ অতিকষ্টে প্রথমে পিতার, পরে শিক্ষকের মনরক্ষা ও আদেশ প্রতি পালন করিয়া; বিষয়-কার্য্য শিক্ষা করিতেই জীবনের অর্দ্ধভাগ গত হইল।

যখন নির্ম্মেঘ শারদ-গগন-পটে নক্ষত্র বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয় শোভায়, সুখময় যৌবনকালটি ইন্দ্রিয় সকল লইয়া, আমার এই ক্ষুদ্র দেহখানি সুন্দর হইতেও সুন্দরতররূপে প্রতিভাসিত করিল;—তখন পরম সৌভাগ্যবতী, অতি সৌন্দর্য্যময়ী, কোমল প্রাণা (সুশীলা বা দয়াবতী), পতি পরায়ণা, উপযুক্তা (বয়ঃপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা) পত্নীর সহিত সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাবিলাম;—এখন হইতে আমার

অধীনতা-পাশ পূর্ণচ্ছেদিত হইল। পিতা, যদিও জীবিত; তিনি এখন বৃদ্ধ—অতিজরা গ্রস্ত। লোকে বলে;—"বুড়ো হ'লে বাহাত্তরে (নির্ব্বুদ্ধি বা মন্দ বুদ্ধিতায় পায়।" সুতরাং; তাঁহার কথা এখন না শুনিলেও হয়। অধিকন্তু আমি এখন বয়ঃপ্রাপ্ত;—সংসারের তাবত বিষয়-আশয় দেখিয়া শুনিয়া; শিক্ষা করিয়া সর্ব্বাংশে একজন অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছি;—সাধারণের নিকট এখন আমার এইরূপই প্রতিপত্তি হইয়াছে। সুতরাং আমার কার্য্যে এখন দোষ দেখিতে বা বাধা দিতে তাঁহার অধিকার আছে কি?

বিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষা দিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি, পরে শিক্ষকদিগের সহিত সে সম্বন্ধও গিয়াছে। এখন তাঁহারাও আমার দোষ দেখিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ পরীক্ষা দেওয়া আমার মতে শুধুই যশঃলাভের (নাম কিনিবার) জন্য। কারণ যে; জ্ঞান কাহারও নিজস্ব নয়। পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে অনেক কৃতবিদ্য (পাশকরা) ছেলেকেও বুদ্ধিতে আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ—এখন তাঁহারা জীবিত আছেন। তা যা হউক; জগতে আমি এখন একাই এক সহস্র; আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা; সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীন; আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পরিজন বর্গ সকলেই ব্যস্ত;—এইত উপযুক্ত সুযোগ,—জীবনের ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ!!

এইরূপ চিন্তা সুখে বিভোর আছি; সহসা এমন সময় আবার ও কি শুনি? শুনিলাম;—"পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, বালক, বৃদ্ধ, বনিতা কাহারও প্রতি কখনও অন্যায় অত্যাচার বা কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার কিম্বা প্রচলিত রাজ-বিধির অন্যথাচরণ করিলে আমাকেও নিশ্চিত দণ্ডনীয় হইতে হইবে।" সমাজের নেতৃগণের এবং রাজাধিরাজের এইরূপ আদেশ;—জলে, স্থলে, নগরে, পল্লীতে, অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইতেছে। অহো! তাঁহাদের ঐরূপ অনুজ্ঞা শুধু প্রচারিত থাকিলেও যা হয়—হইত। তা নয়;—আমাকে আবার তাহাতেই নিয়ত বাধ্য রাখিবার জন্য, রাজ-অনুচরবর্গ এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ যত্নের সহিত সর্ব্বত্র সকল সময়েই যথোপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত আছেন। তৃণটি অবধি স্থানান্তরিত (অপহরণ বা অপচরিত) করিবার শক্তি আমার কোথায়? সুতরাং যুগপৎ ভীত, দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম—স্ফীত বক্ষ, উন্নত মস্তক এককালীন অবনমিত হইল।

শৈশবে পিতা, বাল্যেশিক্ষক, যৌবনে রাজা; এইরূপ শাসক পরম্পরায় আমার অন্তরায় থাকিয়া জীবনের অধিকাংশ সময়ই

পরাধীনতায় গত হইতে চলিল। প্রমাণ প্রত্যক্ষের দ্বারা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম; বার্দ্ধক্যে আবার মৃত্যু-রাজ আমার উপর আধিপত্য বিস্তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। হায়! আমার ইচ্ছা, জীবনে আর ফলবতী হইতে পারিলনা।

নৈসর্গিক নিয়মে দেখা যায়, নদী সকল প্লাবিতা হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা শুষ্ক হইয়া গিয়াই প্লাবিতা হয়। তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া বিলীন হয়, অথবা বিলীন হইয়াই আবার উত্থিত হয়। বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া বিনাশ পায়, অথবা বিনাশ পাইয়াই পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। উন্নতি-অবনতি, যদিও জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হউক, এবং আমারও জন্ম মৃত্যু বা ইহ পরকাল না হয় সমস্তই স্বীকার করিলাম, তা হইলেও ত দেখা যায়, নদী সকলে কূল ভাঙ্গিলে, পুনরায় তাহা নির্ম্মিত হইয়া যাইতেছে। তরঙ্গ মালায়,—নদী গর্ভস্থ দ্রব্য সকল ডুবাইয়া দিয়া, আরবার জাগাইয়া দিতেছে। বৃক্ষ উত্তম ফল বা ফুল সকল দান করিতেছে। সকলেরই জীবনের একটি লক্ষ্য ও স্বাধীনতা আছেই। আমার স্থায় পরাধীন জীবনে তাহার কি আছে? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, পরাধীনতার কারা (জেল) স্বরূপ, নিয়ত অভাবপূর্ণ বিষময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া, মহাত্মা পরশুরামের স্থায় তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা আমার এই পাপ জীবনকে পরাধীনতার দায় হইতে মুক্ত করিব, কারণ যে এত দুঃখেও মৃত্যু রাজের (ধর্ম্মের) অধীনতা স্বীকার করিতে কিম্বা মৃত্যুঞ্জয় সহজ কোন উপায় অবলম্বন করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি আসিতেছে না। বিশেষতঃ মৃত্যু-রাজের শাসন এমনই অসহনীয় যে, পলিতকেশ, স্খলিত দন্ত, বিগত বেশ অশীতি-পর বৃদ্ধেরাও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকেন, আমাদের শাস্ত্র এইরূপ বিধি দিতেছেন;—"জীবনের শেষভাগে ব্রহ্মচর্য্য (প্রভুর সেবা বা চাকুরী) অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করাই সদ্ধর্ম্ম (অবশ্য করণীয়)।" আরও বিধি আছে যে, "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।" সুতরাং তীর্থাবাসে কিম্বা বনাশ্রমে গিয়া, জীবন গত করিতেই স্থির করিলাম, সেরূপ সুযোগও উপস্থিত কারণ যে, আমার বয়স এখনও পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করে নাই, এখন হইতে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, পশ্চাৎ সুফল ফলিত হইবার আশা করা যায়, এজন্যই আর সময় গত করা চলিতেছে না। আরও একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে, আমার বয়স শুনিয়া, "বন-গমন" কথাটি অনেকে হয়ত বিশ্বাসের অযোগ্যও ভাবিতে পারেন, কিন্তু "বন-শব্দের অর্থ এস্থলে শ্বাপদ সমাকীর্ণ বিজনারণ্য মনে করিয়া কাহারও ব্যাকুলতা প্রকাশ বা উপেক্ষা করিবার কোন

কারণ নাই। সকলেই অবগত আছেন; এই যুগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে বা কলিকালে,—নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্য-ধাম (জনাকীর্ণ অথবা ধনী-বহুল সুখাবাস) সকল; গৃহীদিগের পক্ষে বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের অবলম্বনস্বরূপ। অর্থাৎ কেহ সমাজের ভয়ে, কেহ প্রতিবেশীদিগের গঞ্জনার ভয়ে কিম্বা তাহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব বশত এবং কেহ বা পরিবার প্রতিপালনের দায়ে আপন সংসারে বিরাগ ভাবিয়া, স্বাধীনমতে নির্ব্বিঘ্নে নগরে গিয়া বাস করিতে মনোনীত করেন। অনেকে আবার পর্ব্বতবাসীও হইয়া থাকেন। যাহা হউক, শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন;—আমরাও উল্লিখিত কোন একটি স্থানে গিয়া, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের ইচ্ছাই করিয়াছি। সেখানে যদিও রাজ বিধিরই অধীন থাকিতে হইবে, তা হইলেও—সমাজ-ভয়ে এবং কোনও কোন স্থানে মৃত্যু ভয়েও অব্যাহতি আছে। শাস্ত্রই এ কথা স্বীকার করিতেছেন।

পাঠক! আপনারা এত শঙ্কিত বা লজ্জিত হন কেন? আসুন! আমার সঙ্গে অন্দর বাটীতে চলুন। সেখানে গিয়া, আমার পরম রূপবতী যুবতী ভার্য্যাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন কি? তিনি অসূর্য্যম্পশ্যা হইলেও আমার নিত্য পশ্যা।

আবার আমারই সুখে তিনি সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী, ভক্তিতে শিষ্যা, সেবায় পরিচারিকা, প্রণয়ে সখি, মন্ত্রণায় মন্ত্রিণী অর্থাৎ অতি বুদ্ধিমতি এবং আমার চিরসঙ্গিনী বটেন। বয়সে ষোড়শী হইয়াও তিনি প্রবীণা অর্থাৎ বর্ষিয়সীর ন্যায় স্বভাব কঠিনা, আবার নবীনা (যুবতী বা নববিবাহিতা) অজই কি অত কমনীয়া (সরলা বা আদরণীয়া)? কোমলে-কঠোরে-অমৃতে গরলে এত গুণিগুণ একাধারে!! তাহারও আবার পরস্পর এত বৈষম্য ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন কি? কোমলতা না থাকিলে কঠোরতা কিম্বা কঠোরতা না থাকিলে কোমলতা গুণের পরিচয় পাবেন কিসে? প্রসিদ্ধি আছে; "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" অর্থাৎ পর্ব্বত গাত্র হইতে ধুমোদগত দেখিয়া অগ্নি অনুমিত হইয়া থাকে। ইহা ন্যায় শাস্ত্রেরই আদ্য প্রমাণ, তদ্ভিন্ন অম্ল মধুরাদি ষড়্বিধ আস্বাদন অনেক ফলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুনিতে পাই, তাঁহার (বিশেষতঃ আমারও) অগোচরে অনেকেই না হয় সকলেই তাহার গুণের ও সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে কথায় কিছুই আসে যায়না। কারণ যে, পরের দোষ পরেই অধিক দেখিয়া থাকে, অথবা তদ্দ্বারা তাঁহাদের দৃষ্টি বৈচিত্র্যও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, কেননা, পরস্পর রসনেন্দ্রিয়ের কার্য্যে বিভিন্নতা স্বীকার দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্যেও

খিতিরভাব আসিবে, তা যাহা হউক, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে ভার্য্যার (বিশেষতঃ মন্ত্রিণীর) অভিমত জানাইত উচিত? শাস্ত্রে বিধি আছে, "সভার্য্যা ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ ভার্য্যার সহিত একত্রে ধর্ম্মাচরণ করা বিধেয়। এই জন্য ভার্য্যাকে সহধর্ম্মিনী এবং দেহের অর্দ্ধ অধীশ্বরী বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্য উচ্চতর শিক্ষা বিকাশের সঙ্গে সভ্য (শিক্ষিত) সমাজ কেবল আপনাদের পৈতৃক বিষয়কর্ম্ম (সম্পত্তি ও চাকুরী) অধিকন্তু, ভোগ বিলাসিতা বৃদ্ধি করিতেই নিজেরা ব্যস্ত থাকেন, তদ্ভিন্ন, দেবতার ব্রাহ্মণে ভক্তি, দানও ব্রত নিয়মাদি এবং অভ্যাগত ও অতিথি চর্য্যাপ্রভৃতি ধর্ম্ম কার্য্য সমস্ত তাঁহাদের সরলপ্রাণা (সহজে যাঁর চিত্ত আর্দ্রতা হয়), ধর্ম্ম পরায়ণা পরিবারদিগের প্রতিই ন্যস্ত রাখিয়াছেন, এনিমিত্তই, সমাজে তাঁহারাই এখন আদর্শ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেছেন। অভিধানে, আদর্শ ব্যক্তিদিগকে "মহাজন" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। মহাভারত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়; মহাত্মা যুধিষ্ঠির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" এই জন্য আবার কেহ কেহ আমার সহধর্ম্মিনীকে মুনি প্রবর বাল্মিকীর তপোবনে পাঠাইতে অনুরোধ করেন, তাঁহাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি কৈ? কারণ যে আমাকে আবার এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার স্বর্ণ প্রতিকৃতি গড়িয়া রাখিতে হইতেছে, তা যাহা হউক, এস্থলে প্রবন্ধ বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই, মন্ত্রিণীর অভিমতটিই শুনুন।

বিষয় কার্য্যানুরোধে ভার্য্যা সহ বিদেশে (বিশেষতঃ সহরে) গিয়া, নানাদেশীয় নানা জাতীয় লোকের সহিত একত্রে বাস ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের নিকট নূতন নূতন মত সকল শুনিয়া, আমাদের আচার ব্যবহারও মানসিক গতি, শেষে যদি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, এই ভয়ে প্রথমতঃ বৃদ্ধপিতা মাতার মনে গুরুদেবের দ্বারা আমাদিগকে দীক্ষিত করিবার (মন্ত্র দিবার) ইচ্ছা বলবতী হয়। কিন্তু আমার তাহাতে ইচ্ছা না থাকিলে, অনীচ্ছিত কার্য্য অশুভকর জানিয়া অথবা আমাদের কর্ত্তৃক নিজেদের গৌরব নষ্টের আশঙ্কাতেই হউক, আপনারা শিখণ্ডী সাজিয়া আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য বধূকেই সা-রথী মনোনীত করিয়াছিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হইলে এরূপ প্রথা অনেক পরিবারেই প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়! বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে (অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার দিনে) এরূপ প্রথা প্রচলিত থাকা, কখনই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইবে না।

যথাশাস্ত্র স্বধর্ম্মাচরণ (যথারীতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান) করিতে আমাকে পূর্ণোদ্যোগী দেখিয়া এবং নিজেরও তাহাতে সেইরূপ প্রয়োজন

আছে বুঝিতে পারিয়া, শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ (নৈতিক চলন-চরিত্র) দ্বারা প্রথমেই তিনি আপত্তি জানাইলেন যে, অদীক্ষিত (অপরিজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত) থাকাতে ধর্মকার্য্যে আমাদের স্বতঃ কোনও অধিকার জন্মে নাই, এবং আরও বলিলেন যে,—"অদীক্ষিতদিগের পশু-জীবন (১) কখনও অপনীত হয়না।" ফল কথা, তিনি আমাদিগকে দীক্ষিত হইতেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, জিজ্ঞাসা করি, অভিমানিনী স্ত্রীজাতির কথায় আপত্তি উত্থাপন করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? জানি,—তর্কের দ্বারা বিষয় (প্রস্তাবিত প্রশ্ন) সরল হয় বটে, কিন্তু বিষয় বৃদ্ধি এবং পরস্পর মনোবাদের আশঙ্কা আসিবে না কি? বিশেষতঃ কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয়,—"শ্রীরাধা, অমুক বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই মন্ত্র দাত্রী (দীক্ষাগুরু) ছিলেন।" শক্তিমতেও তন্ত্র শাস্ত্রে প্রকৃতিরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রীয় গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা পাপ নয় কি? আপনারা কিরূপ করিয়া থাকেন জানিনা, আমি কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহারই মতরক্ষা করিতে বাধ্য থাকিলাম, এজন্য সকলে আমাকে ভীরু কাপুরুষ এবং আরো যদি কিছু বলিবার থাকে—বলুন।

আমার এই মন্ত্র-গ্রহণ প্রবৃত্তিকে অনেকে হয়ত গোড়ামীও মনে করিতে পারেন। সে কথা পরে বুঝা যাইবে, সকলে জ্ঞাত আছেন, মন্ত্র লইতে প্রথমতঃ কুল-গুরুরই (২) প্রয়োজন হয়। কুল-গুরুর সম্বন্ধেও অনেকে আবার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। "তিনি বালক, মূর্খ এবং অসদাচারী হইলে; সামাজিক প্রথা বা শাস্ত্রমতে তাঁহারই নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকা, তাঁহাদের মতে ন্যায় বিরুদ্ধ এবং উহা পৌরাণিক শাস্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ (শ্রেষ্ঠ) জাতিরই স্বার্থপরতা মাত্র।" কোন বিষয় মীমাংসা না করিয়া, নিজের সুখ বৃদ্ধি করাকে "স্বার্থপরতা' বলে। হিন্দু শাস্ত্রকার কোনও বিষয়েরই মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই, সুতরাং একথার মীমাংসা শাস্ত্রে নাই কি? তা যা হউক, এখানে আমার মতটি শুনিয়াই যদি

---

(১) আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় এসমস্ত গুণ, পশুতে এবং মনুষ্যে তুল্য রূপেই আছে। এই জন্য সাধারণতঃ মনুষ্য জীবনকেও "পশু জীবন" বলা হইয়াছে, ইহার যাথার্থ এইরূপ, "পশু বাঁধনে" অর্থাৎ যাতে বাঁধা বা দ্বেষ জন্মায় অথবা ইন্দ্রিয় গোচরীভূত সমস্তই "পশু"। সেরূপ প্রাণীরই "পশু জীবন" আখ্যা দেওয়া যায়।

(২) যিনি, পিতা পিতামহকে মন্ত্র দিয়াছেন, অথবা তাঁহারই বংশের যে কোনও ব্যক্তিকে "কুলগুরু" বলা হয়।

তাঁহাদের আপত্য ভঞ্জন হয়, তবে আর শাস্ত্র খুঁজিবার প্রয়োজন কি? পাঠক! অগ্রে আমার মতটিই শুনুন।

বালকের প্রকৃতি অতি সরল (হিংসা দ্বেষ বর্জ্জিত) আকৃতিও তাহার মনোহর, সুতরাং কুটিল, কুচক্রী এবং শোক-চিন্তা ক্লিষ্ট, বিবর্ণও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির গুরু হইবার সেকি যোগ্য নয়? মূর্খের সন্তান মূর্খ এবং পণ্ডিতের সন্তান পণ্ডিত হইবে, এরূপ কোন বিধি পাওয়া যায় না। আমি জানি,—আমার শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকেই অসদাচারী এবং বয়সেও আমাপেক্ষায় ন্যূন ছিলেন, এখন আমি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেকে আবার সেরূপ শিক্ষাও প্রাপ্ত হন নাই, তবে কি আমাতেও বালকত্ব, মূর্খত্ব এবং চরিত্রগত দোষ স্পর্শিত হইয়াছে? তাহাই যদি স্বীকার্য্য না হইবে, তবে আর বালক মূর্খ কিম্বা অসদাচারী গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? কুলগুরু ত্যাজ্য কি অত্যাজ্য, সম্বন্ধে আমি অন্য কোন প্রমাণ দেখিতে পাইনা, তবে বাগানের মালিরা যখন গাছে জোড় কলম বাঁধে, দেখিয়াছি—এক জাতীয় (স্বজাতীয়) চারা না হইলে, তাহাদের কলমে জোড়া লাগে না! আবার চারার উন্নতি দ্বারা ফলেরও উন্নতি হইয়া থাকে। একপাত্রে সাগর-জল, অন্য পাত্রে গঙ্গাজল রাখিয়া, উভয় পাত্রের জল একত্রিত করিলে সমস্ত উভয় জলের গুণ হ্রাস পায়। কিন্তু পৃথকরূপে অর্থাৎ সাগরে সাগর এবং গঙ্গায় গঙ্গাজল মিশাইলে, তাহার গুণ আরো বর্দ্ধিত হয়, ইহার অধিক প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে কি? তা যা হউক, আমি পরিজনদিগের নিকট আমাদের গুরুদেবের নাম শুনিয়াছি মাত্র, তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না। কারণ যে, জ্ঞান হইলে পর পাঠ্যাবস্থায় এবং বিষয়-কার্য্যানুরোধে বহুকাল আমি বিদেশেই গত করিয়াছি। বাটী থাকার সময়েও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হইবার অনেকগুলি অন্তরায় আছে। বৎসরে তিনি একবারমাত্রই বার্ষিক (১) নিতে আসিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আমাদের বাটীতে তাঁহার অন্য কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। যখন আসেন;—একরাত্রির অধিক কখনও বাস করেন না। তাহাও আবার অধিক সময় আমাদের অন্দরবাটীতেই গত করেন এবং সেখান হইতেই পুনঃ প্রত্যাগত হন। কারণ যে, সেখানেই তাঁহাদের (গুরুদেবের ও পুরোহিতের) প্রয়োজন ও আধিপত্য। বহির্ব্বাটীতে (বিশেষতঃ আমার নিকটে) তাঁহাদের না আসিবার অনেকগুলি কারণ আছে বটে, কিন্তু বিস্তার ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না। [ক্রমশঃ।

শ্রীরমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

(১) প্রতি বৎসর গুরুদেবকে প্রণামী-স্বরূপ যাহা দেওয়া হয়।

অধর্ম্ম—না পুণ্যসঞ্চয়।

বেদের সময়ে অনুমরণ কিম্বা সহমরণ প্রথা চলিত ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে এখনকার জৈনদের ও শিক্সানীদের মত আর্য্যেরা হাসিতেন, সকলে কত নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তদ্দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময়ে শ্মশানে চিতা সাজাইয়া তাহার উপর শব রাখা হইত। মৃতব্যক্তির বিধবা পত্নী তাহার পাশে চিতার উপর শুইতেন, চিতার চারিদিকে পুত্রবতী সধবা স্ত্রীলোকেরা চক্ষে ঘৃত দিয়া এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া একবিন্দু জল পড়িত না। ভুলিয়াও কেহ একবার শোক করিতেন না। কিছুক্ষণ পরে সধবা রমণীদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এদিকে ঋত্বিক্, বিধবা নারীকে চিতা হইতে উঠিতে বলিতেন, উঠিলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে আদেশ করিতেন। তখন দেবর কিম্বা মৃত-ব্যক্তির শিষ্য অথবা বাটির কোন পুরাতন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লইতেন। পরে শবদাহ হইত।

আমাদের বোধ হয় বৈদিক কালের পূর্ব্বে লোকে যখন অত্যন্ত অসভ্য ছিল, সেই সময় আর্য্যজাতির মধ্যে সহমরণ চলিত ছিল। জীবিত মানুষকে পোড়াইয়া মারা পশুর কাজ বৈ আর কিছুই নহে। সাধ করিয়া স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা করা ধার্ম্মিক লোকের বুদ্ধিতে আসে না, এ কেবল পাষণ্ড নরপিশাচদের মনের ঘোর অজ্ঞতার পরিচয়। বেদের সময়ে আর্য্যেরা সুশিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছিলেন, ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ তাঁহাদের মনকে আলোকিত করিয়াছিল; তেমন অবস্থায় মিথ্যা আশায় ভুলিয়া কখনই তাঁহারা স্ত্রীহত্যা করিতে পারেন না, কিন্তু একটা প্রথা অনেক দিন দেশে চলিয়া আসিলে, একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়া কঠিন হয়, বৈদিক সময়ের পূর্ব্বে সহমরণ চলিত ছিল, তাই বৈদিক কালে ঋষিরা ঐ প্রথা একেবারে রহিত করিতে পারেন নাই। সে জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর, পুরাতন নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধবা নারী মৃত পতির চিতাশয্যায় গিয়া একবার শয়ন করিতেন। শেষে তাঁহাকে উঠাইয়া আনা হইত। এটী আসল নিয়মের নকল নিয়ম বৈ আর কিছুই নহে। অন্তত অনুমান করিয়া এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

ক্রমে রাজবিপ্লবে ও ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুরা আবার অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বের মত জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা থাকিল না, এই অবস্থায় কঠিন ভ্রমে পড়িয়া তখনকার

অদূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা পুনর্ব্বার সহমরণ চলিত করিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারী এবং কোলে ছোট ছেলে থাকিলে সে সকল স্ত্রীলোক পতির সঙ্গে মরিতে যাইতেন না, তবে ঋতুর তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে একদিন শব রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৮২২।২৩ সালে গভর্ণমেণ্ট চারিদিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, পুলিশের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ সতী-দাহ করিতে পারিতেন না, তজ্জন্ত সে সময়ে চারি পাঁচ দিনের বাসী মড়া পড়িয়া থাকিত। যে কয়েক দিন মড়া পচিতে থাকিত, ততদিন পর্য্যন্ত হতভাগ্য বিধবা নারী কিছুই জানিতেন না। সে ব্যবস্থা ভাল ছিল। চুপ করিয়া নিতান্ত বেকার থাকিতে হয়, তাহার চেয়ে বেগারে দাঁতে দাঁত দিয়া, শুকাইয়া মৃত্যুর দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিয়া আগে মৃতদেহকে চিতার উপর রাখা হইত। প্রেতপিণ্ডাদি দেওয়া হইলে নাপিত আসিয়া সতীর নখ কাটিয়া দিত। তাহার পর তিনি অলঙ্কার খুলিয়া, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া স্নান করিয়া আসিতেন। স্নান করা হইলে আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে চেলীর কাপড় পরাইত, রাঙাসুতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিত; চুলের উপর থরে থরে চিরুণী সাজাইয়া দিত এবং কপাল যুড়িয়া সিন্দুর মাখাইত। এইরূপ বেশভূষা হইলে সতী, আচমন করিয়া তিল জল ও কুশহস্তে পূর্ব্বমুখে সঙ্কল্প করিতেন। এইরূপ সঙ্কল্প করা হইলে সতী সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া দিক্‌পালদিগকে সাক্ষী করিতেন। লোকপালদিগকে সাক্ষী মানিয়া সতী সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। শেষে তিনি চিতার উপর উঠিয়া স্বামীর পাশে শয়ন করিতেন। আত্মীয় স্বজনেরা কঞ্চির বেতী এবং গাছের কাঁচা ছালের দড়ী দিয়া তাঁহাকে মৃতদেহ ও বড় বড় কাঠের কুদার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিত। তাহার পর অগ্নি সমর্পণ করা হইত। চারি দিক্ হইতে লোকে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া বড় বড় কঞ্চির, শরের ও পাকাটির বোঝা চিতার উপরে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ চিতার উপরে বড় বড় বাঁশ ফেলিয়া দিয়া চাপিয়া থাকিত। এদিকে পাঁচ সাতটা ঢাক বাজিতেছে, কীর্ত্তনীয়ারা খোল করতাল বাজাইয়া আকাশ পাতাল ছাইয়া ফেলিতেছে। চিতার ভিতর ঘোর আর্ত্তনাদ হইলেও তাহা শুনিবার উপায় নাই। কচিৎ আগুনের জ্বালায় ছটফট্ করিতে করিতে কেহ কেহ চিতা হইতে পড়িয়া যাইতেন। চিতাভ্রষ্ট সতীকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহস্থেরা আর তাঁহাকে ঘরে লইতেন না। কাজেই

মুর্দাফরাশেরা তাঁহাকে লইয়া যাইত। তাই চিতা হইতে কেহ কদাচিৎ পড়িয়া গেলে আত্মীয় স্বজনেরা স্ত্রীলোকটার মাথায় লাঠি মারিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতেন। চিতা প্রদক্ষিণ করার সময় অনেকেরই শরীর দিয়া দর দর ঘর্ম্মধারা বহিতে থাকিত এবং অল্পক্ষণ পরেই মূর্চ্ছা যাইতেন। কাহারও কাহারও এই সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াও গিয়াছে। যাঁহারা এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অদ্যাবধি সেই সকল বৃদ্ধ লোক জীবিত আছেন।

সে কালের সহমরণ দেখিবার নিমিত্ত বালক, বালিকা এবং অনেক সধবা স্ত্রীলোক শ্মশানে যাইতেন, তাঁহারা সতীর হাতের বালা, ভাঙ্গা শাঁখা, কপালের সিন্দূর এবং ছড়ান খই কুড়াইয়া আনিতেন। কোন বালবধূ পতিপরায়ণা না হইলে, তাহাকে সেই সিন্দুর পরাইয়া দিত। সেই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হইত না। কাহাকে প্রেতিনীতে পাইলে সেই শাঁখা ভাঙ্গা রোগীর গলায় বান্ধিয়া দেওয়া হইত।

স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার, জাতীয় নিস্তেজতা এবং মাজের সমবনতির লক্ষণ। পতির মৃত্যুর পর, পুড়িয়া মরিবে—স্ত্রীলোক!—আর পত্নী মরিলে পোড়া পুরুষ, কোলের গৃহ-লক্ষ্মীকে লইয়া পুড়িয়া মরিবে না, একাদশীও করিবে না। তিনি কেবল নূতন বর সাজিয়া আর একটী বিবাহ করিবেন। কেন? এত অন্যায় কি জন্য? যে দিন হইতে স্ত্রীলোকদের প্রতি এই অত্যাচার ঘটিয়াছে, সতী-দাহও সেই সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

সুখ কিসে।

ভারত! আজ তোমার এ দশা কেন? আজ তুমি ম্লানভাবে জগতের এককোণে বসিয়া ভাবিতেছ কেন? আজ তুমি সকল সম্পত্তি হারা হইয়া ভিখারী সাজিয়াছ কেন? কে তোমার পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য হরণ করিল? যে ভারতের যশো ভাতিতে এক সময়ে সমগ্র জগত আলোকিত হইত, আজ সেই যশ প্রদীপ কোন ঘোর ঝঞ্জাবাতে নিভিয়া গেল? যে ভারতের ব্রাহ্মণ্যতেজের প্রখর প্রভায় বিদেশীয়গণ ভস্মীভূত হইত, আজ সেই ভারত এত নিস্প্রভ ভাব ধারণ করিয়াছে কেন? আজ ভারতের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর না কেন, দেখিবে সকলি যেন বিষাদ মাখা, সকলি যেন উদাস উদাস! ভারতাকাশে তপন আর সেরূপ উজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ করেনা, চাঁদ আর সেরূপ সুধা হাসি হাসেনা, সমীর তেমন স্নিগ্ধ সঞ্জীবতার প্রাণে অমৃত বর্ষণ করেনা। তাক

তের কাননে কাননে কুসুম তেমন স্বর্গীয় মধুর হাসি হাসেনা। শাখে পাখিগণ তেমন সুমধুর গায়না। হায়? আজ আমরা কি শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত! আমরা উন্নতির উচ্চশিখর হইতে যে পতনের নিম্ন প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি তাহাতো একবারও ভাবিনা। ভ্রাতঃ। আর কতকাল এরূপ ভাবে ঘৃণ্যজীবন ভার বহন করিবে, কতকাল দীন ও অলস ভাবে কেবল নিদ্রায় মজিয়া মানব নাম কলঙ্কিত করিবে? ভাবিয়াছ কি কোন পাপে দেবতা হইতে পশুতে পরিণত হইয়াছ? একমাত্র পবিত্রতা হারা হইয়াই যে আজ ভারতবাসী এরূপ নীচ অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। একমাত্র ধর্ম্মবিহীন হইয়াই যে ভারত হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারা নিতান্ত পবিত্রভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চতুরাশ্রমের প্রচলন ছিল। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা আত্মার প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন করতঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইতেন, এই সংসার ঈশ্বরের সৃজিত। সেইজন্য তাঁহারা ভগবানের অভিপ্রায় মত কার্য্যাভিলাষী হইয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন, সংসারের মোহিনী প্রলোভন তাঁহাদের আত্মাকে পতনের দিকে লইয়া যাইতে কখনই সক্ষম হইতনা। দুগ্ধ হইতে মাখন উঠাইয়া লইলে যেরূপ তাহা কখনই কোনও প্রকার জলীয় পদার্থে বিমিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, তদ্রূপ সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে আত্মার বল সাধন করতঃ বিবেক বলে সবিশেষ বলীয়াণ হইতে পারিলে সে মন আর সংসারের কুহকে পাপের ঠাটে পতিত হইয়া কলুষিত হইতে পারেনা। অধিকন্তু ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা তৎকালে সকলেরই আত্মনির্ভরতা শিক্ষা হইত। কারণ তৎকালীন ছাত্রগণ গুরুর গৃহে থাকিয়া স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিত। তাহাদের আপনাপন পরিচ্ছদাদি আপনাদিগকেই পরিষ্কার করিয়া লইতে হইত। এতদ্ভিন্ন গুরুর গৃহের অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিতে হইত। সুতরাং তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিই সমধিক বর্দ্ধিত হইত। কাজেই তাহারা সুপটু দেহ মন লইয়া সংসারে বিচরণ করিতে সক্ষম হইত। তাহাদের দ্বারা সংসারের সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইত। অপরাপর জাতিগণও শ্রেষ্ঠব্যক্তি-ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিত ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্যাবলীর সাধনে প্রবৃত্ত হইত। তজ্জন্যই ভারত তখন এত উন্নত ছিল। আর আজকাল ব্রাহ্মণ তাহার

স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছে, কাজেই অপরাপর জাতিও তাঁহাদের সহিত পতনের এত নিম্নস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি আমাদিগকে প্রকৃত সুখের অন্বেষণ করিতে হয়, তবে পুনরায় ধর্ম্মালোকে জগতকে উদ্ভাসিত করিতে প্রয়াসী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এ জগতে সকলেই সুখ চায়। রাজার অট্টালিকা হইতে দীনের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই "সুখ"—"সুখ" ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কিন্তু কি করিলে প্রকৃত সুখী হইতে পারা যায়, তাহা জগত বুঝিতে পারিল না। কেহ মনে করে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিলেই বুঝি প্রকৃত সুখী হইতে পারা যায়। অগণিত রাজ্য জয় করতঃ বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সম্রাটের মুকুটে ভূষিত হইতে পারিলেই বুঝি সুখের চরম সীমায় উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাস। সংসারের কোন পদার্থেই মানুষকে সুখী করিতে পারে না। রাজকোষপূর্ণ অগণিত অর্থ, স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী, ও সদ্য পারিজাতনিভ সুত বদন কখনও মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না, বিবিধ রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য, বিবিধ বিলাস সামগ্রীতে মানব প্রকৃত সুখের আস্বাদন লাভ করিতে পারে না। সুসজ্জিত সৌধবাসী হইলেই মনে শান্তি আসিতে পারে না, প্রিয়তমা জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণাধিকা পত্নীর প্রণয় মাখা বদনেও মানুষকে প্রকৃত সুখের অধিকারী করিতে পারে না। এ সকলি মোহ, এ সকলি ভ্রম! যে বস্তুর ধ্বংস আছে, তাহাতে চিরস্থায়ী সুখ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? পার্থিব যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহার সকলিতো অলীক! সকলিতো ভঙ্গুর। যে ব্যক্তি স্বপ্নকেই সুখের জিনিষ মনে করে, তাহার ন্যায় নির্ব্বোধ আর কে আছে। অতএব বন্ধুগণ! যদি নিত্য সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে যে বস্তু নিত্য যাহার ধ্বংস নাই, এরূপ বস্তুর অন্বেষণ কর। সংসার ভীষণ মরুভূমি। মানব তাহাতে ভ্রান্ত মৃগ স্বরূপ। মায়ামরীচিকা জলভ্রমে মানব মৃগ এখানে সর্ব্বদাই ছলিত হইতেছে। অতএব সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী কোনও বস্তুর জন্যই লালায়িত হওয়া উচিত নহে। যদি প্রকৃত শান্তির সুস্নিগ্ধ সলিলে অতৃপ্ত পিপাসা দূর করিতে চাও, তবে একমাত্র নিত্য ও পূতধর্ম্ম সলিল পান কর। ধর্ম্মামৃত হ্রদে ডুব দাও দেহের জ্বালা জুড়াইবে, আত্মা শীতল হইবে ও প্রাণে অভিনব বলের আবির্ভাব হইবে। আর বসিয়া থাকিওনা, আর ঘুমাইওনা। এইতো সময় যায়, এইতো সুকোমল ভূমি বিদ্যমান দুদিনেইতো সংসারের তাপে পুড়িয়া খাখা হইয়া যাইবে। তখন তাহাতে ধর্ম্মবৃক্ষ জন্মাইবেনা। অতএব বন্ধুগণ এই সময় হইতেই ধর্ম্ম সাধনে রত হও। পার্থিব সকল

কার্য্যেই ভগবানকে স্মরণ করিও। লেখা পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্যতো অপর কিছুই নহে। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্যই মনের উৎকর্ষ সাধনার্থ শিক্ষার আবশ্যক। দেখ জলের সহিত জলই মিশিতে পারে, একজাতীয় না হইলে তাহাদের মিলন হয় না। ভগবান করুণাময়, তিনি অতি পবিত্র ও অতি নির্ম্মল! তাহাতে পাপের কালি লাগিতে পারেনা। মানুষ যদি তদ্রূপ নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র না হয়, তবে কি প্রকারে ভগবানের সহিত মিলিত হইবে। যে ব্যক্তি যত অপবিত্র, ঈশ্বর তাহা হইতে তত অধিক দূরে অবস্থিতি করেন। সংসারে চারিদিকেই ভগবানের অপার করুণা বিরাজিত রহিয়াছে। সমীর তাঁহারই স্নিগ্ধতা বহন করিতেছে। কুসুমে তাঁহারই কোমলতা ও তাঁহারই পবিত্রতা বিমিশ্রিত রহিয়াছে। তাঁহারই করুণাধারা স্বরূপ নদ নদী সর্ব্বত্র প্রবাহিত! কিন্তু অন্ধ মানব তাহা দেখিতে পায়না। মুগ্ধ মানব ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়না। সম্মুখে নিত্যবস্তু বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তুচ্ছ সুখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ অযথা ঘুরিয়া মরে। অতএব বন্ধুগণ! যদি তোমরা দুখের সংসারে প্রকৃত সুখের অভিলাষ কর, যদি মানব হইয়া দেবতার উপযুক্ত হইতে চাও। যদি ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ সুখ সম্ভোগে অভিলাষ থাকে, তবে আর সংসারের তুচ্ছমোহে ভুলিওনা। সময় থাকিতে কার্য্যে রত হও। মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর; দক্ষিণ হস্তে ন্যায় ও বামহস্তে সত্যের দণ্ড লও, হৃদয়ে ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তবেই মানব হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হইতে পারিবে, তোমাদের জীবন ধন্য হইবে।

শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রবাহ—১ম বর্ষ শ্রাবণ—উপযুক্ত সম্পাদকের হাতে পড়িয়া কাগজখানি চলিতেছে ভাল। প্রায় সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি তৃপ্তিকর "ঋণশোধ" বড় ভাল লাগিল। ভাষা ও ব্যাকরণে লেখক প্রাণের কথা টানিয়া আনিয়াছেন। "উপনিষৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটীতে সব জায়গায় আমাদের মতের মিল না থাকিলেও প্রবন্ধটী বেশ হইয়াছে এবং ইহার ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল। "ভারতোদ্ধারের" শ্লেষ সাময়িক হইয়াছে। "অপ্রিয়-সত্য" নামক প্রবন্ধটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

ভারতী - ২৯ বর্ষ শ্রাবণ ১৩১২। প্রথমেই "আশা" নাম্নী একটী কবিতায় আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। "চীনদেশে" প্রবন্ধটী লাগিল ভাল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের

"মহানাটক" বড় বেশী ভাল লাগিল না। স্থানে স্থানে কবিতা শ্রুতিকটু হইয়াছে। সুকবি জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের কবিতা যদি কোথাও শ্রুতিকটু লাগে, তাহা হইলে আর কাহার নিকট আমরা নির্দ্দোষ কবিতা প্রত্যাশা করিব?

আজ হ'তে আর্য্যরাম নহেন অগ্রজ মোর
তাঁহা হ'তে হইলাম
স্বতন্ত্র আমি অতঃপর।
* * *
কিন্তু তব করস্থিত ওই শর নিরখিয়া
ব্রাহ্মণ্যে অনুরক্ত
হইল আবার॥

"স্বতন্ত্র আমি অতঃপর" এবং "ব্রাহ্মণ্যে অনুরক্ত" কেমন যেন কাণে খট্ করিয়া লাগে। "সর্ব্বজ্ঞ মিত্র" নামক প্রবন্ধে স্রগ্ধরা-স্তোত্র গ্রন্থের রচয়িতার আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কিরূপ প্রবলতা ছিল, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। । শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় "ঘরের কথা" লিখিতেছেন। ভাষা বেশ সরল সুন্দর এবং বোস্জা মহাশয়ের পরিণত বয়সের স্বভাবজ রসিকতা সমন্বিত। ধরতায় "খঞ্জিপোষ ঢাকা" থালা দেখিয়া প্রাণ চাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন তো থালা ঢাকা আছে, পরে কি হইবে জানি না। "একথা অনেক" নামক প্রবন্ধটিতে মহলানবীশ মহাশয় Protoplasm theory বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী। আর কোথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বা কবিতা দেখিলাম না।

জাহ্নবী ১ম বর্ষ। আমরা প্রথম হইতে অষ্টম খণ্ড অবধি পাইয়াছি। প্রত্যেক খণ্ডের স্বতন্ত্রভাবে সমালোচনার স্থানাভাব বলিয়া কয়েকটী উচ্চ প্রবন্ধাদির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর "লক্ষ্ণৌ-ভ্রমণ" নামক প্রবন্ধটি বড় ভাল লাগিল। ইহাতে কিছুই নাই অথচ সব আছে। জলধর বাবু শূন্য হাঁড়ীতে পাত পাড়িতে চিরকালই সিদ্ধহস্ত। "রামায়ণে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" বেশ ভালই লাগিল। "ছদ্মবেশী" সম্বন্ধে এখন কিছুই বলা গেল না, কারণ উহা অসম্পূর্ণ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন যে অপূর্ব্ব "নৈবেদ্য" দিয়াছেন, তাহা নানা প্রকার অসময়ের সুস্বাদ ফলে সজ্জিত। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রবন্ধটি অতি সুন্দর এবং সারগর্ভ। হাস্যরসে মিঃ ডিঃ এল, রায় সবার চেয়ে সুন্দর বলিয়া তাঁহার "সবার চেয়ে সুন্দরী কে" সুন্দর হইয়াছে। "দধীচি" কবিতাটী ক্ষীরোদ বাবুর স্বভাব-সিদ্ধ সুমধুর লেখনীর পরিচায়ক। "ঔরঙ্গ-জেবের সকর"—হরিসাধন বাবু যোগল ইতি-

হ্যসে চিরকালই দক্ষ। "আবৃত্তির উপযোগিতা" লাগিল ভাল। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের "বিধির বিধান" সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই।

কোহিনুর বৈশাখ—আষাঢ়। বৈশাখের কোহিনুরে "উপধি বিতরণ সভা ও লর্ডকর্জন নামক প্রবন্ধ ব্যতীত উল্লেখ যোগ্য আর কিছুই নাই। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার শ্রীমহম্মদ মোজাম্মল হক সাহেবের "সোলতান মামুদ" ও ব্যারিষ্টার চন্দ্র বাবুর আত্ম সমালোচনা নামক প্রবন্ধের প্রশংসার্হ। "আবাহন" নামক কবিতাটি রবীন্দ্রীয়চ্ছাদে রচিত হইলেও পণ্ডশ্রম হইয়াছে এরূপ কবিতা পড়িয়া পড়িয়া আমরা নাজে হাল হইয়াছি। আষাঢ় সংখ্যা অপেক্ষাকৃত উত্তম; সুরেন্দ্র বাবুর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন নামক প্রবন্ধে অভিনব চিন্তাশীলতার চিহ্ন বিদ্যমান—লেখক চিরজীবি হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করুন। বড় ভালবাসি কবিতা আধুনিক আবহাওয়া প্রসূত ভাল লাগিল না, জীবেন্দ্র বাবুর আদব কায়দা মন্দ নহে। "আমাদের সমাজ" অনেকটা আমাদের সমাজের মত। শেষে কবিতা মন্দ নহে। কবিতা কুঞ্জের প্রথম দুইটী কবিতা বেশ মধুর—শেখ সাহেবের শেষ দুইটী ভাল লাগিল না—উহারা কবিতা না ভণিতা বোঝের উপর কোহিনুরের পরিচালন মন্দ হইতেছে না, মুসলমানগণের ভাষানুরাগ দর্শনে আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম, এতদ্ভিন্ন কোহিনুরের ছাপা কাগজ ভাল আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

মাসিক মন্তব্য।

ষ্টারথিয়েটার। কয়েকটী বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা রাণা প্রতাপের তৃতীয় অভিনয় রজনী সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। অমৃতলাল স্বয়ং শক্তসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের প্রীতি উৎপাদন করেন। অভিনয় অতি স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা সমস্তই সুন্দর ও রুচিসঙ্গত। তবে শেষ অঙ্কে পুত্র হত্যার্থ প্রতাপসিংহের হস্তে "বন্দুক" দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম—ভরসা করি অমৃত বাবু বন্দুকের পরিবর্ত্তে "বর্শা" ব্যবহার করিয়া এই দোষটুকু পরিহার করিবেন। প্রতাপ, শক্ত, মেহেরউন্নিসা, দৌলতউন্নিসা মানসিংহ পৃথ্বিরাজ প্রভৃতির অভিনয় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক আমরা ষ্টার থিয়েটার অভিনয় চাতুর্য্যে প্রীত হইয়াছি। পুস্তক সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল—বারান্তরে সমালোচনা করা হইবে।

৮ম

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ। } ভাদ্র, সন ১৩১২। { পঞ্চম সংখ্যা।

নিবেদন।

বিগত বৈশাখমাস হইতে আমরা অনেক গুলি মাসিক পত্রিকার সহিত বিনিময়ার্থ পত্রিকা প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ২।৩ খানি পত্রিকা ব্যতীত কেহই নিয়মমত বিনিময় প্রদান করিতেছেন না। অনেকে হয় ত আমাদের পত্রিকার স্বল্পমূল্য বলিয়া বিনিময় প্রদানে মনোযোগ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য সংসাহিত্য প্রচার ও তদর্থ সাহায্য করা, কেবল অর্থলোলুপতাই পত্রিকা প্রকাশের পরমোদ্দেশ্য নহে। প্রায় নয়বৎসর অতীত হইল, "সাহিত্যের উন্নতি কল্পে এই সমিতি স্থাপন করিয়াছি, অতঃপর মাসিক সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয়গণের নিকট আমাদের এই ভিক্ষা যে আমাদের সদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা যেন হাওড়ার এই একমাত্র পত্রিকার সহিত বিনিময় প্রদানে কুণ্ঠিত না হয়েন।

সম্পাদক।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র বৈদিক গগনের বিরাট গ্রহ। একদিন ইঁহার তেজে ভারতভূমি বিভাসিত হইয়াছিল;—ইন্দ্রাদি দেবতাও ভয় পাইয়াছিলেন। অদম্য অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক অভিনিবেশ দ্বারা মানব যে অসাধ্যও সাধন করিতে পারে, মহাবীর বিশ্বামিত্রের পবিত্র চরিত তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ। স্বীয় অমানুষিক বীরত্বে তিনি সেই আদিম আর্য্যসমাজে যে প্রচণ্ড তেজ প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ভারতে একটী যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবের বহু বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি চ্যবন একদা রাজা কুশিককে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ, এবং তাহা হইতে কুলসঙ্কর উপস্থিত হইবে। মহাবীর বিশ্বামিত্র সেই ভয়াবহ সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত অনন্ত অনল। এই অনল দ্বারা তদানীন্তন আর্য্যসমাজের কুসংস্কাররাশি দগ্ধ হইয়া এক অপূর্ব্ব পবিত্র সংস্কারের সূচনা

হইয়াছিল। কি কারণে সেই ঘোর বিরোধ সংঘটিত হয় এবং কিরূপে তাহা বিশ্বামিত্রের চরিত্রস্ফুরণে সহায়তা করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যে সময়ে ভারতে বর্ণভেদ প্রথা দৃঢ়ীভূত হয় নাই; ব্রাহ্মণ যে সময়ে ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিত এবং ব্রাহ্মণের স্বত্ব সবলে অধিকার করিতে ক্ষত্রিয়েরা চেষ্টিত হইত; সেই ভীষণ সমাজবিপ্লবকালে ভারতে নানাপ্রকার অশান্তি ও উপদ্রবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্ব সেই সামাজিক বিপ্লবের প্রচণ্ড স্রোত নিবর্ত্তিত করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের জীবনীতে এই সকল বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইবে। সেই ভীষণ সামাজিক বিপ্লবকালে ক্ষত্রিয়বল এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহার তেজে এক একটী ব্রাহ্মণবংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মহাবীর পরশুরাম সেই প্রলয়ঙ্কর প্রচণ্ড ক্ষত্র-তেজ দমিত করিয়া সমাজে সাম্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষত্রিয়-গণ একদা কতদূর শত্রুতা করিয়াছিল, একটি উদাহরণ দ্বারা তাহা বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। অতি প্রাচীনকালে কৃত-বীর্য্য নামে কোন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদজ্ঞ ভৃগুসন্তানগণ তাঁহার পুরোহিত। পার্থিবশ্রেষ্ঠ কৃতবীর্য্য সোমযাগ সমাপনান্তে অগ্রভুক্ ব্রাহ্মণদিগকে বিপুল ধনধান্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজা স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিগণের অর্থ প্রয়োজন হইল। তাঁহারা ধনের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং ভার্গবদিগের বিপুল ধন আছে জানিতে পারিয়া তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক ধন যাচ্ঞা করিলেন। ভার্গবেরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধনরক্ষণ মানসে সমস্ত অর্থ ভূমি-মধ্যে প্রোথিত করিলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হইতে ভীত হইয়া ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন; কেহ বা উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে তাহাদের অভিলাষমত ধনদান করিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর কোন ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে ভার্গবগৃহ খনন করিতে করিতে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইল। তাহাতে তাহাদের লোভ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল এবং সকলে মিলিত হইয়া বিষম ক্রোধসহকারে নিশিত শরদ্বারা ভার্গবদিগকে সংহার করিতে লাগিল, এমন কি ভার্গবদি-গের গর্ভস্থ শিশুদিগকেও নষ্ট করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ভৃগুকুল উচ্ছিদ্যমান হইলে ভার্গবপত্নীরা ভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গম হিমালয়ে পলায়ন করি-লেন। এই একটী সামান্য উপাখ্যান দ্বারা তদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণবিদ্বেষিতা স্পষ্ট

প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ ব্রাহ্মণদ্বেষী অনেকগুলি রাজন্যের বিবরণ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায়।

এই সকল নরপতির চরিত্র আলোচনা করিলে ভারতীয় আর্য্যসমাজের তদানীন্তন অবস্থা অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। যে সময়ে ইহারা রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, তখন ভারতে বর্ণভেদ প্রথা অনেক পরিমাণে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু তখনও তাহা দৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যস্ত হয় নাই, তখনও বর্ণভেদ সূচক কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল; কিন্তু রাজার সার্ব্বভৌমিকত্বের সামান্য ছায়াও তদানীন্তন রাজন্য সমাজে পতিত হয় নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যাঁহারা সসাগরা ধরার অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে, মুসলমান রাজত্বকালীন সামান্য সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় অনতিসমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই সীমাবদ্ধ অনতিবিস্তৃত ভূভাগ শাসন করিয়া তাঁহারা একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। কিসে প্রজাবর্গ কুশলে থাকে, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অধর্ম্ম প্রবেশ করিতে না পারে, বেদবিশারদ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁহারা ব্যাপৃত থাকিতেন; রাজা বহিঃশত্রুগণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া কোষদণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন। রাজাকে সিংহাসনে অভিষেক করিবার সময় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই বলিয়া শিক্ষা দিতেন; "যাহা কিছু ধর্ম্মসঙ্গত, তাহাই কর্ত্তব্যজ্ঞানে অতন্দ্রিত ভাবে পালন করিবে; কাম, ক্রোধ, লোভ ও আত্মাভিমান দূরে ত্যাগ করিয়া প্রিয়াপ্রিয়ের বিষয় না ভাবিয়া সকল প্রাণীকে সমভাবে রক্ষা করিবে। যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, নিজের কর্ত্তব্যে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে স্বীয় বাহুবলে নিগ্রহ করিতে ভুলিও না। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যাহাতে কোনরূপে দণ্ডিত না হয়েন, যাহাতে রাজ্যমধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন না হয়, কায়মনোবাক্যে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।" এই উৎকৃষ্ট উপদেশের উপরই সনাতন রাজধর্ম্ম স্থাপিত; বলিতে কি ইহাই শাশ্বতী রাজনীতি। ইহার সম্যক্ অনুসরণ দ্বারাই রাজা সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করেন; অন্যথা করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হয়। বেণ, নিমি, নহুষ, সুদাস প্রভৃতি নৃপতিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। এই সকল রাজা স্ব স্ব দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে প্রজার মঙ্গলে দৃষ্টি না রাখাতে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট হইয়া-

ছিলেন, তাঁহাদের প্রচণ্ড ক্ষত্রবল আড়ম্বর-শূন্য ব্রহ্মতেজের বিশ্বদাহী স্ফুলিঙ্গ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মণগণই অচ্ছৃঙ্খল রাজাদিগকে শাসিত করিয়া রাজ্যের মঙ্গল নিরন্তর অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রই যে, "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ", নিরহঙ্কার, অমৎসর ও স্বার্থত্যাগী ছিলেন, এরূপ বলা যায় না। দুর্ব্বাসা ও অগ্নিগর্ব্বের ন্যায় দাম্ভিক ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তও পৌরানিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সে যাহাহউক, বর্ণভেদ প্রথার স্ফূর্ত্তি সহকারে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ব্রাহ্মণ একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়িলেন। যে ব্রাহ্মণ কোন রাজার কৌলিক গুরু বা পুরোহিত হইলেন, তাঁহার সন্তানগণ যোগ্য না হইলেও নির্ব্বিবাদে সেই গুরু দায়িত্ব পূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিলেন। তখন রাজ্যবিস্তার ও রাজ্য রক্ষা রাজন্যগণের প্রধানতম উদ্দেশ্য; আভ্যন্তরীণ কোন সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা মনোনিবেশ করিবার অবসর পান নাই, অথবা করিতে সাহস করেন নাই। অপিচ সমাজ তখন সম্পূর্ণ গঠিত হয় নাই। তখন সমাজের গঠন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; ব্রাহ্মণই তাহার স্থপতি। এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা, সকল ধর্ম্মকর্ম্মেই ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য অসাপত্ন্য হইয়া পড়িল। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা যোগ্য, তাঁহাদিগেরই প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল; কিন্তু যাঁহারা অযোগ্য, তাঁহারাও পিতার ও পিতামহের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিলেন; কেহ তাঁহাদিগের অধিকারে সামান্য আপত্তিও উত্থাপন করিল না। এইরূপে গুরু ও পুরোহিতের পদ ক্রমে পরম্পরাপ্রাপ্ত কৌলিক স্বত্বরূপে পরিগণিত হইল। তৎকালে একটি বিষয় ইঁহাদের স্বার্থসংরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি একএকটী ঋষি একএকটী বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের দ্রষ্টা। সেই মন্ত্ররহস্য তাঁহারা স্ব স্ব সন্তানদিগকেই শিক্ষা দিতেন, অপর কেহ তাহা জানিতে পারিত না। সুতরাং সেই মন্ত্রপ্রভাবই তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রধান সহায়। এইরূপে কোন বিশেষ রাজকুলের পুরোহিত উপযোগী সকল গুণগ্রামে বিভূষিত না হইলেও অনেকে পিতৃ দৃষ্ট মন্ত্রের অধিকারী থাকিতেন বলিয়া সেই উচ্চপদে নির্ব্বিবাদে অধিষ্ঠান করিতেন। কিন্তু কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণ যোগ্য অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হইয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। এইরূপে ব্রাহ্মণত্ব পরম্পরাপ্রাপ্ত

কৌলিক স্বত্বরূপে পরিগৃহীত হইল এবং ইহার পরিচায়ক ও পরিমাপক গুণাবলী ক্রমে বিধানগ্রন্থের একটী অনাবশ্যক অধ্যায়ে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অচিরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়াতে সমাজে প্রচণ্ড বিপ্লবের আবির্ভাব হইল। বীর বিশ্বামিত্র সেই বিপ্লবের নায়ক।

ক্রমশঃ

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় কবিভূষণ।

সোণার পারিজাত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নৈহাটী হইতে সাতাইশ মাইল দূরে, গঙ্গাতীরে এক ভগ্ন অট্টালিকা,—নিকটে কোন গ্রাম নাই, জন মানবের বসতি নাই, সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে, পূর্ব্বদিকে মল্লিকপুর, দক্ষিণে তিন মাইল, ভ্রাতৃশালা উত্তরে বিনোদনগর, জনশূন্য ভগ্ন অট্টালিকা বহুদিন ধরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে,—কেহ সে দিকে ফিরিয়াও চাহে না। অট্টালিকার অধিকাংশ গৃহই ভগ্নশীর্ষ; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ বট-অশ্বত্থ জন্মিয়া গিয়াছে, ইষ্টক স্তূপ, আর ভগ্ন স্তম্ভ, কচিৎ মধ্যে মধ্যে দুই একটা কক্ষ, অভগ্ন অবস্থায় আছে, সেই অট্টালিকার আয়তন, বহুদূর বিস্তৃত,—অট্টালিকার চারিধারে পরিখা-রেখা তখনও অধিক ছিল, সেই অতীত জীর্ণশীর্ণ দর্প কবলের মত ভগ্ন জীর্ণ পরিত্যক্ত অট্টালিকা দেখিয়া কোন পথিক অনুমান করিতেন, ইহা কোন অতুল বলশালী রাজবাড়ী ছিল, মালেকানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া রাজা ও রাণীকে গঙ্গাজলে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, কোন উদীয়মান ঐতিহাসিক বিবেচনা করেন, তা নয়, এই বাড়ীতে এক ঘর বড় জমিদারের বাস ছিল,—বর্গীরা তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া গৃহ মধ্যেই মারিয়া রাখিয়া যায়,—মরণের পর এখনও তাহাদের প্রেতাত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঐ সকল ভগ্ন গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায়।

শেষোক্ত মতই অতিশয় গ্রাহ্য হইয়া, সর্ব্বত্র প্রামাণ্য হইয়াছে,—কেননা, মল্লিকপুরের হরিপাল বিনোদনগরের হাট করিয়া যখন পহনার নৌকায় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল, অতি করুণস্বরে একটা প্রেতিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের মর্ম্মগাথা দিগন্তের কোলে ভাসাইয়া দিতেছিল। সেই কথা সে বাড়ী গিয়া তাহার স্ত্রীর সাক্ষাতে বলায়, তবে প্রেতিনীর দৃষ্টিতে তাহার স্বামীর ভবিষ্য অকল্যাণ আশঙ্কায় তাহার স্ত্রী সে রাত্রে তাহাকে আহার করিতে দেয় নাই, পরে তৎপর দিবস অতি প্রত্যূষে গিয়া রামগতি

দাদা ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিয়া সত্বর পাঁচ আনা পয়সা ও তিন আস্ত হাড়ী দিয়া, এক ঘটি জল পড়িয়া লইয়া, স্বামীকে পান করাইয়া তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

কৃষ্ণপক্ষের রজনী ঘন ঘোর, দিকে দিকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের বিরাট স্তূপ ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিতেছে, সেই অন্ধকার রাশির মধ্য দিয়া পথহারা পথিকের ন্যায় দিশে হারা সমীরণ হু হু করিয়া কোন্ হইতে কোন্ দিকে চলিয়া যাইতেছে, আকাশচন্দ্র তারকা পরিশূন্য পরে মেঘ গুলা আকাশে জড়াজড়ি করিতেছিল,—গঙ্গা স্থির হইয়া আকাশের মেঘের দিকে চাহিয়া লঘু মৃদু গতিতে বাহিতের অনুগমনে চলিয়া যাইতে ছিল।

সেই জনমানব শূন্য ভগ্ন অট্টালিকার, ইষ্টক স্তূপের মধ্য হইতে একপাল শৃগাল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া একবার ভীষণ কোলাহলে ডাকিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লইয়া অবশেষে স্থির হইল, তাহাদের সেই ভীষণ কোলাহলে, সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যস্থ এক কক্ষে এক যুবতী জাগিয়া উঠিয়া বসিল, সে অধিকক্ষণ নিদ্রা যায় নাই—একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র। উঠিয়া বসিয়া চারি দিকে চাহিল,—সমস্ত ভগ্ন কুটীর ব্যাপিয়া ঘোর অন্ধকার জমিয়া ছিল, ব্যাধগৃহ সমানীতা পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় সে একবার চকিত চঞ্চল চাহনীতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সব অন্ধকার। অন্ধকার ব্যতীত আর কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না।

তাহার নিকট একটি দেশলাইয়ের বাক্স ছিল, তাহা জ্বালিল, নিকটে একটা মৃৎ প্রদীপ ছিল, দেশলাই টানিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হইল, রমণী যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল,—সে গৃহখানির দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির পরিমাণ কম নহে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ, গৃহের মধ্যে কোথাও ধসিয়া, কোথাও বসিয়া গিয়াছে, গৃহের দরোজায় বাহির হইতে শিকলী, এক চাবি দেওয়া, গৃহমধ্যে সামান্য প্রকারের কিছু আহার্য্য ও এক কলসী জল সংস্থিত ছিল, যে গৃহে যুবতী অবস্থান করিতেছিল, তাহার পার্শ্বে আর একটি গৃহ, সে গৃহের সহিত এই গৃহের সংলগ্ন দ্বার উন্মুক্ত,—কিন্তু বাহির হইতে তাহারও দ্বার বন্ধ, ফলকথা ভিতর হইতে এই দুই ঘরে যাতায়াত চলে, কিন্তু বাহির হইবার উপায় নাই, যে গৃহে যুবতী ছিল, সে গৃহখানি অসংস্কৃত ও জীর্ণ হইলেও সেখানে অন্য কোন জঞ্জালাদি ছিল না, কিন্তু অপর গৃহখানি নিতান্ত অপরিস্কৃত দুর্গন্ধাদিতে পূর্ণ।

যুবতীর শয্যা একখানি ছিন্ন মাদুর, উপাধান তাহার সুপুষ্ট বাহু,—কোমলাঙ্গে ছিন্ন মাদুরের দাগগুলি রক্তমুখ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যুবতী উঠিয়া আলো জ্বালিয়া, সেই মাদুরের উপরে :পা ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে জলধারা গড়াইয়া ফুল্লগোলাপবৎ গণ্ডযুগল ভাসাইয়া তুলিতে লাগিল।

যুবতী যেখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, সহসা তাহার অদূরে মেঝের একটা ধসা যায়গা হইতে একটা স্থূলদেহী ইঁদুর এক টুকরা কাগজমুখে করিয়া লইয়া বোধ হইল, মেঝের নিম্ন ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া কিচির মিচির করিয়া উঠিল। যুবতী চমকিয়া উঠিয়া দেখিল একটা ইঁদুর—তখনও তাহার দেহার্দ্ধ ভাগ গর্ত্তে এবং ঊর্দ্ধাংশ উপরে—যুবতী ইঁদুর দেখিয়া তাড়া দিল, ইঁদুরটা মুখের কাগজ টুকরা ফেলিয়া দিয়া, উপরে উঠিয়া কোণের পথ দিয়া জঞ্জালময় অপর গৃহে চলিয়া গেল, জনমানব পরিত্যক্ত গৃহে একখণ্ড কাগজ কোথা হইতে লইয়া আসিল ভাবিয়া, যুবতী কাগজখণ্ড কুড়াইয়া আনিয়া আলোর নিকট লইয়া তাহা পাঠ করিল, সেই কাগজ খণ্ডের কোণাকুণিভাবে এক পাশ ইঁদুরে কাটিয়া ফেলিয়াছে, সমস্ত পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারিল না, যেটুকু লেখা ছিল, তাহা এই—

* * * * যদি ভিতরে আসিতে পার, * * * হিনী জানিতে পারিবে, তোমারও কি * ভ হইবে, আমার জ্বালা অসীম, * ক ভয় করিও না। আমি কে দিন থাকি * তবু পাইবে।—

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী।

যুবতী দুই তিনবার পত্রখানি ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল,—স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিল, তাহা স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর!

তখন সে ভাবিল, ও কাগজ কোথা হইতে আসিল, ঐ পাশের গর্ত্তটা দিয়া ইঁদুরে টানিয়া আনিল,—ঐ গর্ত্তের মধ্যেই কি মানদানাম্নী কোন স্ত্রীলোক আমারই মত পাষণ্ডগণের করকবলিত হইয়া আবদ্ধ আছে! কিন্তু মেঝে যেরূপ কঠিন ভিত্তিতে গাঁথা, তাহাতে পাষণ্ডগণ উহার মধ্যে মনুষ্য থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিবে কি প্রকারে, কিন্তু এই প্রাসাদের অন্য কোন গৃহে অথবা আমার আসিবার পূর্ব্বে এই গৃহে কোন রমণীকে পাষণ্ডগণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল,—হয়ত তাহার নিকটে কালী কলম ও কাগজ ছিল,—হয়ত সেই-ই একথা লিখিয়া থাকিবে, তারপরে সে চলিয়া গিয়াছে, অথবা পাষণ্ডগণ তাহার জীবনের অন্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

যুবতী আবার পত্রখানা লইয়া .আলোর কাছে গেল,—আবার পাঠ করিল, যদি ভিতরে আসিতে পার, * হিনী জানিতে পারিবে, "হিনী বোধ হয় কাহিনী হইতে পারিবে, তখন আবার ভাবিল,—এর ভিতরে

যাইতে বলিতেছে,—কিন্তু ভিতর অর্থে কি, এই প্রাসাদের ভিতর, না ভূগর্ভের ভিতর? সে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইল, যেখান হইতে ইঁদুরটা উঠিয়াছিল, তাহার নিকটে গেল,—চাহিয়া দেখিল একটা সুড়ঙ্গ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দুইটা অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া পার্শ্বের টালি ধরিয়া টান দিল, টালিখানা উঠিয়া পড়িল,—তারপরে সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, একখানা মোটা লৌহপাত, তৎপার্শ্বে পাতিত,—খুব জোরে সেখানা ধরিয়া টানিল,—এবার সমচতুষ্কোণ চূণ বালির কাজ করা সুড়ঙ্গ এবং নামিবার সিঁড়ি—সে তখন ভিতর হইতে গৃহের চারিদিকে খিল বন্ধ করিয়া দিয়া প্রদীপ হস্তে করিয়া সেই সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

অতীতের স্মৃতি।

আরা।

কর্ত্তব্যের গুরুভার স্কন্ধে বহিয়া কিছুদিন আমাকে আরায় বাস করিতে হইয়াছিল। ঐ অল্প দিনে আরা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, আজ তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

আরা কলিকাতা হইতে ৩৬৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা একটী ক্ষুদ্র সহর। আবার প্রান্তভাগে গাঙ্গী নদী (শোননদের খাল) প্রবাহিতা। ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র, জলও বর্ষার সময় ভিন্ন অতি অল্পই থাকে। এখান হইতে ডিহিরি অবধি একটী কেনাল বা খাল আছে। এই কেনাল দিয়া ষ্টিমারে ডিহিরি যাওয়া যায়। ভাড়াও খুব কম। এই খালের অনতিদূরে জলের কলের রিজরভার (Resorvoir) রাখা আছে। জলের কল থাকায় আরার লোকের কখনও জলের কষ্ট পাইতে হয় না।

আরা আসিবার পথে কইলবারের নিকট (কলিকাতা হইতে ৩৬০ মাইল) শোন নদের উপর এক পোল আছে। এই পোলটি (Bridge) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা ১৮৬২ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা ৪,১২৬ ফিট দীর্ঘ, ইহার উপর দিয়া রেলওয়ে ডবল লাইন ও নিম্ন দিয়া পদব্রজে যাতায়াতের দুইটি রাস্তা আছে। ২৮টি প্রকাণ্ড থামের উপর এই পোলটি অবস্থিত। প্রত্যেক থাম ১৫০ ফিট অন্তরে নদী-গর্ভে ৩২ ফিট প্রোথিত আছে। নদী-বক্ষ হইতে পোলের উচ্চতা ৩৫ ফিট। এই পোলটি দেখিতে অতি সুন্দর। ট্রেনের উপর হইতে ইহার সৌন্দর্য্য কিছুই দেখা যায় না। পোল দেখিতে হইলে কইলবার ষ্টেশনে নামিতে

হয়। পোলের উপরেই ষ্টেসন। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৪৪,৩৩,৩২৪ কোটী টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক ফুটে ৯১৭ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ভাইকার্স বয়েল vicars Boyle সাহেবের অক্ষয়কীর্ত্তি "আরাহাউস", ষ্টেসনের অনতি দূরে, সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী কুমরসিংহ আরার ইংরাজ প্রবাসীদিগকে নৃশংসরূপে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। ভাইকার্স বয়েল রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার পূর্ব্বে এ সংবাদ পাইয়া "আরাহাউসে" প্রচুর খাদ্য ও পানীয়ের সহিত সাহেবদিগকে আশ্রয় দান করেন এবং প্রাণপণে বিদ্রোহীদিগের প্রতিরোধ করেন। দানাপুর হইতে সৈন্য আসিয়া হতভাগাদিগকে রক্ষা করে, উক্ত বাটীর দেওয়ালে অদ্যাপি গুলির দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটি সরকারি ও একটি প্রাইভেট এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। স্কুলটির অবস্থা মন্দ নহে। পরীক্ষার ফল প্রত্যেক বারেই প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। এখানকার জেলে ভাল কম্বল তৈয়ারী হয়, নিকটবর্ত্তী পল্লীতেও ভাল কম্বল পাওয়া যায়, দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা।

এখানকার বাজার প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বসিয়া থাকে। এখানে "ঢেবুয়া" (গোরক্ষপুরী পয়সার) চলন বেশী। পয়সাকে ইহারা পাই বলে, ঢেবুয়া এক আনায় ৭টা পাওয়া যায়। আমরা প্রথম প্রথম এক পয়সার জিনিস কিনিয়া পাই দিয়া আসিতাম, হিন্দি ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় মধ্যে মধ্যে বড়ই ভুগিতে হইত। একদিনের কথা শুনিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। হিন্দি না জানিলেও হিন্দি বলিবার খুব সক ছিল। একদিন চাকরকে ২টা পাই দিয়া একটা লাউ আনিতে বলিয়া ছিলাম, তখন জানিতাম না যে লাউ কে "কদুয়া" বলে। লাউয়ের হিন্দি "লাউয়া" করিয়া লইয়াছিলাম। চাকর বেচারার দোষ কি, সে এক নাপিত আনিয়া হাজির করিয়াছিল। তখন কি আর জানিতাম যে নাপিত কে "নাউয়া" বলে। সে অবধি হিন্দি বলার সক [illegible] অনেক কমিয়াছিল।

এখানে উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশধর ডুমরাও একটি বাটী ও একটি উদ্যান আছে। এই বাটীতে মহারাজের কর্ম্মচারীরা বাস করেন, শুনিয়াছি পূর্ব্বে মহারাজ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ ইংরাজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালি বাসিন্দা আছেন, অনেকে তাহারা পরিবর্ত্তনের জন্যও

এখানে আসিয়া থাকেন। স্থানটি বেশ হাজার, এখানে জজ ও মাজিষ্ট্রেটের কাছারি স্বাস্থ্যকর। আরার লোক সংখ্যা ৪৬,২০০ এবং দাতব্য হাঁসপাতাল আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রীতি-আবাহন।

১

সুষুপ্তি-সিন্ধুর জলে ডুবিল মেদিনী,—
আগত যামিনী!
পুলকে খুলিল আঁখি কুসুম-কামিনী!
কুঞ্জ-বিনোদিনী!
ছড়া'য়ে জোছনা-ধারা, করি বিশ্ব মাতোয়ারা,
হাসিছে চন্দ্রমা, পাশে প্রেয়সী রোহিণী,
প্রফুল্ল কুটিনী!

২

নীরবে সন্ধ্যার সনে প্রীতি সম্ভাষণ
করিছে পবন;
হেরিছে প্রকৃতি-প্রেম-মদির-নয়ন
প্রীতির স্বপন!
মরি কি শান্তির ছায়া, জুড়াইয়া শ্রান্তকায়া
মধুরে মধুরে করে প্রীতি-বিলেপন,—
মৃদু পরশন!

৩

এ সুখ সন্ধ্যায় প্রিয়ে—কল্পনে আমার
এস একবার!
নাচিয়া উঠুক হৃদি, পরশে তোমার,—
প্রেম-পারাবার!

স্বর্গীয় বীণার তান, মোহিত করুক প্রাণ,
দূরে যাক্ হৃদয়ের তীব্র হাহাকার,—
বিষাদ-আঁধার!

৪

এস এ বিচ্ছিন্ন হৃদে স্বর্ণ-লতিকা,—
অরণ্য বালিকা!
ধরিয়া সোণার করে, হে অভিসারিকা,
প্রেমের তুলিকা!
মুক্তপ্রাণে গুপ্ত ছবি, আঁক'রে প্রাণের কবি,
ফুটিয়া উঠুক কুঞ্জে অস্ফুট কলিকা,—
মালতী, মল্লিকা!

৫

এস লো অতীত-স্মৃতি অঞ্চলে বাঁধিয়া,
বিশ্ব আলিঙ্গিয়া,
কবিতার পুষ্পে পুষ্পে সোহাগে সিঞ্চিয়া
ত্রিদিব-অমিয়া!
বিরহে বিবশ অঙ্গ, স্রোতস্বিনী নিস্তরঙ্গ,
অদম্য আনন্দে পুনঃ উঠুক নাচিয়া,
হৃদি তরঙ্গিয়া!

৬

আজি এ বর্ষণ-ঘন,—অম্বুভা কম্পন,—
সঘন শ্রাবণ;
উদ্দীপিত সৌদামিনী, বিটপী নর্ত্তন,—
জীমূত গর্জ্জন!
উদ্দাম ঝটিকা ঘোর, বিষাদ-নীলিমা-লোর,
থাকুক সে ভীষণতা করি আবরণ,
বাঞ্ছিত রতন!

বসন্ত-বিলাস-কুঞ্জ-সুরুচি-স্বপন

হেরুক নয়ন,

সুপ্ত অবনির কোণে লভুক শয়ন

বিরহ-তপন !

সপুলিন-সন্ধ্যা-কূলে, নীরবে বিটপী-মূলে,

এস দোঁহে করি পূত প্রীতি-উদ্বোধন, —

ঢালিয়া চুম্বন !

৮

হউক অনন্ত গর্ভে মগ্ন স্বকল্যাণ,—

ব্রত-অনুষ্ঠান !

হউক বিস্তীর্ণ বিশ্বে ব্যাপ্ত অপমান,—

ভ্রূকুটি-আহ্বান !

জগতের চক্ষুগুলি, দেখুক আপনা ভুলি'

তোমার আমার ব্রতে নিত্য বহমান,—

কি নীতি মহান্ !

৯

সাধনার শেষ সীমা——সিন্ধু সম্মিলন,—

অনন্ত গগন !

কর্ত্তব্য--সুরভি--ঘ্রাণে ভরিবে ভুবন,—

নন্দন-কানন !

নিমীলিত দু'টি আঁখি, অনিমিষে চেয়ে থাকি,

অনন্ত জগৎ-বক্ষে হেরিবে তখন,

পুণ্য-দরশন !

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

কে তুমি ললনা ?

(১)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
কেন গো তোমার পানে, চেয়ে থাকি অন্য মনে,
ভুলে যাই সংসারের অনন্ত-যাতনা।
অধমের দুঃখহরা কে তুমি ললনা ?

(২)

কুসুম-ভূষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
অভাগার দুঃখ দেখে, মুখেতে অমিয় মেখে,
এসেছ কি পূরাইতে অতৃপ্ত বাসনা।
অভাগার পাছে ফের কে তুমি ললনা ?

(৩)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
হেরিলে তোমার মুখ, মনে পড়ে গত সুখ,
মনে পড়ে প্রেয়সীর হাসি-মুখ-খানা।
অতীতের স্মৃতি তোল কে তুমি ললনা ?

(৪)

কুসুম-ভূষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
কতদিন হলো হায় ! শ্মশানের আঙ্গিনায়,
প্রিয়াসনে বিসর্জ্জিছি সংসার কামনা।
গত-সুখ হৃদে তোল কে তুমি ললনা ?

(৫)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
দিওনা হৃদয়ে ব্যথা, তুলোনা অতীত কথা,
বাজাও না হৃদয়ের ছিন্ন-তন্ত্রী—বীণা।
প্রাণ-ভোলা বেশে সেজে কে তুমি ললনা ?

(৬)

কুসুম-ভূষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
ভেবেছিনু ভুলে যাব, ভুলে তারে সুখী হব,
ভুলি ভুলি করি আর ভোলা হল না।
হৃদয়ের শান্তি-হরা কে তুমি ললনা ?

(৭)

স্বরগের শোভাময়ী কে তুমি ললনা ?
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, বিজনে এসেছি বালা,
শান্ত হ'তে দাও দীনে করোনা ছলনা।
অভাঁগায় দাও দুঃখ কে তুমি ললনা ?

(৮)

কুসুম-ভূষণ প'রে কে তুমি ললনা ?
যেথা হ'তে এসেছিলে, সেথা তুমি যাও চ'লে,
প্রেমময়ী-মূর্ত্তি ল'য়ে আর হেথা থেকো না।
অধমেরে লক্ষ্যভ্রষ্ট করোনা করোনা।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

শেষ।

সঙ্গীত মিলায়ে গেলে ঘন-বায়ু-স্তরে
শেষ তানটুকু খেলে স্মৃতির মন্দিরে।
শ্বেত শুভ্র যূথীপুঞ্জ শুষ্ক হ'য়ে গেলে
সুমধুর ঘ্রাণ তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে খেলে।
গোলাপ শুকায়ে গেলে 'দল'গুলি তার
প্রিয়ার শয্যায় পড়ি করে হাহাকার।
তেমনি তোমার স্মৃতি তুমি গেলে চলে
প্রেমের বুকেতে শুয়ে চুমি পড়ে ঢলে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সতী-প্রশস্তি। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ প্রণীত। কবি ভূমিকায় বলিয়াছেন যে—"এই পুস্তকে সতী রমণীর পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উপাদান প্রধানতঃ আমাদের পরম পবিত্র হিন্দু শাস্ত্র হইতে গৃহীত"—কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে ইউরোপীয় কবি Dantএর "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক গ্রন্থের ঈষৎ ছায়া মাত্র। যদুনাথ বাবুর কবিতাগুলি বেশ শ্রুতিমধুর হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কবিতার ভাব অতি সুন্দর হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"মরণে কেবল প্রেম সুবর্ণের
নিকষ-পাষাণ এই জগতের!
মরণের সনে নর-হৃদয়ের
কাম-বলিদান প্রেমের যুগে;

*   *   *

যদুনাথ বাবুর "কয়েকখানি পত্র" নামক আরও একখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি। পুস্তকখানি স্ত্রীপাঠ্য এবং রমণীকুলের সম্পূর্ণ শিরোমণি।

যমুনা। আষাঢ়, শ্রীঃ— স্বাক্ষরিত "উষার স্বপ্ন" কবিতা মন্দ নহে। অভিমান একটি চলন সই গল্প, নূতনত্ব কিছুই নাই। বাঁশরী বাজাইতে গিয়া লেখিকা যা'তা' বাজাইয়াছেন এ বাজনা অনেকবার শোনা হইয়াছে। বিচারমালা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। "কুসুম মধুপ বার্ত্তা" ঠিক বৃকোদর বধ কাব্যের ন্যায় সুল-লিত। কবিতাদেবী একেত কলেজের ছাত্র-গণের ন্যায় জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া-ছেন, তাহার উপর ডাক্তারকুল যদি তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন, তবে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। নিশীথিনীর প্রতি shellyr To night নামক কবিতার অনুবাদ মন্দ হয় নাই লেখকের হাত ভাল তবে অত literal অনুবাদ ভাল নয়; "মন্দামেয়ে" একটি পাগলামী বা জ্যাঠামি কাগজের উপর এসব কেন? প্রণয়ে প্রায়শ্চিত্ত গল্প। গল্পটিতে অস্ফুটতা দোষ না থাকিলে বড় সুন্দর হইত। মোটের উপর যমুনায় সুপাঠ্য প্রবন্ধের বড় অভাব।

শ্রাবণ। এইবারে পূর্ণ বাবুর আর্য্য-সাহিত্যে অভিশাপ ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগিল না, পূর্ণ বাবুর লেখায় আগাগোড়া চিন্তাশীলতা বিদ্যমান, ইহাঁদের নীলায় কি অকাল মৃত্যু হইল? মোটের উপর যমুনার পরিচালন ভাল হইতেছে না।

উষা। আষাঢ় শ্রাবণ। বালক বৃন্দের

জন্ত প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। পরিচালকগণ ছাপা কাগজের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, প্রবন্ধের প্রতি ঐরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। শ্রাবণমাসে "আত্মদান" ও আষাঢ় মাসে "খোকা" উহার মধ্যে একটু ভাল। এরূপ পত্রিকা সমালোচনা করাও বিড়ম্বনা জনক। এই পত্রিকায় আমরা প্রচুর বাল-পাঠ্য প্রবন্ধ দেখিতে ইচ্ছা করি।

প্রবাহ। ভাদ্র। আজকালকার মাসিক পত্রিকার মধ্যে প্রবাহ একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকা। এবারকার প্রবন্ধ কয়টাই আমাদের ভাল লাগিল, তন্মধ্যে দামোদর বাবুর "অস্থির সত্য" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইবারে অভিরাম যে বল বাজাইয়াছেন, তাহা বড় মধুর তাহার প্রতিনিক্কণে ওস্তাদী বিদ্যমান। অভিবাদন বড় কষ্টসাধ্য রচনা এরূপ রচনা কোন কারণেই প্রবাহে স্থান লাভের যোগ্য নহে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

হীরাবাই। প্রসিদ্ধ তাম্বুলবিহার বিক্রেতা কিশোরীলাল জৈনীকর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তাঁহার দোকানের ম্যানেজার বাবু কৃষ্ণানন্দ শর্ম্মা প্রণীত। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ভাল। লেখক পুস্তকপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু ইহাতে ইতিহাসের নামগন্ধ নাই, ঐতিহাসিক উপন্যাস কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় লেখক জানেন না, গ্রন্থ মধ্যে লেখকের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট বিদ্যমান! কিশোরী বাবু ধনী ব্যক্তি, তাই বলিয়া কি এইরূপে অপব্যয় করে। তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে, ফাও পাইলে লোকে এরূপ পুস্তক লইতে কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু এইরূপ অত্যাচারে বঙ্গ সাহিত্য মানবের দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিতেছে।

শোক সংবাদ। বঙ্গবাসী পত্রিকার সত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু আর ইহ জগতে নাই। সকলের মমতাপাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহার নির্লিপ্ত আত্মা অদ্য কয়েকদিবস হইল অমরভবনে চলিয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু নিজে একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রকাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা করিতেন, ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল করুন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি জানাইতেছি। আলোচনায় আমরা তাঁহার জীবনী ও প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। পূজা সমাগত দেখিয়া তাড়াতাড়ি বশতঃ ভাদ্র সংখ্যা তিনফর্ম্মা পরিবর্ত্তে দুই ফর্ম্মা দেওয়া হইল ইহাতে গ্রাহকগণের ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ নাই কারণ আমরা বৈশাখ আষাঢ়মাসে অর্দ্ধ ফর্ম্মা হিসাবে এক ফর্ম্মা অতিরিক্ত দিয়াছি।

ম্যানেজার।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ। } আশ্বিন, সন ১৩১২। { ষষ্ঠ সংখ্যা

আশা।

এ জীবন সূর্য্য যবে অস্ত গেল চলি,
হে বঙ্গ জননী মোর, "আয় বৎস" বলি,
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ দুয়ারে;
ললাটে চুম্বন দিলে, শিয়রে আমার,
জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর,
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর,
সঙ্গীতের পুরস্কার, তারি ক্ষত জ্বালা,
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল,—তুলি সেই মালা,
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি,
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্রমাল্য গাছি,
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া,
মোরে, তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন;
সহসা জাগিয়া দেখি—এ শুধু স্বপন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শারদোচ্ছ্বাস।

হরষে আজিকে হাসিছে ধরণী
মধুর সমীরে হরষ মাখা।
প্রাণের হরষে হাসিছে প্রকৃতি
ফুল ফল তরু লতিকা শাখা॥
নীলাকাশে ভাসি শরতের রাকা
প্রাণের আবেগে জোছনা ঢালে।
মনে হয় যেন এসে প্রাণে প্রাণে
গাহিতেছে গীত আবেশে চলে॥
উঠ বঙ্গবাসী মেলহ নয়ন
আসিতেছে আজ আকাঙ্ক্ষার ধন।
ত্রিলোকতারিণী এস মা জননী
নিক্ষেপি নিঃশব্দ চঞ্চল চরণ॥
কি অস্ফুটবাণী মিশিছে সমীরে
হৃদয়ে তুলিছে মধুর তান।
সুখের সাগরে ভাবের লহরে
মাতিয়া উঠিছে আমার প্রাণ॥

সংসার যাতনা দগ্ধ-খিন্ন প্রাণ
হরষে কেনগো পাগল পারা।।
চির-বিষাদিত হয়গো যেজন
সেও ত আজিকে হরষে ভোর।
ভুলে যায় সব সংসার যাতনা
হরষে মুছিয়ে নয়ন লোর।।
"মা আসিছে" বলে বঙ্গবাসী দলে
পরিছে নূতন নবীন সাজ।
হাসি মাখা মুখে চলে মন সুখে
দেখিতে মায়েরে ভুলিয়া লাজ।।

কেনগো আজিকে বিষাদিত চিতে
ফুটিতেছে এই মধুর ধারা।
এ হরষ দিনে জেগে ওঠ বীণে
ঝঙ্কারি আমার হৃদয় তারে।
গাওরে পঞ্চমে ধৈবত মধ্যমে
মাতায়ে চৌদিক সুরব পারে।।
হয়ে হরষিত মায়ের পূজায়
বিহ্বল পরাণে সবে মিলে গায়।
এস মন আজি নিয়ে ফুল সাজি
ভক্তিভরে সপি মার রাঙাপায়।।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র [illegible]

দেবী পূজা।

পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। এখানকার কিছুই চিরকাল সমভাবে থাকেনা বলিয়াই ক্ষণে ক্ষণে সমস্ত বস্তুর পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে, এই নিয়মে কালের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। হেমন্তের পর শীত, শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ। আজি পরিবর্ত্তন-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই সুখের শরৎকাল সমাগত। বর্ষার সে মেঘ-মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে। সুনীল অম্বর লাবণ্যসাগরে ভাসিতেছে; শরতের শুভ্র আকাশ আর ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন নাই। মেঘ বিনির্মুক্ত শরতের শশধর অম্বর আসনে সমাসীন হইয়া আপন সুবিমল স্নিগ্ধ কিরণ প্রভায় চারিদিক পুলকিত করিতেছে। চাঁদের হাসির সহিত প্রকৃতির মধুর হাসি বেশ মেশামিশি ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া কি যে এক অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, আনন্দময় ভাব পরিস্ফুরণ করিতেছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রকৃতির সে দীনহীন মলিনবেশ আর নাই, আবার যেন সতী সঞ্জীবিতা হইয়াছেন, রাজরাণী বেশ ধারণ করিয়া আবার যেন মহামায়ার আবাহন মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়াছেন, তাই আজ হাটে, ঘাটে, পথে, মাঠে চারিদিকেই হাসির রাজ্য বিরাজিত, চারিদিকেই সুখের তরঙ্গ প্রবা-

হিত হইয়া চিরদুঃখী বাঙ্গালীর প্রাণে সুখের অমিয় সুধা-ধারা ঢালিয়া দিতেছে। কান্তারে ফুল ফুটিয়াছে; জ্যোৎস্নাবিধৌত শারদীয় কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া মাতৃ পূজার জন্য তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে, এখন চারিদিকেই ফুল চারিদিকেই কুসুম রাজ্য বিস্তৃত, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্য যেন ফুলময়, বিশ্বেশ্বরীর পূজার জন্য প্রস্তুত। মরি! মরি! প্রকৃতি সুন্দরী কেমন মনোরম, অভিনব সাজে সুসজ্জিতা হইয়া, কুসুম কুন্দ শেফালিকা প্রভৃতি নব নব কুসুম ভূষণে বিভূষিতা হইয়া পরমাপ্রকৃতি আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। ভাই বঙ্গবাসি! এই সময় একবার প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় খুলিয়া নয়ন মেলিয়া প্রকৃতি সতীর এই সাময়িক অনুপম শোভারাশি সন্দর্শন করিয়া দেহ মন প্রাণ ও আত্মার চরিতার্থতা লাভ কর, এই প্রকৃতি জননীই যে জগত সাম্রাজ্যের অধিকারিণী, আমরা সকলেই এই জননীর সন্তান, তাঁহারই স্নেহময় ক্রোড়ে সকলেই একত্রে প্রতিপালিত, অতএব তাঁহারই সুখে আমাদের সুখ, তাঁহারই দুঃখে আমাদের দুঃখ। দুরন্ত বর্ষায় জননী বিষাদ ভারাক্রান্তা ছিলেন, সন্তানগণেরও কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। আজ মাতা সুখস্রোতে ভাসমান, কাজেই তৎক্রোড়ে স্থিত চিরদুঃখী সন্তানগণই আজ মায়ের সুখে সুখভোগ করিতেছে, তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া বিষাদভাব ভুলিয়া আজ হাসা আসো ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, আজ প্রকৃতির সৌভাগ্য বিনাশের সহিত প্রকৃতিপুত্রেরও সেই ভাগ্য বিকাশের সূত্রপাত হইয়াছে, আজকাল যেদিকে যাই, যেদিকে চাই, সেই দিকেই নব নব ভুবনমোহন ভাবের আবির্ভাব দেখিতে পাই, সেই দিকেই স্বজাতীয় প্রেমের প্রাণভরা আনন্দ কোলাহল শুনিয়া শ্রবণকুহর পবিত্র করিতে পারি।

আবার সেই আশ্বিনমাস। আমাদের সেই আদরের শুভ আশ্বিন সমাগত; শরতের শুভ আশ্বিনে মাতৃ পূজার সমারোহ ঘটা আরম্ভ হইয়াছে। জড়প্রায় নির্জীব বাঙ্গালী আবার শক্তিমন্ত হইয়াছে; অন্ধ আবার চক্ষুষ্মান হইয়াছে, দরিদ্র বাঙ্গালী আবার ত্রিদিবের অধীশ্বরী জগজ্জননীর দর্শন পাইয়াছে। মহাশক্তির মহামন্ত্র বলে আবার তাহাদের দুর্বল হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চার হইয়াছে; সকলে আবার উৎসাহিত হইয়া জননীর বোধন কার্য্যে প্রাণপণ করিতেছে। বাঙ্গালীর এমন উৎসব, এমন প্রাণভরা আমোদ আর কোনও কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন বিশ্বব্যাপী আনন্দ উৎসব আর কোন পূজায় নাই, ঐ মা—আসিতেছেন, ঈশান কোণ আলো করিয়া আমার মা ঈশানী ভারতে আসিতেছেন। সম্বৎসর পরে আবার মায়ের

অকৃতি সন্তানগণকে মনে পড়িয়াছে, মাতৃহারা হইয়া যে আমরা অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতেছি; অন্তর্যামিনী মা সন্তানগণের সেই কষ্ট অন্তরে অনুভব করিয়া দশভুজে দশ-প্রহরণ ধারণ করতঃ আমাদের সকল দুর্গতি নাশ করিবার জন্ম আজ মর্ত্ত্যে আগমন করিতেছেন। মা প্রসন্নময়ি! মা শরণাগত পালিকে! এই শরণাগত দীনার্ত্ত পতিত সন্তানগণের প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টি কর, মা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে! একবার তোমার শক্তিহীন সন্তান গণের প্রতি মুখ তুলিয়া চাও, তাহাদিগকে শক্তিমন্ত কর, তাহাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও। মা! বিশ্বেশ্বরি! একবার কমললোচনে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া তোমার এই সাধের ভারত সৃষ্টির প্রীতি বিধান কর। মা! তোমার পবিত্র ভারতে ঐ দেখ দানবের মর্ম্মভেদী অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তোমার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ভারতে আজ তোমার প্রিয় পুত্রগণ ক্ষুধার সময় খাইতে পায় না, পিপাসার সময় জল পায়না, পরিবার তরে কাপড় পায়না, আজ দুর্ভিক্ষ দানবের বদন ব্যাদানে তোমার লক্ষীর ভাণ্ডার ভারতের অধিবাসীগণ পরমুখাপেক্ষী, আজ দস্যু তস্করের ভয়ে তাহারা একান্ত প্রপীড়িত ত্রস্ত ভীত। মা! দানবের অত্যাচার আর সহ্য হয়না। মা দানবদলনি! তোমার এই অকৃতি সন্তানগণকে দানব হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর। মা অভয়ে! অভয় প্রদান করিয়া আমাদের চরিতার্থ কর। পরিত্রাণ-পরায়ণে! মা! পরিত্রাণ কর, একটু প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়া দেখ মা তোমার স্নেহের সন্তানগণের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, আমদের দারিদ্র্য দুঃখ নাশ করিতে একবার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে ভারতে পদার্পণ কর, আমাদিগকে উদর পূরিয়া চারিটী খাইতে দাও। দুর্ভিক্ষ দানব-করে আমরা মর মর জর জর হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এ সময় তুমি না রাখিলে কে আর রা'খবে মা, দেবি! আমরাই মা আর্য্য সন্তান, তোমার রক্ষিত দৈববলে বলীয়ান তোমার পূতমন্ত্রে মতিমান, তবে মা! আমাদের এ দশা কেন? কেন আমরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পর প্রত্যাশী হইয়া বসিয়া আছি? জননী যাহাদের ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ত্রিলোকীতল যে জননীর পদাশ্রয়ে সতত আশ্রিত, তাঁহার সন্তানগণের এত দুর্দ্দশা কিসের জন্য মা! আমাদের উদরে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, ব্যবহারে কোন অস্ত্র নাই, আজ আমরা নিজ দোষে সমস্ত হারাইয়াছি, অসীম শক্তিমন্ত আর্য্য বংশসম্ভূত হইয়া আজ শক্তি সামর্থ্য বিহীন, নগণ্য জাতির ন্যায় একধারে পড়িয়া রহিয়া'ছি, আজ তোমা হারা হইয়া যে আমাদের এত দুর্গতি, এত অবনতি, এত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে, আজ আমরা

জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি, যদিও বাঙ্গালীর কিছুই নাই, যদিও তাহারা সমস্ত হারাইয়াছে, তথাপি তোমার স্মৃতি, তোমার পবিত্রাদপি পবিত্র স্মৃতি বাঙ্গালী এখনও বিস্মৃত হয় নাই, কত যুগযুগান্তর অতীত হইল, কত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া গেল, তবুও তোমার স্মৃতি এখন বাঙ্গালী সমভাবে মনোমন্দিরে পূজা করিয়া থাকে, সেই ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্ম তোমার উপাসনা করিয়াছিলেন, সঙ্কটে পড়িয়া সঙ্কটনাশিনীর অকাল বোধন করিয়াছিলেন; নীলোৎপলাভাবে আপনার কমল আঁখি উৎপাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তুমি প্রসন্না হইয়া অভয়দানে ভক্তের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছিলে। সাবর্ণিকে মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্যের বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া ভক্ত বৎসলা নামের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলে, আমরা শক্তিহীন সামর্থ্যত্ববিহীন হইলেও কি সে স্মৃতি ভুলিতে পারি? শরত সমাগমে শারদীয়ার্চ্চনা বাঙ্গালীর হৃদয় তন্ত্রীতে গ্রথিত, প্রস্তর ফলকে কঠিনরেখা পাতের ন্যায় ইহা চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে। তাই বাঙ্গালী প্রতিবৎসর ঠিক এই সময়ে এই সুখের শরতে চিন্ময়ী মায়ের মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির সহিত মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতকৃতার্থ হয়, বাঙ্গালী যখন যে সাকারমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পূজা করে, তখন সেই মূর্ত্তিই তাহারা সেই বিশ্বরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়াই পূজা করে। পার্থিব উপাদানে গঠিত কাল্পনিক মূর্ত্তি বলিয়া তখন তাহাদের জ্ঞান থাকেনা। হিন্দুর সাকার মূর্ত্তি এইরূপে গঠিত হয়, ইহাতে কি হিন্দু পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণিত হইল? ভক্তবৎসল ভবারাধ্যামূর্ত্তি গড়িয়া যদি হিন্দু নিন্দনীয় হয় হউক, তাহাতে হিন্দুর গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না।

শরতের ঐ আসনে মহামায়ার এ মহাপূজা জগতে চিরকাল সমভাবে থাকিবে, কেহ ভুলে নাই, কখন ভুলিতে পারিবে না। মা! আমরা পরাধীন উপায়বিহীন, তথাপি মা আমরা তোমার আশাতে আশ্বাসিত, তোমার শ্রীচরণ বলে আমরা বলীয়ান। মা! যোগীন্দ্র মোহিনী, আজ তুমি যোগীন্দ্র ভবন পরিত্যাগ করে মৃগেন্দ্রবাহনে মর্ত্ত্যে নগেন্দ্রভবনে আসিতেছ। বৎসরান্তে আবার কি তোমার পিতামাতার কথা মনে পড়িয়াছে? মা শৈলসুতে! এস মা এস, আপৃথিবী গগন পুষ্পে সুশোভিতা, বসুন্ধরা শ্যামলা শস্যসম্পন্না, প্রকৃতি হাস্যময়ী মা! এইত তোমার পূজার সময়, বহুদিন মাতৃহারা হইয়া যদিও আমরা বলহীন বিত্তবিহীন মর্ম্মযাতনায় ক্ষীণতর হইয়াছি, কিন্তু মা! তোমার আগমনে আমরা আবার উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত শক্তিমন্ত, তোমার পূজা করিতে তোমার প্রসাদ লাভ

করিতে আজ পুনরায় তোমার পাতকী, অকৃতি সন্তানগণ অগ্রসর হইয়াছে। মা! চরণ দাও, ঐ ভবারাধ্য চরণদানে আমাদিগকে ধন্য কর। আমরা সকল জ্বালা সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইয়া জীবন শান্তিময় করি। মা! যদিও আমাদের কিছুই নাই, যদিও আমরা পার্থিব সকল বিষয় হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হইয়াছি তথাপি আমাদের পবিত্র হৃদয় ত এখন আছে, এখন ত আমাদের রসনা অবশ হয় নাই, এখন সে মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারে, তাই বলি মা! এস, কৈলাসের মণিমন্দির পরিত্যাগ করে একবার তোমার এই অকৃতি অধম ভক্তগণের হৃদয় মন্দিরে সমাসীন হও, আমাদের অন্ধকার অবসাদযুক্ত হৃদয়মন্দির তোমার যোগীজন নিসেবিত চরণস্পর্শে পবিত্র হউক, অন্ধকার তিরোহিত হউক, আমরা তোমার বাৎসল্য স্নেহের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া আপন হারা হই, আমার আমিত্ব ভুলিয়া তব তত্বে মিশিয়া যাই, মা! কে বলে আমাদের উপায় নাই, যখন আমরাই তোমার পায়, তখন আমাদের উপায়ও তোমার ঐ রাঙ্গাপায়, যে একবার তোমার ঐ চরণরেণুর অণু পায়, তাহার ত তৎক্ষণাৎ সকল অনুপায় ঘুচিয়া যায়, মা! মনে করি পদে পদে তোমার শ্রীপদে মতি স্থির করি, মনে করি আমার মন ভৃঙ্গকে তোমার ঐ পাদপদ্মের মধুপানে সতত নিয়োজিত করি, কিন্তু মা! সে ত কথা শুনে না, সেত বাধা মানে না। প্রমত্ত বারণসম আত্মহারা হইয়া বৃথা কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমার হইয়া আমার প্রতি সে ফিরিয়াও দেখে না, মা! ঐ দুর্ব্বার বারণসম মন-বারণের ভয়ে আমি কম্পিত বড় ভীত হইয়াছি। আর মা! আমার এই হৃদয় রণাঙ্গনে, করুণা কটাক্ষপাতে, অভয় অসিঘাতে আমার এ পশুপাশ বিমুক্ত কর, মহিষাসুরের ন্যায় আমার কেশ পাশ আকর্ষণ করিয়া তোমার দেবদুর্ল্লভ ক্রোড়ে টানিয়া লও, মা! তোমার স্নেহ পাশরূপ নাগপাশে আমাকে চিরতরে আবদ্ধ কর, আমি তোমারি বন্ধনে বাঁধা থাকিয়া তোমারই অভয় পদ মস্তকে ধারণ করিয়া, তোমারই ভুবন ভুলানরূপ দর্শন করিতে করিতে তোমারই স্বরূপে আত্ম বিসর্জ্জন দিই মা! আজ তোমার স্নেহের সন্তানগণ বড় আহ্লাদে, বড় আশায় হৃদয় বাঁধিয়া, বড় গৌরবে বক্ষ উন্নত করিয়া তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, মা! একবার আমাদের এই ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে তোমার ঐ দেবদুর্ল্লভ পদযুগল প্রদান কর, শান্তির সুধাধারা ঢালিয়া একবার এই চির তৃষিত প্রাণ সুশীতল কর, আমরা যেন তোমার নাম করিয়া তোমাতে মজিয়া এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম সফল করিতে পারি। মা! এতদিন বাঙ্গালী, বাঙ্গালী নামের অযোগ্য ছিল, এত

চেতনাহীন মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিল, এখন বাঙ্গালীর সে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে, বাঙ্গালী পুনরায় উদ্বোধিত হইয়া তোমার উদ্বোধন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা এত দিন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ছিল, আবার একত্র মিশিতে শিখিয়াছে, এতদিন পরে তাহারা একটা বিশিষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, স্বদেশের হিত আশে মন দিয়াছে, তাহাদের ভারত মাতার দুর্দ্দশার কথা স্মৃতি সমারূঢ় হইয়া মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতেছে, তাই তাহাদের বহুকাল ব্যাপি সুষুপ্তির ঘোর কাটিতেছে, তাহারা জাগরিত হইয়াছে, মা! এইবার তাহাদের মাতৃপূজার সময় আসিয়াছে, কেবল তুমি অপাঙ্গ দৃষ্টি করিলেই, তুমি আশীর্ব্বাদ করিলেই তোমার সন্তানগণের আশা ভরসার মূল সুদৃঢ় হয়, আমরা মায়ের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই। মা! অভীষ্ট ফলদাত্রী! আমাদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ কর, আমরা তোমার সেই আর্য্যবংশ প্রসূত সন্তান বলিয়া যেন জগতীতলে পুনরায় আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারি।

এস ভাই! শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ভক্তগণ! ঐ দেখ আমাদের ভবভয়হরা মা আসিতেছেন। শুধু মুখে প্রতিজ্ঞা করিলে হইবে না, মুখের কথায় শুধু কোন কাজ হইবে না, এস আজ জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহাতে তাঁহার কৃপায় আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী হয়, তাহার জন্য অভয়ার অভয় পদে প্রার্থনা করি। বরাভয় হস্ত দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য এস ভক্তিভরে, যুগ্মকরে, তারস্বরে বলি,—

শারদীয়া মিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে।
আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্প নিসূদনি॥
সংসারার্ণব দুষ্পারে সর্ব্বাসুখ বিনাশিনী।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে।"

ভাই! আজ আমরা ধন্য বরেণ্য সকল জাতির অগ্রগণ্য, আজ আমাদের 'চণ্ডীমন্দিরাবৃত মর্ত্ত্যধাম স্বর্গের বিমল বিভায় বিভাসিত, হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত; এস ভাই! হৃদয়ের কপাট খুলিয়া, মায়ের জগন্মোহিনীমূর্ত্তি তদুপরি স্থাপন করিয়া বলি,—

জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে।
ত্রৈলোক্যস্বামিনী স্তুহি ক্ষুৎপিপাসার্ত্তিনাশিনী
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মহেশ্বরি সদাশ্রয়ং॥

ভাই! এমন দিন আর হইবে না। পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ এ জীবনের ত স্থিরতা নাই? এই জন্য সময় থাকিতে ভবের সম্বল ভবভাবিনীর শ্রীপদকমল আশ্রয় কর, তাঁহার শরণাগত হইয়া বল,—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরী।
যৎপূজিতং ময়াদেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

সম্পাদক।

উন্মাদিনী।

(১)

বৈশাখ মাস, দিবসের অবসান সময়, প্রকৃতি হাস্যময়ী অস্তগামী সূর্য্যের ম্লানরশ্মি ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষশিরে সৌধ মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে।

গোপালনগর ও মহম্মদপুর এই দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী একখানি সুবৃহৎ প্রান্তর, প্রায় ক্রোশাধিক পরিমিত হইবে। প্রান্তরটী বৃক্ষ শূন্য গৃহ শূন্য কেবল চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, আজকাল এ প্রান্তরে লোক যাতায়াত অতি অল্প, প্রায় নাই বলিলেও হয়, কাল বৈশাখীর ভয়ে বৈকালে কেহ চলেনা, তবে যাঁহাদের না গেলে নয় ;তাঁহারাই কেবল এ পথে যাতায়াত করেন, কিন্তু আজ এই প্রান্তর মধ্যে শ্যামাদূর্ব্বা পরিশোভিত বাপীতীরে বসিয়া নিরানন্দময়ী একটী রমণীমুর্ত্তি, বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না, দেখিলে উন্নতবংশীয়া বলিয়া বোধ হয়, রমণীর কোলে একটী দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্র শিশু, দুই কি তিন মাসের হইবে, শিশুটী রোদন করিতেছে, কিন্তু শিশুটীর সে কাতর ক্রন্দন তাহার কর্ণরন্ধ্রে স্থান পায় নাই। রমণী সূর্য্যপানে চাহিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিল তাহার পর হিংসাদৃপ্ত নয়নে শিশুটীর মুখ পানে চাহিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিল "এখনও ইহাকে কোলে করিয়া বসিয়াছি, এইখানে ইহার ক্ষুদ্রদেহ সমাধি করিব, সংসারের জঞ্জাল গৃহের আবর্জ্জনা দূর করাই ভাল"। এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে কি বাহির করিয়া শিশুটীর ক্ষুদ্র মুখে ঢালিয়া দিয়া স্তনপান করাইতে লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশু শান্ত হইল, তৎপর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিশুটী যেন নিদ্রাঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া রমণী তীব্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বিষ ধরিয়াছে আর রক্ষা নাই, এ নিদ্রা ইহাকে মরণের পথে লইয়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটীর প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল, পিশাচী আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, কপোলদেশ সিক্ত করিয়া নয়ন প্রান্ত হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, পরে মৃত সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল, আমার গর্ভের সন্তান তুই, তবুও তোর প্রতি যেরূপ পুত্র স্নেহ প্রদর্শন করিলাম, জগতে বায়ুভূকই তাহার একমাত্র আদর্শ দেদীপ্যমান, তোর জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে, হৃদয় আকুল হইতেছে, কিন্তু কি করিব বৎস, জনসমাজে তোর স্থান নাই দেখিয়া বিদায় দিতেছি। যাও বৎস! এই পাপ তাপ প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া, সেই জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনন্ত শান্তিরাজ্যে গিয়া কিছুদিন আমার জন্য অপেক্ষা করিও, আমি আমার কর্ত্তব্য

কর্ম্ম সমাপন করিয়া তোর সহিত সাক্ষাৎ করিব, এখন আমার বুকে প্রতিহিংসার ভীষণ আগুণ জলিতেছে, এ আগুণে আর এক-টীকে আহুতি দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিব, "আর কেন এইবার যাই" বলিয়া রাক্ষসী উঠিল। মৃত শিশুটীকে সেইখানে রাখিয়া গোপাল নগরের দিকে অগ্রসর হইলে।

সূর্য্যদেব আর এ রাক্ষসী-লীলা দেখিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে সংসারকে অন্ধকার গর্ভে নিমগ্ন করিয়া পশ্চিমাকাশ কোলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(২)

সুলতানপুর একটী গণ্ড গ্রাম। ইহার মধ্যে একটী ছোট খাটো বাজার আছে, প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবারে হাট বসে। আজ বাজারের দিন, বিস্তর লোকের সমাগম হই-য়াছে, ঐ বাজারের সদর রাস্তার একপার্শ্বে একখানি সুন্দর খড়োঘরের অলিন্দে, বসিয়া একটী উন্মাদিনী ধূলা কাদা মাখিতেছে, উন্মাদিনীর মাথায় রুক্ষকেশ, পরিধান এক-খানি শতগ্রন্থি মলিন বাস, অতি কষ্টেও গাত্র বেষ্টন সঙ্কুলান হয় না। উন্মাদিনী বলিতেছে "আর কতকাল খুঁজিব, কতকাল বুকের আগুণে জলিয়া পুড়িয়া মরিব, এইত কতদিন কত মাস অতিবাহিত হইয়াছে, ক্রমে দুইটী বৎসরও অতীত সময় গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তবু তাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না, বুকের আগুণও নিবাইতে পারিলাম না, তবে কি এই ভাবে জীবন কাটিবে, আশা অপূর্ণ থাকিবে, না নিশ্চয়ই সবগুলা পূর্ণ করিব, আজীবন ধরিয়া সমগ্র সংসার খুঁজিব, যদি না পাই, মৃত্যুর অভ্রভেদী সিংহদ্বার পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনিব, তাহার পর তাহাকে লইয়া আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিব"। কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া উন্মা-দিনীর কথা শুনিতেছিল, এমন সময়ে একটী ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। উন্মাদিনী সহসা তাঁহাকে জড়া-ইয়া ধরিয়া বলিল—"শিকার মিলিয়াছে, ইহার জন্ম আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সয়তান! আমার অমূল্য জিনিষ লইয়া আমায় ফাঁকি?" ভদ্রলোকটী দীরস্বরে উত্তর করিল, "কে তোর কি অমূল্য জিনিষ লইয়া ফাঁকি দিয়াছে।"

এ কথায় উন্মাদিনী হো হো করিয়া উঠিল, এ হাসি যেন তাহার প্রত্যেক ধমনীর ভিতর কি এক তীব্র মদিরাস্রোত ছুটাইয়া দিল, বলিল "নূতন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সব ভুলিয়াছ, মনে কর আমাদের সেই গ্রামের কথা, তাহার পর কলিকাতার কথা, ভদ্র-লোকটী উন্মাদিনীকে আর একটী মাত্র কথা বলিবার অবসর দিলেন না, আরক্ত-নয়নে একবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া সবলে এক পদাঘাত করিলেন, উন্মাদিনী পড়াইয়া

পড়িল, ভদ্রলোকটী সেদিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী একখানি গ্রামে হরমোহন চক্রবর্ত্তীর বাস, ইহাঁর অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল কিম্বা দৈন্তভাবাপন্ন ছিলনা, মোটামুটি ভাবে দিন চলিয়া যাইত, তাঁহার মোহিনী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্তা ছিল, মোহিনীর বয়স যখন নয় বৎসর, সেই সময়ে হরমোহন অর্থ প্রত্যাশায় কন্তাকে একটী জরাজীর্ণ পলিতকেশ স্থবিরের করে সম্প্রদান করেন। স্বার্থপর সংসারে সকলেই স্বার্থের জন্ত লালায়িত, তাহার উপর আবার পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে সুন্দরী কন্যার বাজার কিছু চড়া হইয়াছে, তাই তিনি আড়াই শত রৌপ্য মুদ্রা বিনিময়ে সংসারানভিজ্ঞ দুহিতাকে একটী অশীতিপর বৃদ্ধের করে সমর্পণ করেন, অকৃতজ্ঞ স্বার্থান্ধ হরমোহন কন্তার ভাবী অবস্থারদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইলেন না। হায়! সংসারে এরূপ কয়জন দেখেন?

এই বিবাহের পর মোহিনীর বৃদ্ধ স্বামী যখন সংসারের নিকট হইতে অনন্ত দিনের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন মোহিনীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র।

মোহিনীর হাতের শাঁখা খসিলে সীমন্তের সিন্দুর মুছিল, মোহিনী বিধবা সাজিলে, মোহিনীর হাসি গেল, কান্না আসিল, শান্তি ঘুচিল অশান্তি আসিয়া হৃদয় ছাইল, আনন্দ গেল, নিরানন্দ আসিয়া বসিল।

মা, কন্তার মলিনবেশ দেখিতে না পারিয়া যখন মোহিনীকে জোর করিয়া দুই একখানি অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন, রুক্ষকেশগুলি তৈলসিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতেন, তখন মোহিনী বলিত কাহার জন্ত বেশভূষা, কাহার জন্ত সৌন্দর্য্যের আয়োজন মা, ইহা মায়ের মর্ম্মকোষের উপর কিরূপ আঘাত করিত তাহা জননী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, যাহা হউক মোহিনী শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়া নীরবে আপনার সুদীর্ঘ নীরস দিন গুলা অতিবাহিত করিতে লাগিল।

বর্ষা যায়, শরৎ আইসে, প্রকৃতি অভিনব সৌন্দর্য্যে ভূষিতা হয়; মেঘমুক্ত নির্ম্মলাকাশে চাঁদ হাসিয়া উঠে, তাহার কিরণে জগৎ মুগ্ধ হয়, মোহিনীর বাল্য জীবন কাটিল, যৌবন আসিয়া দেহরাজ্যে একাধিপত্য করিয়া বসিল, মনের অশান্তি তিরোহিত হইল, বালিকা এ হাসিতে অন্ত কেহ সুখী হইল কি না বলিতে পারিনা, কিন্তু পিতামাতার দগ্ধ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া কেমন একটী গভীর নীরব নিশ্বাস বহিয়া গেল।

ইহার পর আরও দুইটী বৎসর মানুষের অজস্র হাসি কান্না সঙ্গে লইয়া অতীতের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, মোহিনীর অবস্থাও

ফিরিয়া গেল। মোহিনীর আর সে মলিন ভাব নাই, তাহার মতিগতি এখন স্বতন্ত্র পথে গিয়াছে, সে এখন চওড়া কালাপেড়ে কাপড় পরে, প্রত্যেক দিন চুল বাঁধে, দেহের প্রতি সমধিক যত্ন করে, নূতন নূতন অলঙ্কারে আপন শরীর অলঙ্কৃত করে, আর ঘন ঘন তাম্বুল রাগে ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করে।

মোহিনী তখন ষোড়শী, ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ন্যায় তাহার কোমল অঙ্গে রূপের তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতে লাগিল, ভাগ্য বিধাতা উপেন্দ্রকে সেই তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, উপেন্দ্র ভাসিয়া গেল

মোহিনীর এত উন্নতি, এ উন্নতির পথ প্রদর্শক কে উপেন্দ্র ? উপেন্দ্র জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ সন্তান, পূর্ব্ব হ তে মোহিনীর উপর উপেন্দ্রর তীব্র দৃষ্টি পড়িয়া ছিল, সেই জন্য মোহিনীকে নানাপ্রলোভন দেখাইত, কখনও মোহিনীকে হীরক খচিত স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ বাক্স খুলিয়া অযত্নে ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকিত, কখন বা সেগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে আপন শয্যার উপর ফেলিয়া রাখিত তাহা দেখিয়া মোহিনী মনে করিত বড়লোকদের বুঝি এইরূপ পড়িয়া থাকে, উপেন্দ্র তাহারই দুই একখানি অলঙ্কার লইয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিত, ইহা ভিন্ন যে অর্থ প্রদান না করিত এমন নহে,মোহিনী সহজে লইত না, ক্রমে ইহার যেন কি একটা সম্মোহিনী শক্তি তাহার ক্ষীণ মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিল, তাহা লইতে আর কোন আপত্তি করিত না, গতিক ভাল দেখিয়া উপেন্দ্র কল্পনা তুলিতে কত ভবিষ্যৎ মনোরম সুখের চিত্র আঁকিয়া মোহিনীর নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া ধরিত, সে দৃশ্যে ধৈর্য্যের বাঁধ একবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

মোহিনী আর আত্মসংযম করিয়া চলিতে পারিল না, অল্পকাল মধ্যেই কলঙ্কিনী পাপ সলিলে গা ভাসাইয়া দিল। প্রথমতঃ অতি গোপনে অতি নির্জ্জনে তাহাদের প্রেমাভিনয় চলিতে লাগিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু ধর্ম্মের কল আপনি বাজিয়া উঠিল, প্রথমে পিতামাতা তাহার পর প্রতিবেশী এইরূপে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, এমন কি বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, যুবক যুবতীরা এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়ায়, বালক বালিকারা টিপ্পনী গাহিতে থাকে, সুতরাং লোকের নিকট মুখ দেখান ভার হইল, পিতামাতা তাহাদিগকে কত তিরস্কার কত লাঞ্ছনা করিল,তবুও তাহাদের কোন চৈতন্য হইল না, বরং দিন দিন প্রেমের-বাঁধন-প্রীতির শৃঙ্খল দৃঢ়তর হইতে লাগিল, পরিশেষে যখন তাহাদের ঘরের বাহির হওয়া দায় হইল, তখন তাহারা একদিন রজনীযোগে যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

কলিকাতা সহর, সেখানে কে কাহার তত্ত্ব রাখে তাহারা এই জনাকীর্ণ সহরে মনোমত একখানি বাটীভাড়া লইয়া একটী ক্ষুদ্র সংসার পাতাইয়া বসিল, কিছুরই অভাব হইল না, সব মিলিল, আর কেহ তাহাদের প্রেমের কণ্টক হইল না, নিরাপদে দিন কাটিতে লাগিল।

কলঙ্কিনী উপেন্দ্রকে বড় আদরে রাখিয়াছিল, তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত, দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, সে তাহার সুখের জন্য আত্ম জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

এ সুখ তাহাদের অধিককাল স্থায়ী হইল না, পৃথিবীর বার্ষিক গতি একবার ঘুরিয়া আসিতে না আসিতেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল, কিন্তু যৌবনের আশা অপূর্ণ থাকিল, মোহিনী অর্থের জন্য উপেন্দ্রর উপর দাবী লইত না, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া খরচ যোগাইতে লাগিল। উপেন্দ্র মোহিনীর ঐকান্তিক যত্ন ও বুকভরা প্রেমে জীবনের কয়েকটা মঙ্গল মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিতে ছিল, কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপাসক, ইন্দ্রিয়ের দাস, উপেন্দ্র আর একের প্রণয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিল না, সেই প্রেমের সেই প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইয়া গেল।

মোহিনীর সব ফুরাইল, জীবনের শেষ আশা ভরসা সব ফুরাইল, আশা মুকুলিত মানসোদ্যান উষরক্ষেত্রে পরিণত হইল, কল্পনার সুদৃশ্য সৌধমালা নিরাশার এক ফুৎকারে চুরমার হইয়া গেল।

বিপদের উপর বিপদ ঘটিল, দিনে দিনে মোহিনীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

উপেন্দ্র গিয়াছে, সেই সঙ্গে অলঙ্কারের বাক্স অন্তর্হিত হইয়াছে, উপেন্দ্র মোহিনীকে যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিল, তাহা আর নাই। কি প্রকারে আহার যোগাইবে তাহার উপর বাটী ভাড়ার জন্য ঘন ঘন তাগিদা করিতেছে, কি করে কোথায় যায়, কূলে ফিরিবার পন্থা নাই, উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায় ও লম্পটের কুহকে ভুলিয়া, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া সকলের নিকট হইতে বাহির হইয়াছে, আর কোন মুখে কূলে ফিরিবে, যাহা হউক অঙ্গে যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া অনুতাপাশ্রুনীরে অভিষিক্ত শীর্ণ দেহখানি লইয়া অতি কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল।

যথা সময়ে একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল শিশুটী দুইমাসের হইলে কলঙ্কিনী কলিকাতা সহর ছাড়িয়া গোপালনগর ও মহম্মদপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরে যে কাণ্ড করিয়াছিল তাহা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর সুলতানপুর বাজারে যে উন্মাদিনীর কথা বলা হইয়াছে, এ সেই মোহিনী এবং যে ভদ্রলোকটী উন্মাদিনীকে পদাঘাত করিয়াছিল এ সেই উপেন্দ্র, উপেন্দ্র চিনিতে পারিয়া

স্থানকাল পাত্রভেদে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া ছিল।

(৪)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদা গভীরা যামিনীতে পরিদৃষ্ট হইল সুলতানপুর বাজারের সেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সকলে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে, আর সেই উন্মাদিনী রমণী নাচিয়া বিকট হাস্যে বলিতেছে "হো হো প্রতিহিংসার আগুণ কখনই নিভিবে না, আমি স্বহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছি এবং এই সঙ্গে একটাকেও আহুতি দিয়াছি, এতদিনে আমার জীবনের ব্রত উদযাপিত হইল, আর কেন, এইবার যাই," উন্মাদিনী আর সেখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল না, আনন্দে হাত-তালি দিয়া দ্রুতবেগে গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

তাহার পর সকলে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেখিল ঘরের ভিতর উপেন্দ্রের জীবন শূন্য অর্দ্ধ-দগ্ধ বিকৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে পরিদৃষ্ট হইল প্রকাশ্য রাজপথ পার্শ্বে একটা বৃক্ষশাখায় উন্মাদিনীর মৃতদেহ ঝুলিতেছে, উন্মাদিনী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ করিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রমোহন দাস।

সম্রাট হুমায়ন।

(৩)

অচিরেই সম্রাট নিরাপদে আগরা-প্রাসাদে উপনীত হইলেন, যুবরাজ হিন্দোলও অনুচর সহ সমর-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। ইহারা সকলেই খেলাত প্রাপ্তে সম্মানিত হন। এই উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হয় এবং মহা সমারোহে যুবরাজ হিন্দোলের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যুবরাজ আস্কেরিও তাঁহার সৎ স্বভাবের নিমিত্ত সম্বল জেলা প্রাপ্ত হন এবং তথা হইতে সমস্ত বিদ্রোহী-দিগকে বহিস্কৃত করিয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হন। এই সময় হুমায়ন সংবাদ পান যে শের খাঁ আফগান বেহারের ঝারখণ্ড জেলা নিজে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং প্রবঞ্চনা করিয়া রোটাসের * শক্তিশালী দুর্গ অবরোধ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন, খুব সম্ভব অচিরেই তিনি উক্ত নগর অধিকার করিবেন।

এতৎ সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—"এই আফগানের অবাধ্যতা সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। এখন আমরা যাইয়া

* See History of Bengal, Page 139.

উঁহাদের হস্ত হইতে চুণার লইয়ে।" তৎপর সম্রাট ঐ দুর্গ আক্রমণ সম্বন্ধেই ইঞ্জিনিয়ার রুমী খাঁর (সোলতান বাহাদুর কর্তৃক পরিত্যক্ত) পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে রুমী বলিলেন,—"ভগবান অনুগ্রহ করিলে আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারিব।"

মোগল-সৈন্য আগরা হইতে যাত্রা করিয়া ৯৪৫ হিজরীর (১৫৩৮ খৃঃ অঃ) বেবেরাত দিনে চুণারের দশ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে রুমী খাঁ বিপক্ষদিগের শক্তি ও সৈন্য সংখ্যা দুর্গের কোন্ অংশ আক্রমণ ও কোথায় কামান পাঁতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় জানার অভিপ্রায়ে তাঁহার ফেলাফত নামক নিগ্রো ক্রীতদাসকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, প্রত্যেক বেতের দাগ তাহার শরীরে সুস্পষ্টরূপে ফুলিয়া উঠে। অতঃপর তিনি তাহাকে বিপক্ষ শিবিরে পাঠাইয়া বলিতে বলিয়া দিলেন যে, সে শের খাঁকে যাইয়া বলিবে, সে রুমী খাঁর দাস। তাহার প্রভু বিনা দোষে নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করায় সে তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া এখানে কাজ করিতে আসিয়াছে। এই ভাবে যদি সে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তবে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইবে।

ফেলাফত এই আজ্ঞানুসারে আফগান শিবিরে যাইয়া নিজের অবস্থা বর্ণন করিলে, আফগানরা তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া দুর্গে লইয়া যায় এবং তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয়। ফেলাফত তথায় ব্যক্ত করে যে, সে ইঞ্জিনিয়ারীং কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। যদি তাহারা অনুমতি করে তবে সে দেখাইয়া দিতে পারে, কোন্ স্থানে কামান পাতিলে শত্রুদগকে সহজে অপদস্থ করা যাইতে পারে এবং রুমী খাঁর আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত দুর্গের কোন্ স্থান কি ভাবে সুরক্ষিত করা আবশ্যক তাহাও সে বলিয়া দিবে।

তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাহাকে দুর্গ পরীক্ষা করিতে আদেশ করা হয়। * দুই একদিন পরে ফেলাফত রজনী যোগে পলায়ন করিয়া আসিয়া তাহার প্রভুর নিকট বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিল যে, নদীর তীরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তথা হইতে দুর্গ আক্রমণ করা উচিত এবং তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান এইভাবে বেষ্টন করিতে হইবে যে বাহিরের সহিত তাহারা কোনও সংস্রব রাখিতে না পারে।

---

* ষ্টুয়ার্ট বলেন,—"In the year 1763 the English attempted to take Chunar by storm, but were repulsed; it afterwards capitulated." See Edinbrugh Gazatter,

এই প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রাপ্তে রুমী খাঁ নদীর তীরে বৃহৎ কামানগুলি সাজাইয়া দুর্গের চারিধারে বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে বিভিন্ন বিভিন্ন সেনাদল রক্ষা করিলেন।

এই সময় মহাম্মদ সোলতান ও অপরাপর বিদ্রোহী সর্দারগণ আসিয়া সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ দলে প্রবেশ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করিল। সম্রাট তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন।

রুমী খাঁ দেখিলেন নদীর তীরে এখন উপযুক্ত স্থান নাই যেখান হইতে কামান দাগিয়া দুর্গের ভিতরের কোনও অনিষ্ট সাধন করা যাইতে পারে। তজ্জন্য নদীর উপর কাঠের মঞ্চ করিয়া কামান পতিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাই করিতে সম্রাট আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি তিনখানি নৌকা একত্র করতঃ তদুপরি একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করিলেন। এইভাবে প্রস্তুত হইতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। পরে ঐ ভাসমান মঞ্চ রজনী যোগে আফগান শিবিরের নিকট আনিয়া, দুর্গ আক্রমণের আদেশ বিঘোষিত হইল। কিন্তু বিপক্ষগণ এমনিভাবে বহির্ভাগ রক্ষা করিয়াছিল যে এই আক্রমণে তাহাদের কোন অনিষ্টই হইল না। সম্রাটের ভাসমান ব্যাটারি বিধ্বস্ত হইল এবং সাত শত মোগল-সৈন্য দুর্গের একটুমাত্র অনিষ্ট করিয়াই মহানিদ্রায় অভিভূত হইল।

পরদিবস ভাসমান ব্যাটারি মেরামতের নিমিত্ত মিস্ত্রি নিযুক্ত হইল। অবরুদ্ধকারীগণ দেখিল যে, সম্রাট দুর্গ অধিকার করিতে একান্তই মনস্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের সাহায্য প্রাপ্তির পথও নাই। কাজেই তাহারা জীবনের অনিষ্ট হইবে না এই সর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিতে সম্মত হইল।

এইভাবে দুর্গ অধিকৃত হইলে, রুমী খাঁ বন্দীগণের মধ্য হইতে তিনশত যোদ্ধা বাছিয়া তাহাদের হস্ত কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। সম্রাট এই আদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন যে, তাহারা জীবন নষ্ট হইবে না এই আশ্বাস পাইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছে এখন এইভাবে তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করা অতি অবৈধ ও ঘৃণিত কার্য্য।

এই প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়া সম্রাট একটী বৃহৎ খানার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে প্রচুর আমোদ প্রমোদ ও বিলাস-সাগরের ফুয়ারা ছুটে। কর্ম্মচারীগণের পদোন্নতি ও সর্দ্দারগণ খেলাত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর সম্রাট রুমী খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি ভাবে এই দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে এবং কাহার উপরই বা সেই ভার অর্পণ করা যায়। রুমী বলিলেন যে, বেগ মীরেক ব্যতীত দলের অন্য কোনও ব্যক্তির

উপর এ কার্য্যের ভারার্পণ করা যাইতে পারে না। তদনুসারে সম্রাট মীরেককে দুর্গাধিপতি স্বরূপ নিযুক্ত করেন। কিন্তু অন্যান্য সর্দ্দারগণ রুমী খাঁর এই বিদ্রূপ ভাবের উপদেশ দানের জন্য এমনি অসন্তুষ্ট হন যে, অচিরেই রুমীর খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহার জাগতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

বন্দে মাতরম্।

জানি না—কি শুভক্ষণে কবি "বন্দে মাতরম্" এই ভীম ভাবপূর্ণ স্বদেশী সঙ্গীতটী রচনা করিয়া আপন পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। আজি ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রাণের সুরে মিলিত হইয়া উচ্চরবে নিনাদিত হইতেছে; এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে ইহা পুনরায় বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠে ভৈরবী রাগিণীতে সঙ্গীত হইতেছে। আজি এই সঙ্গীতের সম্মোহন স্বরে বাঙ্গালী উদ্‌বোধিত হইয়া পুনরায় স্বদেশ হিত কল্পে মনোনিবেশ করিতেছে। চিরবিজিত পর পদানত বাঙ্গালীর বুঝি মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, এতদিন পরে বুঝি তাহাদের সুষুপ্তির ঘোর কাটিল, বুঝি তাহারা পুনরায় মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া কাঙ্গালিনী মায়ের দুঃখ মোচনে বদ্ধপরিকর হইল! তাই আজ চারিদিকে নির্জ্জীব বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠ হইতে গগনভেদী স্বরে "বন্দে মাতরম্" শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। দুর্ম্মতি-সম্পন্ন হিন্দুজাতির মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহারা নিজের দুঃখ নিজের দুর্গতির কারণ এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ কোটী কোটী কাতর কণ্ঠে মাতৃ পূজার সেই প্রাণ মাতান "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের ভীমরব শুনা যাইতেছে।

বিদেশীয় বণিকগণ আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে ক্রমশঃ অন্তঃসার শূন্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অব্যবহার্য্য, অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে যে মহামূল্য রত্ন সকল লইয়া যাইতেছেন, আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া যে আপনার গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছেন, এতদিন পরে এ দেশীয়গণ তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই আজ চিরবিজিত বাঙ্গালীর মোহ নিদ্রা ঘুচিয়াছে, তাই তাহারা মাতৃ সেবার মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উন্নতির প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি বলিয়াই গণনীয় নহে, তাহাদের কোনই ক্ষমতা নাই, খবৃত্তি করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে—তাই তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভারতের রাজ প্রতিনিধি কর্জ্জন বাহাদুর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের

উন্নতির পথে কণ্টকপ্রদান করিতেছেন। মায়ের ৮ কোটী সন্তান একত্র থাকিলে পাছে ভবিষ্যতে কোনরূপ অশান্তি উপদ্রব উপস্থিত হয়, এই জন্য বড় লাট আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিলেন। যাহাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট সহানুভূতি না পাই যাহাতে এই ৮ কোটী সন্তান পরস্পর ভাই ভাই বলিয়া চিনিতে না পারে, যাহাতে কতকগুলির সহিত কতকগুলির সংস্রব না থাকে, কর্জ্জন বাহাদুর সেই সঙ্কল্প করিয়া আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। আজীবন আমরা যে জননী জন্মভূমির শান্তিময় সুশীতল ক্রোড়ে চিরসুখে লালিত পালিত হইতেছিলাম, যাঁহার সুবিস্তৃত শস্য শ্যামল অঙ্কে এতদিন আমরা একত্রে সুখে বিচরণ করিয়া আসিতেছিলাম। হায়! আজি রাজ প্রতিনিধির বিধি বিধানে সেই মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি সন্তান স্থানান্তরে গেল। এত কাতর ক্রন্দন এত অনুনয় বিনয় সমস্তই বৃথা হইল—কিছুতেই বড়লাটের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। দরিদ্র প্রজাবর্গের ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া কর্জ্জন বাহাদুর বঙ্গদেবকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতে যে তাঁহার কি ইষ্ট সিদ্ধি হইল—তাহা তিনিই জানেন।

জানিনা—কি কুক্ষণে তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, জানিনা—কি কুক্ষণে তিনি ভারতবাসীর ভাগ্যে বিধাতারূপে এদেশে আসিয়া তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা, সমস্ত সাধন সিদ্ধির পথ অবরোধ করিলেন, সোণার বাঙ্গালা দেশটাকে কাটিয়া খান খান করিলেন, সোণার ভারত আজ ছারখার হইল। দেশের দুরবস্থারূপ মহাশেল আজ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিষম বাজিয়াছে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদে আজ তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—রাজা যতই কেন আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিবার চেষ্টা করুন, যতই কেন তাঁহারা আমাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হউন। আমরা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই না। রাজা প্রজার রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া এতদিন আমরা আমাদের সমস্ত বিষয় রাজার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম তাহার কোনও কথার বাদ প্রতিবাদ করিতে নিরীহ বাঙ্গালী আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু এখন হইতে আমরা নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা স্বদেশ ও স্বজাতির রক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। এই প্রতিজ্ঞার ফল "স্বদেশী আন্দোলন" স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারই এই আন্দোলনের মূল মন্ত্র, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কার্য্য করিলে অল্পদিনের মধ্যেই আমরা একটী "জাতি" গঠন করিতে পারিব, শীঘ্র আমরা আবার

পূর্ব্ব আর্য্যগৌরব লাভ করিয়া ধন্ত হইব।

এতদিন বাঙ্গালীজাতি একটা জাতি বলিয়াই বিবেচিত হইত না—কারণ তাহাদের মধ্যে "জাতীয়তা" আদৌ ছিল না; তাহারা স্বদেশবাসীকে আপন সহোদর বলিয়া মানিত না। আজ তাহারা একপ্রাণে একমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত স্বদেশ প্রীতি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে; স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতেই অবগত হওয়া যায়—বাঙ্গালীজাতি নিজের গন্তব্য পথ ভ্রষ্ট না হইয়া কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই তাহাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাহাদের বলগৌরবে দেশ বিদেশ পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহাদের সুখের পথ উন্মুক্ত থাকিবে। জাতীয় উদ্বোধনের—জাতি সংগঠনের ইহাই প্রকৃত সময়। তাই ভারতবাসি! পারিবে কি? অটল অচলভাবে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে জীবন উৎসর্গ করিবে কি? আমরা কি স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইব, পুনরায় কি আমরা সকলের নিকট আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারিব! যে জাতি চিরকাল জীবনহীন শবপ্রায়, যে জাতি শক্তি—সামর্থ্য বিহীন, যাহারা চিরকাল সকলের নিকট লাঞ্ছিত—অপমানিত, ঘৃণিত সেই অধম জাতির কি পুনরুদয় হইবে? সেই অনাদৃত বঙ্গীয় জাতীয়ত্বের ক্ষীণ প্রাণ বায়ুর মৃদুসঞ্চারেই কি তাহার পুনর্জীবনলাভ হইবে? এমন দিন কি হইবে যে অধম বঙ্গজাতির সৌভাগ্যগগনে পুনরায় সুখ সূর্য্যের উদয় হইবে? ভগবান কি এমন দিন দিবেন—আমাদের দুর্ম্মতির কি এমন শুভ পরিবর্ত্তন করিয়া সুমতি প্রদান করিবেন? আমরা পুনরায় কি আমাদের ঘোর অভাব বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারার্থে যত্নবান হইব? পুনরায় কি আমরা প্রাণ খুলিয়া গাহিতে পারিব—'বন্দে মাতরম্'

হিন্দু চিরকালই রাজভক্ত; রাজভক্তি তাহাদের হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে অঙ্কিত, রাজাকে তাহারা দেবতা বলিয়া জানে। পিতা যেমন পুত্রের রক্ষাকর্ত্তা, রাজা সেইরূপ প্রজাবর্গের রক্ষাকর্ত্তা, পুত্র নির্বিশেষে প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম। পুত্রগণের কোন কষ্ট হইলে, তাহারা কাতরকণ্ঠে কোনও বিষয়ের জন্ম আবেদন করিলে—পিতা যেমন তাহাদের অভাব বুঝিয়া—তাহাদের কাতরক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া থাকেন। রাজারও সেইরূপ প্রজাগণের কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে আমরা রাজার নিকট সকলে মিলিয়া কাতর প্রাণে কত আবেদন করিলাম। তাহার প্রতিরোধার্থে কত সভাসমিতি করিলাম, রাজা কিছুতেই

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বঙ্গদেশের ব্যবচ্ছেদ কার্য্য অকাতরে সমাধা করিলেন, প্রজাবর্গের মলিন বদনের প্রতি একবার ফিরিয়া ও দেখিলেন না। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—তাহা অবাধে সমাধা করিলে, কোন বাধাই মানিলেন না।

এই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে বড়লাট আমাদের একটী মহাশুভ কার্য্যের সূচনা করিয়া দিলেন, প্রকারান্তরে আমাদিগকে আমাদের বহুদিন বিস্মৃত, পূর্ব্বগৌরবের কথা হিন্দুজাতির মনমধ্যে জাগরিত করিয়া দিলেন, আমরা কি ছিলাম আর এখন কি হইয়াছি, প্রকারান্তরে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য কর্জ্জন বাহাদুর বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। এই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে আমরা আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি; নিজের জননী জন্মভূমির বিষয় এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের উপকারিতার বিষয় আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; তাই আমাদের মোহ ঘুচিয়াছে; আমরা নিজের দুর্দ্দশার কারণ, সকলের নিকট হিন্দুজাতির অধ্যাগতির কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। কেন যে সকলের নিকট এত ঘৃণিত হইতেছি, তাহার কারণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া আজ তাহার প্রতিবিধানে আমরা স্বদেশের স্বজাতির এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার করে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছি।

যেরূপ সুবাতাস বহিয়াছে, চারিদিকে যেরূপ স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন চলিতেছে। বোধ হয় আমাদের দেশ অচিরেই আবার শান্তি রাজ্য হইবে, অচিরেই আমরা ঘোর অভাবের হস্ত হইতে দারিদ্র্যের দারুণ দাবানল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, আমাদের কাঙ্গালিনী মাকে আবার রাজরাণীর বেশে সুসজ্জিত করিয়া তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। তাই ভারতবাসি! তোমাদের শাপে বর হইল। রাজার সহিত মনোমালিন্য করিবার আবশ্যক নাই; যে পন্থা ধরিয়াছ, এক্ষণে যাহাকে গন্তব্য পথ বলিয়া অগ্রসর হইতেছ। ইহার অনুসরণ করিতে পারিলে দেখিবে—অচিরেই তোমাদের এই সৎ পন্থা অবলম্বনের ফল তোমাদিগকে সুখের রাজ্য দেখাইয়া দিবে, তোমাদের চিরশান্তির উজ্জ্বল পথ তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিবে। রাজা তোমাদের কথা শুনিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে তোমাদের নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছে কিন্তু একবার ভাব দেখি ইহার ভবিষ্যৎ কি সুখকর হইবে। বড়লাট আমাদের পৃথক করিতে গিয়া আমাদিগকে আরও দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট করাইয়া দিলেন—আমরা পুনরায় স্বদেশ ও স্বজাতির আদর করিতে শিখিলাম। ভাই! আমরা বিদেশীয় দ্রব্য কেন ব্যবহার করিব। আমাদের যাহা আছে, তাহা আর

কাহার আছে? পৃথিবীর কোন জাতির আছে, একবার তাব দেখি। ভাই! বিলাতী দ্রব্যে আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্যের অনাদর করতঃ, বিদেশীয় দ্রব্য আবশ্যক না হইলেও কেবল বিলাসিতার জন্য তাহা ক্রয় করিতেছি; দেশের টাকা বিদেশে পাঠাইতেছি। অশন বসন-অর্থ-সামর্থ্য যাহা আমাদের ছিল—তাহা জগতে আর কাহারও ছিল কি? ভাই! মোহ ত্যাগ কর—একবার চক্ষু মিলিয়া দেখ, তোমার দেশের অবস্থা তোমার দেশীয় ভ্রাতাগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে; দেখিয়া সকলে শপথ কর—আর বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না। শুধু প্রতিজ্ঞা করিলে হইবে না, সভা সমিতি করিলে হইবে না, কার্য্যতঃ দেখানই প্রতিজ্ঞা রক্ষার মূল। তবে সভা যে করিতে হইবে না—তাহা নহে, সভা না হইলে সকলে একত্র সমবেত না হইলে কেমন করিয়া সকলে এক মত হইবেন। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজে কার্য্য করা এবং ক্ষমতানুসারে দুই একজনকে কাজ করান স্বদেশ হিতৈষীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিশেষ ধীর ও স্থিরভাবে সভা সমিতি করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে হইবে—তাহার সহিত কার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। বক্তৃতা উপদেশ ভিন্ন এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না, শবরূপ ব্রহ্মবাণ না হইলে এ লক্ষ্য ভেদ হইবে না। ভাই! যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; স্বদেশের জন্য যাহার অনুগমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে; আইস—হৃদয়ের প্রভূত শক্তির সহিত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে চেষ্টা করি। শক্তি ভিন্ন কোনও কার্য্যই হইবে না, কারণ শক্তিই জগতের এবং জাগতিক জীবের অবলম্বন। যে শক্তি প্রভাবে মরুভূমিতে মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়, যে শক্তি প্রভাবে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, যাহার কৃপায় পঙ্গু দুরারোহ গিরি উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হয়; যাহার কৃপায় জনশূন্য কান্তারে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়; যাহার কৃপাবলে মানব সুকঠিন কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, যাহার কৃপাবলে হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, এস—আমরা সেই মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়া হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চয় করি। যাহার প্রভাবে আমরা আমাদের প্রতীজ্ঞা অচল অটল রাখিতে পারিব। এস—আমরা এই আন্দোলনের মূল শক্তি সেই মহাশক্তির শক্তিতে শক্তিমন্ত হই। তাহা হইলে আমরা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিব, প্রতিজ্ঞা স্থির থাকিবে। হৃদয়ে নব আশার সঞ্চার হইবে। যেখানে আশা সেই খানেই উৎসাহ; যেখানে শক্তি সেইখানেই সাহস, যেখানে অভাব সেইখানেই উদ্যোগ। আজ আমরা ঘোর অভাবে পতিত হইয়া এস সেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া দেশের ও

দেশের অভাব মোচনে দৃঢ়ব্রত হই। শুধু বাদ প্রতিবাদ করিলে চলিবে না; শুধু কথায় কাজ হইবে না। কার্য্য করিতে হইবে, কার্য্য না করিলে উন্নতি কোথায়? ভাই! এখন আর কিছুই নাই; নিশ্চেষ্ট ভারতে আজ সকলেই নিদ্রিত, ঘুমে অচেতন। এখন এই আদর্শ ভারতে সকলই অভাব; আমাদের এই সাধুজন নিষেবিত রত্নময় ভারত আজ অভাবময়, এই ঘোর অভাবে পতিত হইয়া এতদিন পরে আমাদের চৈতন্য হইয়াছে। অতএব ভাই! আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না, মায়ের দুর্দ্দশা মোচনে যত্নবান হও, দেখ, তোমাদের সোণার সংসার আজ ঘোর দারিদ্র্যের ঘোর অর্থ-কৃচ্ছ্রতার আবাসভূমি হইয়াছে। আর কি নিদ্রিত থাকা উচিত? এখন কার্য্যের সময় হইয়াছে—সকলে মিলিয়া সকলে একত্র সমবেত হইয়া কার্য্যের জন্য তোমাদের জীবন উৎসর্গ কর। "বন্দে মাতরম্" এই মহামন্ত্র হৃদয়ে জপমালা করিয়া মহাশক্তির শরণাপন্ন হইয়া নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তোমাদের মঙ্গল হইবে। দেশের দুর্গতি দূরে পলাইবে, সকলে ধন্য হইবে।

সম্পাদক।

স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে মর্ম্মাহত হইয়া বাঙ্গালার অধিবাসীবর্গ বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে এই প্রতিজ্ঞা-স্ফুলিঙ্গ দাবাগ্নির ন্যায় সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া পড়িয়াছে—চতুর্দ্দিকে গাঢ় স্বদেশ ভক্তির লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে; মাতৃভূমি জননীর পূজা হইতেছে—এই মহাপূজার পুরোহিত বর্গ হইতেছেন মাননীয়—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ জে চৌধুরী বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বাবু কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি—আর সুকুমারমতি, উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছাত্রগণ এই পূজার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন।—এরূপ সৌভাগ্য বঙ্গদেশে অনেকদিন আসে নাই, জাপানের জয়, বঙ্গের স্বদেশ প্রীতি দেখিয়া আমাদের মনে হয় দেবতা প্রাচ্যজগতের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহার সস্নেহ প্রীতহস্তে আমাদের মস্তকে আশীষ ধারা বর্ষণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৮০ টি বিরাটসভা (অর্থাৎ যাহাতে প্রায় লক্ষ লোক বর্ত্তমান ছিলেন) হইয়া গিয়াছে এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র সভার সংখ্যা নাই। এক্ষণে বিদেশীয়গণ স্বস্বার্থ রক্ষার্থ আমাদের সম্মুখে যে কুহকজাল বিস্তার করিবে তাহা ছিন্ন করিয়া স্বস্ব কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মার পূজা করিতে পারিলেই আমাদের ধন্য বোধ করিব।

সোণার বাঙ্‌লা।

(টাউন হলে গীত।)

আমার সোণার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে (মরি হায়! হায় রে)—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কি শোভা, কি ছায়া গো!
কি স্নেহ, কি মায়া গো!
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কাণে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায় রে)—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে
নয়ন জলে ভাসি।
তোমার এই খেলা ঘরে
শিশুকাল কাটিল রে—
তোমারি ধূলামাটী অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস ঘরে (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনু চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া ঘাটে
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লি-বাটে
তোমার ধানে ভরা আঙ্গিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায় রে)—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥
ওমা, তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে
দেগো! তোর পায়ের ধূলা
সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।
ওমা গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে (মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী সঙ্গীত।

(রামপ্রসাদী সুর।)

তুই মা মোদের জগত আলো।
সুখ দুঃখে হাসি মুখে
আঁধার দীপ তুমিই আলো!
মা ব'লে মা ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো;

তোরেই যেন বাসি ভালো !
ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই,
থাক্‌না ওদের গৌর বরণ,
হলেমই বা আম্‌রা কালো !
পরের পোষাক খুলে ফেলে,
ফির্‌লাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ-ধারা আজি ঢালো !

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

বিগত রামমোহন লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে জেনারেল এসেমব্লি হলে গীত।

স্বদেশী সঙ্গীত।

"মা"

আমার জন্মভূমি—আমার জননী—আমার
তোমার নিভৃত-নিদ্রিত-নীরব-কুঞ্জে,
„ কোমল-শ্যামল-বিটপী-পুঞ্জে,
ওগো ! কত ছায়া, কত মায়া, কত স্নেহ মুগ্ধে
আমিত জানি না।
তোমার পল্লী-ছায়া-বাটে,
দোহন-মুখর-গোঠে,
শস্য-শ্যামল-মাঠে,
নিভৃত-নির্জ্জন-ঘাটে
আমি পেয়েছি তা—
সারা জনমে পাইনি'ক যা।
„ ভগ্ন-মগ্ন-মন্দিরে,
„ শৈবাল-পূর্ণ-বাপী নীরে—
„ তরু-পল্লব-মর্ম্মরে—
কার গান শুনি মা ?
„ তটিনীর কল-তানে
„ বিহগের মধুগানে
„ নির্ঝরের নব নিঃস্বনে
প্রাই যেন অন্ধ আকুলতা !
তোমার উদার-অনন্ত-আকাশে,
„ মন্দ-মলয়-বাতাসে,
„ বাঁশরীর রবে ভাসে,
„ বিজলী-ঝলকে হাসে
অট্টহাসি—হা—হা—হা !
কাহার অটুট বাণী,
„ করুণ-কাহিনী,
„ কণ্ঠ মোহিনী
ডেকে বলে "ওঠনা"
ডেকে বলে "জাগনা"
ডেকে বলে "দেখনা"
সে তুমি।—আমার জন্মভূমি—আমার মা !

জনৈক বঙ্গ সন্তান।

বিগত টাউনহল উৎসবে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত।

আবাহন গান।

কে বলে ভেঙ্গেছে অঙ্গ ; ভেঙ্গেছে মোহের বাসা
জাগিয়া উঠেছে বঙ্গ-হৃদয়ে তরুণ-আশা ॥
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
নিরাশ—বিলাস—চোর,
ঐ, উদিত সুখের ভোর, কাকলী নবীন-ভাষা।
কে বলে ভেঙ্গেছে বঙ্গ, ভেঙ্গেছে মোহের বাসা
তবে ঘৃণিত বিলাস বাস, চরণে দলিয়া সই!
কল্যাণি! নবীন সাজে সাজলো মঙ্গলময়ি
দাও প্রদাহিত-ক্ষতে অমৃত-প্রলেপ স্নেহে,
কোমল-শীতল কর বুলাও পীড়িত দেহে ?
ধোয়াও নয়ন নীরে মায়ের বেদনা সই ;
দেহে শক্তি সঞ্চারিয়া সঙ্গে সঙ্গে শক্তিময়ী ;
দেহ দেহ নবশিক্ষা, নবমন্ত্রে দেহ দীক্ষা,
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা, দেহ প্রাণে নব বল
দুঃখিনীর দুঃখনীর মুছাইতে চল চল
শত শত সুত সুতা,
হইলে সেবা নিরতা,
মুহূর্ত্তে দূরিবে বাধা, আসিবে নবীন বল
মায়ের আশীষে হবে গৃহে গৃহে সুমঙ্গল।

শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।

সাধারণ সংবাদ।

বরণ কোম্পানীর ধর্ম্মঘট।

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কোম্পানীর হাওড়ার কারখানায় কর্ত্তৃপক্ষগণ এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করেন যে, অতঃপর বাবুদিগকে হাজিরার জন্য টিকিট কাটিতে হইবে। বাবুগণ কুলিদিগের ন্যায় প্রবেশ-কালীন টিকিট পঞ্চ করিতে অস্বীকৃত হইয়া এককালে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী কেরাণীগণের দুঃসহ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ নানাস্থানে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে। প্রসিদ্ধ গন্ধ দ্রব্য বিক্রেতা মিঃ এচ্ বোস সপরিবার প্রায় চারি শত টাকা দিয়াছেন, ষ্টারের সুনাম ধন্য ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসু তাঁহাদের রঙ্গালয়ের এক রাত্রের আয় প্রদান করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন হোপ কোম্পানী নামক ষ্টেশনার্স ও বেঙ্গল ষ্টোর প্রভৃতি কয়েকজন ব্যবসাদারও তাঁহাদের সাহায্যার্থ কতক দিবসের লাভ ছাড়িয়া দিতেছেন। মিনার্ভার অধ্যক্ষগণ একটী সাহায্য রজনী দিতেছেন, আশা করি অন্যান্য রঙ্গালয়াধ্যক্ষগণ ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হউন। নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বাঙ্গালী নামধারী কয়েকজন কুলাঙ্গার এখনও সাহেব-পদ লাঞ্ছিত হইয়া কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন। দৈনিক সহযোগী "সন্ধ্যা" তাহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, এজন্য আমরা নিকুঞ্জ বাবুর নিকট অধিক কৃতজ্ঞ, কারণ এই নরাধমগণ উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে চির-কলঙ্কিত বাঙ্গালী নামে গাঢ় মসী লেপিয়া দিত। স্থানীয় সমাজপতিগণ কি ইহাঁদের সহিত হুঁকা বন্ধ করিতে পারেন না—না স্থানীয় যুবকগণ "মূর্খস্য * ঔষধের" ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

কলিকাতা,—১৩৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ। } কার্ত্তিক, সন ১৩১২। { সপ্তম সংখ্যা।

বিজয়োৎসব।

দুর্গোৎসবের পর বিজয়োৎসব। বিজয়ার আমোদ, বিজয়ার কোলাকুলি কেবল এই শারদীয়া মহাপূজার বিজয়াতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোন প্রতিমার বিসর্জ্জনে এ উৎসব নাই। এস ভক্ত পাঠকবৃন্দ! এস ভাই হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান আজ আমরা পরস্পর হিংসা দ্বেষ, বাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি মনোমালিন্য মায়ের মৃণ্ময়ী প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অগাধ সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া এস-আলিঙ্গন, অভিবাদন ও কোলাকুলি করিয়া কৃতার্থ হই, পরস্পর একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

আনন্দময়ী বিশ্বজননী মা সম্বৎসর পরে কেবল মাত্র তিন দিনের জন্য মর্ত্তে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অবসাদগ্রস্ত, দারিদ্র্য দুঃখ নিপীড়িত সন্তানগণকে সান্ত্বনা করিতে মর্ত্তে মায়ের শুভাগমন হইয়াছিল বটে কিন্তু তিনটী দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই মা আবার চলিয়া গেলেন। ভক্তের সাধের চণ্ডীমণ্ডপ অন্ধকার করিয়া মাহেশ্বরী মহেশ্বর সদনে গমন করিলেন। আমরা চিন্ময়ী মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সাগর-সলিলে নিমজ্জিত করিয়া কোথায় দুঃখে ম্রিয়মাণ হইব, না তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সিদ্ধিপানে আনন্দোন্মত্ত হইয়া পরস্পর কোলাকুলি করিতেছি। মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমা জলে ভাসাইয়া বিষাদের পরিবর্ত্তে এত আনন্দ উৎসব কেন? শোকের পরিবর্ত্তে প্রাণভরা সুখের অভিনয় কেন করিতে হয়?

ভক্ত সাধক জননীকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া, কখন আনন্দে আত্মহারা হইতে পারে না। প্রকাশ্যে যদিও আমরা মায়ের মৃণ্ময়ী প্রতিমা সাগর সলিলে ভাসাইয়া দিই বটে, কিন্তু আমাদের আন্তরিক ভাব তাহা নহে, বাস্তবিক আমরা মায়ের প্রতিমূর্ত্তি জলে

ভাসাইয়া দিই না। আমরা মনোময়ী কমলীকে আমাদের মানস-সরোবরের প্রবল ভক্তি-তরঙ্গে ভাসাইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করি, তাঁহার প্রসাদে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া সিদ্ধিপানে বিভোর হই। তাই বিজয়া মাতৃভক্ত হিন্দুর পক্ষে এত সুখের ও এত উৎসবের দিন। সম্বৎসরের মধ্যে এমন পবিত্র দিন হিন্দুর আর নাই। ইহাই আমাদের বিজয়োৎসবের গূঢ় ও সারমর্ম্ম। তাই এই উৎসবে বিষাদের পরিবর্ত্তে আনন্দোৎসব করিতে হয়। বিজয়ার দিন যখন সংহার মুদ্রা দ্বারা ঘট হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া সাধক সেই প্রাণস্পর্শী মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে, যখন মায়ের প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া বলে—মা! তোমার আগমনে আমি ধন্য, আমার কুল পবিত্র হইল। তখন কোন পাষণ্ডের চক্ষু জলধারাক্রান্ত না হয়, কেন পাষণ্ড অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে? যখন দেবী-প্রতিমার আসন স্পর্শ করিয়া বলিতে হয়;—

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।
বৎপূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥
গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥

শক্তিস্বরূপিণী মা আমাদের হৃদয় মন্দিরে ত চিরকালই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারই শক্তিতে ত আমরা শক্তিমন্ত হইতেছি, সেই মায়ের কৃপাতেই ত আমরা জীবিত রহিয়াছি। তাঁহারই কৃপায় ত এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু সুনিয়মে চলিতেছে। তথাপি আমরা মানুষ, পদে পদে আমাদের নানা প্রকার ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হয় বলিয়া আমাদের স্মৃতিশক্তিকে নবীভূত করিবার জন্য প্রতি বৎসর মায়ের স্নেহময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া ভক্তি প্রাবল্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হই, ভক্তিভরে মা মা বলিয়া ডাকিয়া আমরা মায়ের নাম-সাগরে অবগাহন করিয়া মানবজন্ম সফল করি।

ত্রেতাযুগে জ্ঞানরূপী রাজা রামচন্দ্র মায়া মোহরূপী রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সমরে জয়লাভ করিয়া চৈতন্যরূপিণী সীতার উদ্ধার সাধনার্থ এই সাধের শরতে শারদীয়া মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। ভগবতীর কৃপায় সমরে বিজয়লাভ করিয়া চতুর্থ দিবসে নিজ অনুচরগণ সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মহা মহোৎসবে এই বিজয়োৎসব কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। হিন্দু এই পবিত্র স্মৃতি ভুলিতে পারে না বলিয়াই তাঁহারা প্রতি বৎসর তাহাদের আর্য্যশাস্ত্রের বিধি বিহিত কার্য্য করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করে। মায়া ও মোহ সমরে বিজয়লাভ করিয়া জ্ঞানরূপী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চৈতন্যরূপিণী সীতা লাভ হইয়াছিল। আমরা ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও এতদিন মায়ামোহে বিজড়িত হইয়া চৈতন্য হারাইয়াছিলাম। আজ এই বিজ-

মোৎসবের পর ঘোর হয় আমাদের মায়াপাশ ছিন্ন হইয়াছে, মোহনিদ্রা ঘুচিয়াছে। আমরা পুনরায় জাগরিত, প্রবুদ্ধ হইয়া চৈতন্য লাভ করিয়াছি। আমাদের জড়তা অপসারিত হইয়াছে, তাই আজ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি দেখাইতে যত্নবান হইয়াছি। এস ভাই ভারতবাসি! এস্ ভাই মাতৃভক্ত সুসন্তানগণ! আজ আমরা জননী জন্মভূমির নামে জয়ডঙ্কা তুলিয়া মায়ের উন্নতি কল্পে প্রাণাহুতি দিতে কৃত সঙ্কল্প হই, আমরা পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া, এস-আলিঙ্গন, অভিবাদন ও কোলাহুলি করিয়া আমাদের চির ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখি, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে চেষ্টা করি। আজ আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, ধীরে ধীরে যে পথে অগ্রসর হইতেছি, এই পন্থাই আমাদের দারিদ্র্য নাশের প্রকৃত পন্থা। এই পন্থার অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই আমরা পুনরায় সুখের মুখ দেখিতে পাইব। আমাদের আঁধার গৃহে পুনরায় সুখের বাতি জ্বালিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।

এতদিন পরে প্রসন্নময়ী মা আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন? কি এক অমানুষিক-দৈবশক্তি আমাদের প্রত্যেক শীরায় শীরায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, যাহার বলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হইব। এই মধুর দিনে এই মধুর সম্মিলন যে কেমন মধুময় তাহা ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। এই বিজয়োৎসব যে পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি স্থাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এস ভাই ভারতবাসী! আজ জাতিভেদ ভুলিয়া, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া সদানন্দে প্রেমালিঙ্গনে পরিতৃপ্ত হই। যাহাতে আমরা অচিরে দুরন্ত দানব হস্ত হইতে আমাদের জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারি, যাহাতে মায়ের নয়নের অশ্রুজল মুছাইয়া তাঁহাকে পুনরায় সুখী করিতে পারি, সে বিষয় প্রাণপণে চেষ্টা করি। ঐ দেখ, দুর্ভিক্ষ দানব করে প্রতি বৎসর আমাদের কোটী কোটী স্বদেশীয় ভ্রাতা অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে; অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ভারতে বাস করিয়া অন্নাভাবে জীবলীলা সাঙ্গ করিতেছে। আমরা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াও সেই দানব বিনাশে যত্নবান হইতেছি না, ইহা কি কম ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয়? ভাই! আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না; মায়ামোহ ঘুচিয়াছে এস, এবার সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে এই "স্বদেশী আন্দোলন" চিরস্থায়ী হয়, যাহাতে দেশের টাকা দেশে থাকে, যাহাতে আমাদের অভাব মোচন হয়, যাহাতে আমরা এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দানবের করালগ্রাস হইতে অচিরে অব্যাহতি পাই। কায়মনো-

বাক্যে তাহার চেষ্টা করি। এস, বিজয়ার পর আমরা প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া এক প্রাণে স্বদেশ-হিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করি, আমরা যখন দৈব বলে বলীয়ান হইয়া, এ কার্য্যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছি, তখন আমাদের ভয় কিসের? দৈব আমাদের অনুকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এস ভাই প্রাণ ভরিয়া বলি—বন্দেমাতরম্. জয় ভারতের জয়। এই প্রতিজ্ঞা অটুট রাখিতে পারিলেই জানিব আমরা যথার্থই বিজয়োৎসব করিতে শিখিয়াছি, আমাদের বিজয়োৎসবে যথার্থ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়াছে, নতুবা কেবল মাত্র সিদ্ধিপানে উন্মত্ত হইয়া হৈ হৈ করিলে চলিবে কেন?

মা! আসিয়াছিলেন পুনরায় চলিয়া যাই-তেছেন—এই সময় এস আমরা তাহার পদে যুগলে মনোগত ভাব নিবেদন করিয়া বলি—

মা! তোমার প্রসাদে আমাদের লুপ্ত চৈতন্য পুনরায় লাভ হইয়াছে, তোমার প্রতিমা বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিজয় লাভ করিয়াছি। মা! যাও, যাইবার সময় তোমার দরিদ্র সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, যেন এই বিজয়ায় তাহাদের চির বিজয় লাভ হয়। যাও মা কৈলাশেশ্বরী, কৈলাশে মঙ্গলময় ভবেশের বামে উপবেশন করিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান কর। যাও মা! অন্নদে, সুখদে, শিবদে, পূর্ণদে, সারদে, বরদে, জয়দে, বিপদে শ্রীপদে আমাদিগকে আশ্রয় দিও মা! যখন বিভীষিকাময় ভব সংসারের ভীষণ ভয়ে ভীত হইব, তখন অভয় দানে তোমার এই অকৃতি সন্তানগণকে রক্ষা করো, শ্রীপদে ইহাই আমাদের আন্তরিক নিবেদন।

সম্পাদক।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ রমণী।

শুভ মুহূর্ত্তে বড় লাট কর্জ্জন সাহেব বঙ্গ বিভাগের কল্পনা করিয়াছিলেন, শুভ লগ্নে তিনি দেশের রাজা মহারাজা হইতে সাধারণ সকলের দৃঢ় প্রতিবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ় ব্রত হইয়াছিলেন, তাই আজ আমরা এবঙ্গদেশে এমন এক অভিনব দৃশ্য দেখিতেছি, যাহা আর কখন দেখা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। দেশময়—দেশময় কেন জগৎময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে বাঙ্গালী কেবল বাক্যে বীর, তাঁহারা মুখে যথেষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ এক পাও অগ্রসর হন না। বাঙ্গালী কথা এক জোট হইয়া কার্য্য করিতে পারেনা, বাঙ্গালী পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া ভাবিতে জানে না, এ অপবাদ বাঙ্গালীর অঙ্গের ভূষণ হইয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালী নামের সঙ্গে এ কলঙ্ক

একেবারে অভেদ ভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু আজ একি দেখিতেছি—আজ একি অপূর্ব্ব দৃশ্য, একি স্বর্গীয় চিত্রপট আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে! বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত একি এক তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, এ তরঙ্গে মানের দর্প, উচ্চপদের অহঙ্কার, ধনের গৌরব কুলের বৃথাগর্ব্ব সব ভাসিয়া গিয়াছে। রাজা মহারাজা ইতর সাধারণকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিতেছেন, হিন্দু মুসলমানকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন এবং একই একতার অলক্ষ্য দৃঢ়সূত্র সকলের অন্তর্মর্ম্মস্থল গ্রথিত করিয়াছে। আজি এ বঙ্গদেশে স্বদেশ প্রেম দেবতা সশরীরে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মঙ্গল করস্পর্শে প্রত্যেক হৃদয়তন্ত্রী আন্দোলিত করিয়াছেন, আজ বাঙ্গালীর জীবন-কুঞ্জে তাঁহারই পুণ্য রাগিণী বাজিতেছে! বাঙ্গালার কবিকুল আজ প্রেমের গীত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই জয় গান করিতেছেন; বঙ্গের শিল্পী আজ তাঁহারই চরণ পূজার উপযোগী পুষ্প সম্ভার আয়োজন করিতেছেন! লক্ষ্মীরূপিণী বঙ্গললনাগণ আজ তাঁহারই আবাহন করিতে বরণ ডালা সজ্জিত করিতেছেন! কি আনন্দ! কি উচ্ছ্বাস! কি আবেগ! আমি ধন্য, আমার এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবন ধন্য, যে আমি এ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। চিরদিন যেজন্য কতই কল্পনা, কতই স্বপ্ন বিফলে গিয়াছে, আজ তাহা পূর্ণ জাগ্রত ভাবে প্রবল উদ্দীপনার সহিত সতেজে আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান। এ যদি দুর্দ্দিন তবে সুদিন আর কাহাকে বলিব? এ যদি কাঁদিবার দিন তবে হাসিবার দিন কোন্‌টা! বড় লাট সাহেব করিলেন এক ভাবে কিন্তু ভগবানের একখানি মঙ্গল হস্ত সে কার্য্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন, অন্য দিকে! হে মঙ্গলময়, তোমারই জয় হউক! বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই শুভ মুহূর্ত্তের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করিতেছি না। এই "স্বদেশী-আন্দোলন" প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের রমণী কুলের কর্ত্তব্য কি, সেই কর্ত্তব্য তাঁহারা কি ভাবে পালন করিতেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব কতদূর এই প্রসঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

আমাদের এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ বঙ্গ রমণীগণের উদ্দেশ্যেই লিখিত, এজন্য "স্বদেশী আন্দোলন" জিনিসটা কি তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক কারণ আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি যে অনেক রমণী ইহার গূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইলে সাগ্রহে ইহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

রমণীগণ একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, আমাদের ঘরের জিনিসপত্র আস্বাব প্রভৃতির মধ্যে অনেক বিলাতী অর্থাৎ

বিদেশী জিনিস আছে। লবণ, দোবরা চিনি, কাঁচের চুড়ী, লোহার কলাই করা গেলাস বাটী, থালা, রেকাবী ইত্যাদি, লোহার ঢালা কড়াই, পিত্তলের পাতলা গেলাস, আয়না, চিরুণী, বুরুস, সুগন্ধি দ্রব্য, সাবান, ষ্টীল ট্রাঙ্ক অর্থাৎ বাক্স, উল, কার্পেট, চুলের কাঁটা, সাবান, কাপড়, জামা, বাতি, চিনেমাটির পুতুল, খেলানা, খেলাইবার বল্, গাড়ী ইত্যাদি, চায়ের বাটী ও রেকাবী আর আর সরঞ্জাম, লণ্ঠন বাতি, ছাতি, গল্পি টিনের কৌটা, বার্লি বিস্কুট, সাগু, এরারুট ইত্যাদি ইত্যাদি পুঞ্জ পুঞ্জ বিদেশী জিনিসে আমার ঘর সংসার পরিপূর্ণ। এ গুলি কিনিতে অবশ্য টাকা লাগে। আমরা টাকা দিয়া এই সব জিনিস খরিদ করি, বিলাত ওয়ালারা এই সব জিনিস তাদের দেশে তৈয়ার করিয়া জাহাজে বোঝাই করিয়া আমাদের দেশে পাঠায়; আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা তাই টাকা দিয়া কিনিয়া আমাদের কাছে বিক্রয় করে, সুতরাং আমাদের এই সব টাকা গুলো বিদেশী লোকেরা লইয়া যায়, এদিকে আমাদের দেশের জোলাতাঁতি, কামার, কুমোর, মালাকার, প্রভৃতি লোকেরা যে এই সব জিনিসের ব্যবসায় করিত, তাহাদের ভাত মারা যাইতেছে, তাহাদের তৈয়ার করা জিনিস আর আমরা খরিদ করি না। আমাদের কেমন একটা ঝোঁক পড়িয়াছিল যে আমরা দেশী জিনিস সব ঘৃণা করিয়া বিলাতী জিনিসেরই আদর করিতাম! সুতরাং জোলা তাঁতি, কামার ও অন্যান্য জাতিরা নিজ জাতি ব্যবসায় কোনই সুবিধা করিতে না পারায় ক্রমে ক্রমে অন্ন হীন হইয়া পড়িতে লাগিল, আর ওদিকে বিলাতী ব্যবসায়ীরা আমাদের টাকায় খুব মোটা হইতে লাগিল, আমাদের দেশের কারিগরদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহারা দুধে মাছে খাইতে লাগিল। আমাদেরই দেশ থেকে মালমসলা সব লইয়া গিয়া তারই উপর কারিগরি করিয়া আবার আমাদেরই কাছে দুই তিন চার গুণ দামে বিক্রী করতে লাগ্ল এবং আমাদের দেশের টাকা দুহাতে সাপটিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, বিলাতী জিনিস গুলির বাহিরে সাজ সজ্জা এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে তা দেখলেই কিন্‌তে লোভ যায় কিন্তু তাহার ভিতরে প্রায়ই ফাঁকি, দুদিন পরেই তা ভাঙ্গিয়া, ফুটিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, অভ্যাসের বশে আমরা আবার পয়সা দিয়া তাই কিনিতে যাই, সুতরাং আমাদের পয়সা অনর্থক ব্যয় করিয়া ঐ সব জিনিস আমরা ক্রমাগতই কিনিতে থাকি, এই জন্যই আমরা কিছুতেই আর কুলান করিয়া উঠিতে পারিনা, আমাদের টাকা যা বিলাতীলোকেরা লয় তার আর তো ভাঙ্গা ফুটা নাই, তাহাতে তাদের সুখ সম্পদ বৃদ্ধিই করিতে থাকে, এজন্য আমরা

দেখিতে পাই যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ বাপ পিতামহেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক কম টাকা উপার্জ্জন করিয়াও দশজনকে খাওয়াইতে, পালি পার্ব্বন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে ও আত্মীয় স্বজনকে পোষণ ও আত্মীয়তা রক্ষা করিতে অনেক বেশী পরিমাণে সক্ষম ছিলেন। অবশ্য সে সময় ধান, চাউল, তেল, ঘি প্রভৃতি এখনকার চেয়ে সস্তা ছিল তাহা ঠিক, কিন্তু তাহা ছাড়াও আরও এক প্রধান কারণ ছিল যে, তাঁহারা আমাদের মত তত বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিতেন না—বিলাতী জিনিষের নামও তাঁরা এত জানিতেন না। একজোড়া চটি জুতায় তাঁদের দুবছর চলিয়াছে। এখন আমাদের বছরে চারিজোড়া জুতারই প্রয়োজন হয়। এইরূপ সব বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমরা এত বেশী বিলাতী জিনিষ কিনি বলিয়া আমরা দিন দিন গরীব হইয়া পড়িতেছি। আর এইরূপে অতিরিক্ত মাত্রায় বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করাতে আমাদের দেশের কারিগরদেরও আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন একটা পরস্পর আনুগত্যের ভাব ছিল, সেটাও ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহাদের উন্নতি কি অবনতির দিকে আমাদের দৃষ্টিই নাই, কারণ আমরা তাদের তৈয়ারী জিনিষ ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া তাদের কষ্ট আমরা বুঝিতে চাই না বা চেষ্টাও করি না। তাহারাও আমরা তাহাদের জিনিষ তুচ্ছ করি বলিয়া আমাদের প্রতি তেমন ভালভাবে তাকাইতে পারে না। এইরূপে আমাদের মধ্যে পরস্পরে যে একটা প্রীতি ভালবাসার বাঁধন ছিল, তাও ক্রমেং লোপ পাইতেছে।

বিদেশী লোকেরা আমাদিগকে এ জন্য অনেকে তিরস্কার করিয়াছেন, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের চৈতন্য হয় নাই। আমরা এমনই বিলাত-ভক্ত হইয়াছি যে, আমাদিগকে সাহেব না বলিলে আমরা চটিয়া যাই। বিলাতী সাজ, সজ্জাতে নিজেরাও নিজের পুত্র কন্যা পরিবারদিগকে সাজাইতে একান্ত ব্যগ্র। আমাদের মধ্যে অনেকে একটা জামা কিনিতে হইলেও সাহেবের দোকান হইতে কিনিবেন, একজোড়া জুতা পরিতে হইলেও বিলাতী জুতা পরিবেন। তামাক খাওয়াটা অসভ্যতা ও চুরুট সিগারেট টানাই সভ্যতা।

বাঙ্গালাভাষায় চিঠিপত্র লেখাটা মূর্খতা এবং বাঙ্গালা পুস্তকগুলি কেবল স্ত্রীলোকদের পাঠ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল। এইরূপে এই বিলাতী নেশার ঝোঁকে, অত্যধিক বিলাতী আমুরক্তির ফলে আমরা ক্রমেই আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশ এবং মাতৃভাষা বাঙ্গালা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছিলাম। বিলাতী সভ্যতা, বিলাতী সাজ

সজ্জায় ভূষিতা মোহিনীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে এমনই ভুলাইয়াছিল যে আমরা মাতৃভূমির উৎকৃষ্ট রত্নরাজি শোষণ করিয়া তাহারই চরণে সমর্পণ করিতেছিলাম। এ ঘোরঘোর, এ নেশা আমাদের কিছুতেই টুটিতেছিল না। আমাদের দেশের বড়লোকেরা ভাবুকেরা আমাদের এই মত্ততা দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত হইয়া ইহার উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে আমরা বিলাতী জিনিষ ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করা আরম্ভ না করিলে আর দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবার উপায় নাই— আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। তাই এবিষয়ে তাঁহারা অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। তারপর এ বাঙ্গালা দেশ দুইভাগ করিবার কল্পনা যখন বড়লাট বাহাদুর করিলেন এবং দেশের সকল লোক তাহাতে দেশের বড় অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া অনেক প্রকারে সরকার বাহাদুরকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, আমরা যতই কেন বিলাতের চরণ পূজা করি না কেন, বিলাত আমাদিগকে একটা প্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। এই অপমান জ্ঞান অপমান আমাদের মনে জাগাইয়া দিলেই তড়িৎবেগে স্বদেশ প্রেম আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত হইল, সে প্রেমের বন্যায় আজ দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, যে বাঙ্গালীর চুরুট হইতে খাট বিছানা পর্য্যন্ত কিছুই বিলাতী না হইলে চলিত না, আজ সে বাঙ্গালী সব বিলাতী জিনিষ বিষবৎ দূরে পরিত্যাগ করিতেছে; ব্যারিষ্টারগণ হ্যাট কোট ফেলিয়া ধুতি চাদর পরিধান করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনী বক্তৃতা করিতেছেন, দোকানী পশারী আজ সদর্পে স্বদেশী ভাণ্ডার নাম দিয়া দোকান খুলিতেছে—বিদ্যালয়ের ছাত্র আজ বাবুগিরি, বিলাসিতা দূরে ফেলিয়া মাতৃসেবায় প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন।

এ মঙ্গল আহ্বানে আমাদের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী প্রতিমা গৃহলক্ষ্মীগণও উদ্বোধিত হইতেছেন। যাঁহারা সূক্ষ্ম বিলাতী সাড়ী না হইলে পরিতেন না, আজ অম্লান বদনে মোটা বোম্বাই ধুতি সাগ্রহে পরিয়া যেন গর্ব্বিতা হইতেছেন। নানা রং বেরংএর বিলাতী চুড়ী না হইলে যাঁহাদের তৃপ্তি হইত না, আজ তাঁহারা স্বহস্তে সানন্দে সেই সব চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন এবং সেই সনাতন শঙ্খ বলয়ে প্রাচীন পূণ্য আদর্শের পুনরাবির্ভাব করাইতেছেন। বিলাস সজ্জা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অনেকে কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যোগিনীবেশে মাতৃভূমির মঙ্গল মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিতেছেন। এদৃশ্যে কাহার হৃদয় না মুগ্ধ হয়। [ক্রমশঃ।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি,এ।

বিশ্বামিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বামিত্র রাজনৈতিক বীর। তিনি রাজা ও যোদ্ধা; কিন্তু তজ্জন্য তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন নাই; ব্রাহ্মণেতর বর্ণ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত গুণে অলঙ্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এই মহাস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্র বৈদিককালে অবির্ভূত হইয়াছিলেন। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও তাঁহার নামোল্লেখ দেখা যায়। তিনি যে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার কোন বিবরণ প্রকটিত নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একস্থানে তিনি রাজপুত্র * বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র শতদ্রু ও বিপাশা নদীর সংযোগস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনাকে কুশিকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন *। এক্ষণে এই কুশিকের পরিচয় জানিতে পারিলেই আমরা বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাইব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষগণের আভাস পাওয়া যায় †। তদ্দ্বারা স্পষ্ট

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনশেফ উপাখ্যানে ইহার বর্ণনা দেখা যায়। মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুনশেফের প্রাণ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে পুত্ররূপে স্বীকার করিলে শুনশেফ বলিয়াছিল,—

"সহ উবাচ শুনশেফঃ স বৈ যথা নো জ্ঞাপয়া রাজপুত্র তথা বদ। যথৈবাঙ্গিরসঃ সন্ন পেয়াস্তব পুত্রতামিতি।"

* রমধ্বংমে বচসে সৌম্যায় ঋতাবরীরূপ মুহূর্ত্তমেবৈঃ।
প্রসিন্ধুমচ্ছ বৃহতী মনীষা
অবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ॥ ৩মঃ ৩৩ সূঃ

মহাত্মা সায়ন উহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে একস্থলে বলিয়াছেন "কুশিকো রাজা বভূব" কুশিক [illegible] ছিলেন।

† বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণকুমার দেবরাতের রক্ষাবিধান করিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে বলিতেছেন,—

"এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত। যুষ্মান্ দায়দ্যে উপেতা বিদ্যাং যাযুচ বিদ্মসি॥ তে সম্যঞ্চো বৈশ্বামিত্রাঃ সর্ব্বে সাকং সরাতয়ঃ দেবরাতায় তস্থিরে ধৃত্যৈ শ্রৈষ্ঠ্যায় গাথিনঃ। অধীয়ত দেবরাতো রিক্থয়োরুভয়োঋষিঃ। জহ্নুনামাধিপত্যে দৈবে বেদে চ গাথিনাম্॥"

"হে কুশিকগণ! এই দেবরাত তোমাদের অধিপতি হইলেন, তোমরা ইঁহার অনুগমন কর। উনি তোমাদিগকে আমার দায়াদরূপে গ্রহণ করিবেন এবং আমাদের সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী হইবেন।" বিশ্বামিত্রের এই

প্রতীত হয় যে, বিশ্বামিত্র জহ্নু ও গাধির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একণে জহ্নু, কুশিক, গাথি (গাধি) ও বিশ্বামিত্র ইঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণীত হইলেই বিশ্বামিত্রের পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যাইবে। মহাভারত আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে কুশিকগণ অমিততেজা জহ্নুর বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন *। এই জহ্নু চন্দ্রবংশীয়। ইনি অমাবসুর অধস্তন চতুর্থ পুরুষে অবতীর্ণ হয়েন। ইঁহার পর ক্রমান্বয়ে সুমন্ত, রূপরাজক, বলাকাশ্ব, কুশ, কুশাম্ব ও গাধিরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র গাধির পুত্র সুতরাং বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় *।

কথা শ্রবণে গাথিবংশীয় বৈশ্বামিত্রগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেবরাতের অনুগত হইয়া রহিল। এইরূপে ঋষি দেবরাত জহ্নুদিগের আধিপত্য এবং গাথিদিগের বৈদ বেদ প্রাপ্ত হইলেন।

* "অন্বয়াঃ কুশিকাঃ রাজন্
জহ্নোরমিততেজসঃ ॥ তথাচ গারুড়ে
অত্রিঃ সোমস্ত ভার্য্যা তারা সুরগুরোঃ প্রিয়া।
সোমাত্তস্যাৎ বুধো জজ্ঞে বুধপুত্রঃ পুরূরবাঃ ॥
বুধপুত্রাদথোর্বশ্যাং ষট্‌পুত্রাস্ত শ্রুতায়ুষঃ।
বিশ্বাবসুঃ শতায়ুশ্চ আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ॥
অমাবসোস্তুভীমো ভীমপুত্রশ্চ কাঞ্চনঃ।
কাঞ্চনস্ত সুহোত্রোঽভূৎ জহ্নুশ্চাভূৎ সুহোত্রতঃ
জহ্নোঃ সুমন্তুরভবৎ সুমন্তো রূপরাজকঃ।
বলাকাশ্বোঽস্য পুত্রোঽভূৎ বলাকাশ্বাৎ
কুশঃ সুতঃ ॥
কুশাশ্বঃ কুশনাভশ্চামূর্ত্তরয়ো বসুঃ কুশাৎ।
গাধিঃ কুশাৎ সংজজ্ঞে বিশ্বামিত্রস্তদাত্মজঃ ॥
কন্যা সত্যবতী দত্তা ঋচিকায় দ্বিজায় সা।
ঋচীকাজ্জমদগ্নিশ্চ রামস্তস্যা ভবৎ সুতঃ ॥

গরুড়পুরাণ।

* হরিবংশে লিখিত আছে, কুশের চারিপুত্র কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমৎ পৌরু কুৎসী কুশিকের বনিতা; উঁহারই গর্ভে গাধি জন্মগ্রহণ করেন।

কুশপুত্রাঃ বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্চ্চসঃ।
কুশিক, কুশনাভশ্চ কুশাম্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা ॥
স গাধিরভবদ্রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্।
পৌরুকুৎস্যভবদ্ভার্য্যা গাধিস্তস্যামজায়ত ॥

হরিবংশ

বিশ্বামিত্রস্ত দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ।
জনয়ামাস পুত্রস্ত তপোবিদ্যা সমাত্মকম্ ॥

কোন কোন গ্রন্থে কুশিক, কুশাম্ব ও কুশাশ্ব লইয়া বিষম গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাজা গাধি কুশাম্বের পুত্র। যথা, তেষাং কুশাম্ব শক্রতুল্যোমে পুত্রোভবেদিতি তপশ্চচার। তঞ্চোগ্রতপসমবলোক্য মাভবত্বন্যোঽস্মত্তুল্যবীর্য্যঃ ইত্যাত্মনৈব অস্য ইন্দ্রঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ। গাধির্নাম স কৌশিকোঽভবৎ ॥"

বিশ্বামিত্রের কোন্ পিতৃপুরুষ সর্ব্বপ্রথম রাজা হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তিনি "পৌরব" "ভরত" "কৌশিক" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে এককালে পুরু, ভরত ও কুশিকের বংশধর বলা হইতেছে। পুরু, ভরত ও কুশিক চন্দ্র-বংশে উৎপন্ন হইলেও এক শাখাতেই উদ্ভূত কি না, আমরা এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি; এবং সেই সঙ্গে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা পাঠকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পিতৃরাজ্যের নাম মহোদয়। সেই রাজা কুশনাভ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। কিছুকাল অতীত হইলে ঐ মহোদয়ের পরিবর্ত্তে কান্তকুব্জ নাম প্রচলিত হয় *। কান্তকুব্জ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ইহাদের রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। হরিবংশে বর্ণিত আছে রাজা কুশিক বনচারী পহ্লবদিগের † সহিত সম্মিলিত করিয়া ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের ইচ্ছায় উৎকট তপশ্চরণ

হরিবংশ ও মহাভারতে কুশিকই গাধির পিতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তদযথা—

"কুশিকস্তু তপস্তেপে পুত্রমিন্দ্রসমবিভুঃ।
লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যেত্য জজ্ঞিবান্।
পূর্ণেবর্ষসহস্রে বৈ তন্তু শক্রোহ্যপশ্যত।
অত্যুগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
সমর্থঃ পুত্রজননে স্বমেবাংশমবাশয়ৎ॥
স গাধিরভবদ্রাজা মঘবান্ কৌশিকঃ স্বয়ম্।"
হরিবংশ।

ভগবান্ বাল্মীকি বলেন গাধি কুশনাভের পুত্র;—

"কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুত্রং গাধিং ....."
"কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।"

* বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ৩২শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

† যে সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণদিগের দর্শনাভাব প্রযুক্ত পতিত হইয়াছিল, পহ্লবগণ তাহাদের অন্যতম।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ"
মনু ১০ম অধ্যায়।

অপিচ মহাভারত শান্তিপর্ব্বে।

"যবনাঃ কিরাতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ।
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দাঃ রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্র প্রসূতাশ্চ ———"

বিষ্ণুপুরাণ ও নারদীয় পুরাণও দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। কুশিক রাজা হইয়াও বনচারী পহ্লবদিগের সহিত কেন মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কুশিক কি রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে পহ্লবদিগের সাহায্যে নিজ রাজ্য উদ্ধার অথবা নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন?

বিশ্বামিত্রের জন্মসম্বন্ধে এই অদ্ভুত উপাখ্যানটী শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা গাধির সত্যবতী নামে একটী কন্যা ছিল। ভৃগুকুলোদ্ভূত মহর্ষি ঋচিকের সহিত তাহার পরিণয় হয়। ব্রাহ্মণগুণোপেত উপযুক্ত পুত্রলাভের বাসনায় মহর্ষি ঋচক সত্যবতীর জন্য চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন; অনন্তর সত্যবতীর জননী যাহাতে যুদ্ধবিক্রান্ত পুত্র লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশেও তদনুরূপ চরু প্রস্তুত করিয়া দেন। এইরূপে মাতা ও কন্যার জন্য ভিন্ন গুণসম্পন্ন দুই প্রকার চরু প্রস্তুত হইলে মাতা কৌশল করিয়া নিজ চরু কন্যাকে দিলেন এবং কন্যার চরু স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। ইত্যবসরে ঋচিক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, সত্যবতীর শরীর হইতে রৌদ্রতেজ নিঃসৃত হইতেছে। তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বনিতাকে বলিলেন, 'হা পাপীয়সি! কি কুকাজ করিয়াছিস্! তোর দেহকে অতীব রৌদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। তুই নিশ্চয়ই তোর মাতার জন্য সংস্কৃত চরু ভক্ষণ করিয়াছিস। সেই চরুতে আমি শৌর্য্য, বীর্য্য ও বল আরোপ করিয়াছিলাম এবং তোর চরু অখিল শান্তি, জ্ঞান, তিতিক্ষাদি ব্রাহ্মণসম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। প্রতারিতা সত্যবতী পতির পদপ্রান্তে পতিত হইয়া গদগদনয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "প্রভো! না জানিয়া আমি সে চরু ভক্ষণ করিয়াছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন এবং যাহাতে আমার পুত্র ক্ষত্রিয়গুণে অলঙ্কৃত না হইয়া পৌত্র হয়েন, অনুগ্রহ করিয়া সেইরূপ উপায় বিধান করুন।" ঋচক "এবমস্তু" বলিয়া নিরস্ত হইলেন। যথাকালে সত্যবতী ব্রাহ্মণগুণোপেত এক পুত্র প্রসব করিলেন; তাঁহার নাম যমদগ্নি। এ দিকে তাঁহার জননী কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্র প্রসূত হইলেন। যমদগ্নি ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভূত রেণুর দুহিতা রেণুকার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই রেণুকার গর্ভে ক্ষত্রিয়কুলান্তক মহাবীর পরশুরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন *।

বিশ্বামিত্রের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। হরিবংশের এক স্থলে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র বিশ্বরথ

* বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়, মহাভারত বনপর্ব্ব ও হরিবংশ॥

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কতদিন তিনি বিশ্বরথ নামে বিদিত ছিলেন, এবং কোন্ সময়ে ও কি কারণেই বা বিশ্বামিত্র নাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণত্ব-লাভের পর বিশ্বরথ বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়েন *। কিন্তু সে অনুমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারা যায় না।

বিশ্বমিত্রের চরিত্র সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহাভারতের শল্য পর্ব্বে বর্ণিত আছে। পুরাকালে গাধি নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন। মহাপ্রতাপবান বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র। রাজা গাধি মহাযোগী হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাঁহার নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি রাজ্যপালন করিতে ইচ্ছা করিলেন না এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বামিত্রকে সিংহাসনে অভিষেক করিয়া স্বয়ং দেহত্যাগে মনোনিবেশ করিলেন। তখন তদীয় রাজ্যে রাক্ষসের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাবৃন্দ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিনীতভাবে বলিল, "মহাপ্রাজ্ঞ! আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে রক্ষা করুন; এক্ষণে আপনি রাজ্য ত্যাগ করিবেন না।" গাধি তাহাদের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বিশ্বামিত্রকে রাজাসনে স্থাপন করিয়া তিনি ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র বিশেষ যত্নবান্ হইয়াও পৃথিবী রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে রাজ্যের অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া তিনি চতুরঙ্গ সেনাবল সহ নগর হইতে যাত্রা করিলেন এবং দূরপথ অতিক্রম করিয়া বসিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ আপনাদের বাসোপযোগী অসংখ্য গৃহ নির্ম্মাণ করিল। এইরূপে বিশ্বামিত্রের সেনা কর্ত্তৃক তপোবন ভগ্ন হইতে দেখিয়া মুনিসত্তম বসিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় গাভীকে আদেশ করিলেন "ভীষণ শবরদিগকে সৃষ্টি কর।" ধেনু তখনই ভীমদর্শন শবরদিগকে সৃষ্টি করিবামাত্র তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া রাজা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

স্বীয় সৈন্যগণের পরাভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় দুঃখিত হইলেন

---

* বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথ স্মৃতঃ।
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবৰ্দ্ধনঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিশ্বামিত্র শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে;—

"বিশ্বত্রয়েণ যো মিত্রং কর্ত্তুং ন শকিতাঃ পুরা।
বিশ্বামিত্রস্ত তে মৈত্রীমিষ্টকাংক্ষ্যুমিচ্ছতি॥"

এবং তপোবলই শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া সরস্বতী নদীতীরে সমাহিত চিত্তে উৎকট তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। দেবগণ তাঁহার ব্রতভঙ্গমানসে নানা বিঘ্নবাধা স্থাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই বিশ্বামিত্রকে নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না। এইরূপে পরম যত্ন সহকারে বহুবিধ তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী হইতে দেখিয়া পরমেষ্ঠি পিতামহ তৎসমীপে আবির্ভূত হইলেন এবং অভীষ্ট বরপ্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করি।" সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা "তাহাই হইবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে মহাযশা বিশ্বামিত্র উগ্র তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃতকাম সুরের ন্যায় কৃৎস্না পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মহাভারতের শল্য পর্ব্বোক্ত এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের অভ্যন্তরে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অতিমানুষ অবদান পরম্পরা নিহিত রহিয়াছে। আমরা ক্রমে ইহাকে বিস্তারিত করিয়া তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাজা বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশ অতীব বিস্তৃত। প্রথিতনামা অধিকাংশ আর্য্যবীরই এই পবিত্র চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের নানা স্থানে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রের পুত্র ভগবান্ বুধ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বুধ বৈবস্বত মনুর দুহিতা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাতে রাজর্ষি পুরূরবাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। পৌরাণিকদিগের মতে পুরূরবাই চন্দ্রবংশের আদি রাজা। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ জগতের মধ্যে দুইটী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজবংশ। এই দুইটী বংশ ঠিক এক সময়েই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের পূর্ব্বে ভারতে কিম্বা জগতের অন্য কোন দেশে অন্য কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল কি না, তাহার কোন বিবরণই জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। চীন, আসিরিয়া ও মিসরের যে তিনটী প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ তত্তদ্দেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রকটিত আছে, তাহারা ভারতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ-প্রতিষ্ঠার বহুকাল পরে তত্তদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই দুইটী মহদ্বংশই জগতের অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে প্রাচীনতম। ভগবান্ সূর্য্যের তনয় মনু সূর্য্যবংশের এবং ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র বুধ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দুইটী মহাপুরুষ ঠিক এক সময়েই স্ব স্ব বিশাল বংশতরু এই পুণ্যভূমি ভারতে রোপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে বুধদেবকে ভগবান্ মনুর একপুরুষ পরবর্ত্তী

বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; কেন না তিনি তাঁহার এক পুরুষ পরে অবতীর্ণ হইয়া তদীয় দুহিতা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে যে, ভারতীয় অন্যান্য রাজবংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই এই দুইটী বিশাল বংশতরুর শাখা প্রশাখা মাত্র। কবিগুরু বাল্মীকি সূর্য্যবংশীয় এবং কবিকুলতিলক মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের পবিত্র চরিত সর্ব্বপ্রথম গাথাবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উভয়ের মধ্যেই বাল্মীকিই আদি কবি। তাঁহার বহুকাল পরে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের ধারাবাহিক বিবরণ গাথাবদ্ধ হয়। তিনি যে বাল্মীকি রামায়ণের ছায়া অবলম্বন করিয়া রবিকুলকাহিনী লিখিয়াছিলেন, মহাভারত পাঠে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবান বৈবস্বত মনু সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্রকুমার বুধ চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু এবং তদীয় অন্যতম পুত্র নিমি কর্ত্তৃক সূর্য্যবংশীয় দুইটী বিশাল শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দুইটী শাখা ইক্ষ্বাকু ও বিদেহ শাখা নামে প্রসিদ্ধ। আদর্শ পুরুষ ভগবান রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশে এবং লোকললামভূতা সতীপ্রধানা সীতা বিদেহ কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ এক সময়ে ভারত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ঠিক এক সঙ্গে এক রূপ পদ্ধতিক্রমে পুষ্টিলাভ করে নাই। চন্দ্রবংশ ধীর সুদৃঢ়ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল;—অল্প অল্প করিয়া বিপুল বল অর্জ্জন করিয়াছিল। একদা সেই বলের প্রচণ্ড প্রভাবে পর্য্যস্ত হইয়া অর্দ্ধেক আসিয়াখণ্ড তাঁহাদের সহায়তা করিবার নিমিত্ত কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যবংশ সেরূপ নহে;—ইহার প্রথর জ্যোতি একবার উদ্ভিন্ন হইবামাত্র দেখিতে দেখিতে প্রখরতর হইয়াছিল; দেখিতে দেখিতে মানবমণ্ডলীর অসহ্য হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে বিদগ্ধ করিয়াছিল। একদা সুদূর লঙ্কাদ্বীপও ইহার প্রচণ্ড তেজে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। সূর্য্যকুলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং চন্দ্রবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পুরূরবা, হরিশ্চন্দ্র, ধুন্ধুমার ও জনক এবং ভরত, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, দৈত্য, কৌরবগণ ও জরাসন্ধ প্রভৃতি বীরগণ উদ্ভূত হইলেও উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের অলৌকিক অবদান দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ গরীয়ান হইয়া রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্র যে সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতের অনেক স্থানে আর্য্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আর্য্য সভ্যতা সুদূর দাক্ষিণাত্য ভূমেও প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের যে কয়েকটী শাখা প্রশাখা ভারতের নানাস্থানে শোণিতজ্ঞ বহিয়া

ছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে কৈকয়, বিদর্ভ, বৈদেহ, অঙ্গ, কালিঙ্গ, পাঞ্চাল, দাশার্হ ও কৌশিকগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত শাখা কুলের মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রচলিত ছিল; ইহারা কখন স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিত, কখন বা রাজচক্রবর্ত্তী পদলিপ্সু কোন বিজয়ী অধিরাজের অধীন থাকিয়া করদ বা সামন্ত রাজরূপে পুজোপচার যোগাইয়া দিত। এই সকল রাজ্যের অধিকাংশই আর্য্যাবর্ত্তের ছিল। দণ্ডক, তুর্কসু ও ক্রহ্যর কচিৎ কোন রাজকুমার আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্য দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সে যাহা হউক, সেই সকল নরপতি ও তাঁহাদের রাজ্য সমূহের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে:—সেই সকল শাখা রাজ্যে এবং প্রধান বংশতরুদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সহিত কৌশিকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ দ্বারা বিশ্বামিত্রের ইষ্টানিষ্ট কিরূপে কতদূর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চরিত্র কিরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, এক্ষণে আমরা সঙ্ক্ষেপে তাহারই অনুশীলন করিতেছি।

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—অতি প্রাচীন প্রবাদ। সভ্যতার প্রায় সকল অবস্থাতেই সকল দেশেই এই প্রবাদের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। একদা বীরত্ব কেবল শারীর-বল ও সামর্থ্য দ্বারাই পরিমাপিত হইত; ক্রমে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত মানসিক বল শারীর বলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বীরত্বের পরিমাপক হইয়াছে। এখন বাহুবল আর প্রকৃত বল নহে,—মস্তিষ্ক বলই প্রধান বল। ভারতে চিরকালই বাহুবলের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে বাহুবল বুদ্ধিবিরহিত সামান্য পাশব বল নহে;—মস্তিষ্কবল দ্বারা সেই বাহুবল অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইত। নতুবা আর্য্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী অনার্য্যমণ্ডিত ভারতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইত না;—নরমাংসাসী অসংখ্য রাক্ষসের মধ্যে মুষ্টিমেয় কতিপয় বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থির থাকিতে পারিত না। ভারতে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যিনি উক্তরূপ বাহুবলে বলীয়ান হইয়া অবশিষ্ট সকলের উপর জয়লাভ করিয়াছেন, বসুমতী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন। তিনিই রাজসূয় যজ্ঞে স্বীয় সার্ব্বভৌমিক সপ্রমাণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। ভারতের পুরাতত্ত্বে এরূপ অনেক সার্ব্বভৌমিক অধিরাজের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত রাজচক্রবর্ত্তী বা রাজাধিরাজ বলে, শ্রীরাম ও যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে সূর্য্য ও সোম বংশে সেরূপ কোন বীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, বলা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ও আমাদের কর্ত্তব্য।

রাজার কর্ত্তব্য রাজা করিয়াছেন। বঙ্গ ভঙ্গ করিব বলিয়া রাজা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিগত ৩০ সে আশ্বিন সে প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এত বাদ প্রতিবাদ, প্রজাবর্গের এত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া রাজা যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন—তাহা অকাতরে সুসম্পন্ন করিলেন, কোন বাধাই মানিলেন না। ঐ দিবস রাজার বিধি—অনুসারে বঙ্গ ভঙ্গের ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইলে আমরা অশৌচ গ্রহণান্তর গঙ্গাস্নান করিয়া রাখী বন্ধন করিয়াছিলাম। ৩০ সে আশ্বিন বঙ্গবাসীর নিকট যে কি বিষাদের দিন হইয়াছিল—তাহা আমাদের বিদেশীয় রাজ পুরুষেরা কি জানিবেন। কিন্তু সে দিবস বঙ্গ ভঙ্গ করিয়া রাজা আমাদের পৃথক করিতে চেষ্টা করিলেও আমরা যে কিছুতেই পৃথক হইব না, আমাদের পৃথক করা যে কাহার সাধ্য নাই, সেদিন শুধু রাজপুরুষ কেন আপৃথিবী সকলেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, আমাদের একতা বন্ধন দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক্রমে বঙ্গবাসী সকলে ভাই ভাই একঠাঁই হইয়া রাখীবন্ধন করিয়া কলিকাতার মিলন মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। সেই জনস্রোত, জনসমুদ্রের উচ্চকণ্ঠের সেই গগনভেদী "বন্দে মাতরম" শব্দ শ্রবণ করিলে, কে বলিবে সে দিন আমাদের বঙ্গ ভঙ্গ করা হইয়াছিল? কে বলিবে যে আমরা রাজার আদেশে পৃথক হইয়াছি? দৈব কর্ত্তৃক রক্ষিত এই বঙ্গদেশকে পৃথক করে জগতে এমন সাধ্য কাহার? সন্তান যদি মাতৃ ভক্ত হয়—যদি ভাই হইয়া ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক টান থাকে; তাহা হইলে পৃথক করা কাহার সাধ্য নহে। বলিতে পারিনা, ৩০ সে আশ্বিন বঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছিল কি বঙ্গদেশ পুনরায় যোড়া লাগিয়াছিল। তাহা রাজা পুরুষেরা বিচার করিবেন। সেরূপ একপ্রাণতা, সেরূপ আন্তরিক ঐক্যতা বন্ধন আর কখন হয় নাই! ঐ দিবস বঙ্গবাসীর একতা বন্ধন দেখিয়া রাজ পুরুষগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন নিশ্চয়ই কোনরূপ রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। এই জন্য তাঁহারা সকলেই সতর্কভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিনকার কার্য্য এত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাজ পুরুষগণ যে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়া বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী বিদ্রোহী হইবার জন্য সে দিন একত্র মিলিত হয় নাই। এই অবস্থা বঙ্গব্যবচ্ছেদ কার্য্যে যাহাতে

তাহাদের ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে তাহারা আর কোনও ক্রমে পৃথক না হয়। এই উদ্দেশেই তাহারা একত্র মিলিত হইয়াছিল। এতদিন তাহরা রাজার মুখাপেক্ষী হইয়াছিল, এখন হইতে তাহারা যাহাতে নিজে নিজেই আপনাদের দুঃখ, স্বদেশবাসীর দুঃখ, জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ দূর করিতে পারে; যাহাতে আপনার পদ-ভরে আপনি দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে, সেই জন্য ভাই ভাই মিলিত হইয়া প্রাণের দুঃখ জানাইয়াছিল এবং যাহাতে আমরা এবার হইতে ভ্রাতৃভাবে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হই, যাহাতে স্বদেশ ও স্বদেশ বাসীগণের উন্নতি করে স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে প্রাণপণ করি. সেই জন্য পরস্পর প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। ইহাতে রাজ বিদ্রোহিতা কি? এ আন্দোলনের সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা আত্মোন্নতি করিব। বিদেশীয় স্বার্থপর বণিকগণের হস্ত হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিব। ইহাতে রাজার আপত্তি কি? রাজা যদি ব্যবসাদার না হইয়া যথার্থ রাজা হইতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যবসাদারী স্বার্থ টুকু তাঁহাদের ছাড়িতে হইবে নতুবা স্বর্গীয় "রাজা উপাধীতে ভূষিত হওয়া কি ব্যবসাদারের সাধ্য? রাজা যে পৃথিবীর দেবতা ব্যবসাদারের সাধ্য কি যে এ উপাধী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়? রাজা আমাদের যথার্থই রাজার কাজ করিয়াছেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ রূপ মহাবাণে আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। তাই আজ বহুদিনের পর আবার আমাদের মোহনিদ্রা ঘুচিয়াছে। তাই স্বদেশী আন্দোলনের সম্মোহন-মন্ত্রে আমরা পুনর্বার সঞ্জীবীত হইয়াছি, তাই আজ আমরা প্রত্যেকের অভাব বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারার্থে আবার বদ্ধ-পরিকর হইয়াছি। সুবাতাস বহিয়াছে—আমাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ বহুদিন-বিস্মিত একটী ক্ষীণশক্তি যেন এ দেশবাসীর শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া, পুনরায় তাহাদিগকে জাতীয় একতা বন্ধনে উত্তেজিত করিতেছে। সেই উত্তেজনার ফলই এই "স্বদেশী আন্দোলন।" মহামায়ার মহাশক্তিতে পরিচালিত হওয়ার আজ জাতীয়-মহাশক্তি ক্ষীণ ক্ষণপ্রভার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতেছে, তাঁহারই কৃপায় যে আমাদের শবপ্রায় জড় দেহ পুনরায় শক্তিমন্ত হইতেছে, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়াই যে আমরা ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া এই "স্বদেশী আন্দোলন" কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।—ইহা যেন কাহার ধারণা না থাকে। "স্বদেশী আন্দোলন" এখন আমাদের একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা আমাদের জীবন রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। একটু ধীর ও স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই

সহজে বুঝিতে পারিবেন—আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি, আর কিছুদিন পরে আমাদিগকে কি হইতে হইবে! আজ কাল আমাদের চাকুরী ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহের আর অন্য উপায় নাই। সকলেই জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া, একমাত্র চাকুরীর উপর লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছি—কিন্তু তাহা আর কতদিন। সমগ্র ভারতবাসীর অন্ন সংস্থান করা তাহাদের সকলের অভাব বুঝিয়া চাকুরী প্রদান করা, পৃথিবীস্থ অন্য দেশ সমুহ আর কয় দিন পারিবে? আমরা যদি এখন হইতে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া চিরকাল ঠিক এই রূপ ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আর কিছু দিন পরে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অনশনে দিনপাত করিতে হইবে! দেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এখন হইতেই আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভিতর অর্দ্ধাশন আরম্ভ হইয়াছে! আমরা ইহা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারার্থে যত্নবান হইতেছিনা। কেবল ভোগ বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেশের কোটী কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছি; দেশের পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হইতেছে, তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবিতেছি না। স্বদেশের অজস্র শোণিত দানে বিদেশীয়ের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, আপনার প্রতি আপনি ফিরিয়াও দেখিতেছিনা। ভারত কেবল রত্নগর্ভা বলিয়াই আমরা এত অপরিণাম দর্শীতার কাথ করিয়াও এখন দেশে বসিয়া বহু কষ্টে উদরে চারিটী অন্ন দিতে পারিতেছি, পৃথিবীর অন্য দেশ হইলে একদিন তাহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হইত একবার ভাবিয়া দেখুন?

রাজা আমাদের বণিক জাতীয়, ব্যবসা করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু সে দোষ কাহার? রাজার না আমাদের? আমরা যদি দেশের ও দশের প্রতি না তাকাইয়া তাহাদের দ্রব্য ক্রয় করি, হাতে করিয়া নিজের মুখের গ্রাস যদি পরের হাতে তুলিয়া দিই, সেত আমাদেরই দোষ। আমরা যদি বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার না করি, তাহা হইলে ত রাজা আর বিলাতী দ্রব্যাদি আমদানী করিতে পারেন না, দেশের দোকানদারগণও আর খরিদ করিয়া অর্থ নষ্ট করেন না। আমাদের মতি গতি এত দিন ধরিয়া বিলাতী ধরণে গঠিত হইয়া গিয়াছে; তাই ত আমাদের দুর্দ্দশার মাত্রা এত বৃদ্ধি হইয়াছে! এবার হইতে আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছি, সে "স্বদেশী আন্দোলনের" ধুয়া ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। যদি আমরা এই আন্দোলনে সফলতা লাভ করিতে পারি; যদি

স্বদেশজাত দ্রব্যে আবার আমরা আস্থাবান হই, তাহা হইলে দেখিবেন পুনরায় আমাদের সেই সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে, আবার আমরা জননী জন্ম-ভূমির শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া সুখের তরঙ্গে ভাসিতে থাকিব ? আর যদি এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি আমরা নিজের দোষে এই মহৎ আন্দোলনের উপকারিতা উপলব্ধী করিতে না পারিয়া পুনরায় ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আর আমাদের রক্ষা নাই। আমাদের ধ্বংস যে সন্নিকটবর্ত্তী তাহাতে আর কোনও সংশয় নাই।

আমরা যদি যথার্থ শিক্ষিত হইয়া থাকি, যদি যথার্থই আমরা স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আর তিলেকের জন্য আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। কার্য্যের সময় হইয়াছে, কার্য্য করা এখন আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য হইয়াছে। সকলে মিলিয়া যাহাতে দেশের টাকা দেশে রাখিতে পারি, যাহাতে দেশের অভাব দূরীভূত করিয়া স্বজাতীর মুখোজ্জল করিতে পারি, আসুন,—আমরা সেই বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হই, তাহা হইলে দেখিবেন আর কিছু দিন পরে আমাদের সমস্ত বিষাদ, সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়া যাইবে, আমরা আবার পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি।

স্বয়ং স্বদেশজাত ইংরাজ আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্যের মহত্বের বিষয় আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন, কিন্তু বিলাতী-অভ্যাসে আমাদের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে তাঁহাদের সেই অমূল্য কথার ভাব আমরা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবল কাঞ্চন ভ্রমে কাচ খরিদ করতঃ নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি। ইংরাজ আমাদের দেশের রাজা বটে কিন্তু স্বদেশীয় নহেন, তাঁহাদের নিকট সম্যক উপকার লাভের আশা করা মুর্খতা মাত্র। কেনা নিজের জন্মভূমির উন্নতি করিতে, স্বদেশ ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয় ? স্বদেশ-প্রীতি ইংরাজের শীরায় শীরায় গ্রথিত; আমরাই কেবল ইংরাজী শিক্ষার ফলে পশু প্রকৃতি প্রাপ্ত করিয়া, জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়াছি; দেশকে ছারে খারে দিতেছি। আমরা বলি আমরা ইংরাজ জাতির অনুকরণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের কোন্ ভাল বিষয়টীর অনুকরণ করিতে আমরা শিখিয়াছি? যাহা শিখিয়াছি, যে অনুকরণ আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, যে অনুকরণ আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইবে, বই তাহাকে আমাদের সুফল লাভের কোনও আশা নাই।

অনেকে এই "স্বদেশী আন্দোলনকে" রাজার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছেন,

যাহারা এরূপ মনে করেন—তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমরা আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্যের আদর করিব, স্বদেশের স্বজাতির প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতি করিব, ইহাতে রাজার ক্ষতি কি এবং রাজার আইন-কানুন ইহার বিরুদ্ধে কেমন করিয়া স্থান পাইবে? আমরা যদি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশের জিনিস ব্যবহার করি, রাজার তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা কি? পুত্র-বৎসল পিতা যেমন পুত্রের আত্মোন্নতিতে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজা-বৎসল রাজাও তদ্রূপ প্রজার এরূপ হিতের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইংরাজ রাজা নিশ্চয়ই নিজের স্বার্থ বলিদান দিয়া প্রজার হিতার্থে যোগদান করিবেন। যে রাজা ইহার অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন তিনি প্রজাবৎসল নহেন, তিনি প্রজাপীড়ক। ইংরাজ কি এই শ্রেণীর রাজা হইতে চাহেন? ইংলণ্ডের আদর্শ মহারাণী ভারতেশ্বরীর ঘোষণাবাণী স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রজারঞ্জন করিতে চেষ্টা করিবেন।

এখন আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়াছে,—আমাদের ভবিষ্যৎ আশার স্বরূপ এই "স্বদেশী আন্দোলনকে" দৃঢ় রাখা, ইংরাজের সহিত বৃথা বিসম্বাদ করিয়া কোনও কাজ হইবে না। আমরা ত বাস্তবিক রাজদ্রোহী হইতেছি না, আমাদের নিজেদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতেছি মাত্র, ইহাতে রাজার সহিত মনোমালিন্য করিলে "স্বদেশী আন্দোলন" বিফল হইবে, বরং দেশের লোক যাহারা ইহার বিপক্ষ, যাহারা মুখে মধু অন্তরে গরল লইয়া এ কার্য্য পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত। যে সকল কুলাঙ্গার কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না, তাহাদিগকে সবশে আনিবার জন্য সমাজের কঠিন শাসন আবশ্যক হইয়াছে। তাহাদের পুরোহিত ধোপা, নাপিত এমন কি সেই স্বদেশ দ্রোহী-গণের সহিত বাক্যালাপ রহিত করিয়া, যাহাতে তাহাদের শাসন আমাদের সমাজের দ্বারাই সাধিত হয়, সে বিষয় আমাদের সকলের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা এ "স্বদেশী আন্দোলন" কিছুতেই স্থায়ী হইবে না। গৃহ-শত্রু অগ্রে দমন করিতে না পারিলে সমস্তই পণ্ড হইবে। পূজার পূর্ব্বে বিলাতী দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় যেরূপ বন্ধ হইয়াছিল, এখন আবার দেখিতেছি, ধীরে ধীরে চলিতেছে, অবশ্য কিছু অল্প ভাবে যাহা হউক, রাজার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া যাহাতে এই গৃহ শত্রুর শাসন হয়, আমাদের নেতৃগণের আর সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে; পুনর্ব্বার ছাত্রগণকে এবিষয়ে নিয়োজিত করিতে হইবে। ছাত্রগণ এ

কার্য্যে ব্রতী হইলে রাজা তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে স্থান দিবেন না, এরূপ নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যুবকগণই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা স্থল, রাজা যদি একান্তই এবিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষা মন্দির স্থাপিত করিতে হইবে। এখন ইংরাজী শিক্ষার নিয়ম প্রণালী আর আমাদের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না, এখন আমাদের দেশে পূর্ব্বের ন্যায় টোলের শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হইলে ভাল হয়। রাজা যাহা করেন করুন, আমরা বিনা কারণে যেন রাজার সহিত কলহ বিবাদ না করি, তাহা হইলে চির-রাজভক্ত ভারতবাসীর দুর্নাম ভিন্ন সুনাম হইবে না। রাজা যদি অগ্র পশ্চাৎ না বুঝিয়া কোন কার্য্য করেন, সে বিষয়ের ফলভোগ তাহারাই করিবেন, পরিণামে আমরা তাহার জন্য দোষী হইব না। এরূপে সকল দিক্ বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে তবে "স্বদেশী আন্দোলন চিরস্থায়ী হইবে ও তাহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি পথ পরিষ্কৃত হইবে, নতুবা হটকারিতায় কোন কাজ হইবে না, ইহা সকলেরই মনোমধ্যে স্থান দান করা উচিত।

সম্পাদক।

গীত।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠংরী।

বন্দে মাতরম্।

ভেঙ্গেছে স্বপন, গাহ প্রাণ ভরি,
১ জয় ভারত ভারত, বঙ্গ ভূমি।
জেগেছে আবার, প্রাণেতে সবার,
২ এ জগতে সার, শুধু মাতৃভূমি॥
সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামল,
৩ এবে দুঃখ বিভলা, সেই জননী।
দুঃখিনীর বেশ, যাতনা অশেষ,
৪ ভুগিছে স্বদেশ, দিবস যামিনী॥
বিদেশী বসন, আসন অশন,
৫ বিদেশী ভূষণ, বিদেশী কাহিনী।
বিদেশীর তরী, শোভে সারি সারি,
৬ ভারত জননী, বিদেশী ভরণী॥
বিন্ধ্য হিমাচল, সুমেরু অচল,
৭ গাহিত সতত, স্বদেশ বাখানি।
আনত আনন, হয়েছে এখন,
৮ করিয়ে স্মরণ, অতীত কাহিনী॥
যত দরশন, ছিলগো যখন,
৯ সুখেতে তখন, ভাসিত পরাণী।
সাম গান রবে, বনচারী সবে,
১০ গাহিত প্রভাতে, জাগাতে ধরণী॥
কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণে, যবে ঘোর রণে,
১১ বিক্রমে কাঁপাল, আর্য্য ভূমি।
কালিদাস কবি, নৈষধ, ভারবী,
১২ সাজাল যখন, কবিতা কামিনী॥

সন্ন্যাসী প্রবর, বুদ্ধ, শঙ্কর,
১৩ প্রবেশিল যখন, কর্ম্মভূমি।
ছিল গো তখন, প্রাণের রতন,
১৪ সোণার ভারত, জগত জননী॥
ফুরায়েছে সব, বিগত বিভব,
১৫ নাহিক সে সব, বিবশা জননী।
এত দিন পর, ভুলি ঘুম ঘোর,
১৬ জেগেছে বঙ্গের, কোটী প্রাণী॥
সবে প্রাণ খুলে, স্বদেশে পূজিলে,
১৭ ঘুচিবে আবার, তিমির রজনী।
যদি এইবার, হয় গো অসার,
১৮ একতা বন্ধন, সত্য বাণী॥
হাসিবে জগত, আবার ভারত,
১৯ ভুগিবে বিষম, অঙ্গহানী।
হিন্দু মুসলমানে, প্রফুল্ল বদনে,
২০ বল সবে, ভারত রত্নযোনী॥
হাতে, হাতে ধরি, গত কীর্ত্তি স্মরি,
২১ এস সবে পূজিহে, ধর্ম্মভূমি।
গভীরং আরাবং, বন্দে মাতরম্,
২২ নিনাদয়, জাগ্রত—মাতৃভূমি॥

আলোচনা সমিতি হইতে সংগীত।

আলোচনা সম্পাদক।

গীত।

খাম্বাজ-খং।

জেগেছে জননী আজি
তোদের কাতর ডাকে।
এসরে ভারতবাসী
সবে মিলে পূজি মাকে।
করেছিলি আবাহন
তাই বঙ্গে এল প্রাণ
সদয় দেবতাগণ
বঙ্গের ঘোর বিপাকে।
বিদেশীর মোহে ভুলি
দিওনারে জলাঞ্জলি
মেখোনারে মুখে কালী
হাসায়োনা আর লোকে।
যদি পার রাখিবারে
এ প্রতিজ্ঞা চিরতরে
উঠিবে ভুবন ভ'রে
যশোগীতি ঝাঁকে ঝাঁকে।
তোদের সম্মুখে আজি
'মহাকালী' বেশে সাজি
আসিয়াছে মহাশক্তি
ডেকেছিলি তোরা যাকে।
নির্ভয়ে সকলে মিলে
আজি তোরা ডাক মাকে।

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

ত্রুটী-স্বীকার—সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা-নিবন্ধন এবার পত্রিকা প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইল, তজ্জন্য গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

স্বদেশী সঙ্গীত

১। বঙ্গভূমি বন্দনা।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

নমো বঙ্গভূমি জননী।
শস্যসম্পদ যশঃ সৌরভ শালিনী
চারু শিল্পকলা শোভিনী।
বিস্তৃত নদনদীবাহিত পণ্য
সলিল সেকোর্ব্বরকেদার ধন্য
পুষ্প ফলার্চ্চিত মাধুরী রম্য
শৈলমুকুট কিরিটিনী।
কৃষীবল সঘন গৌরবমানিনী
অন্ন প্রদান কৃপা রক্ষিত ধরণী
কান্ত মনোহর প্রান্তর শোভিনী
অব্ধিচুম্বিত পাদদর্জিনী।
যুগে যুগে মা তুমি সুধীজন বন্দ্যা
সুষমাঙ্কিত তব প্রভাত সন্ধ্যা
মলয়ারুম্পিত শ্যামলাঞ্চলা নিন্দ্যা
স্নিগ্ধচন্দ্র তারামালিনী।
চৈতন্য প্রেমপূত প্রণারবর্দ্ধি
কোটি কোবেকগীত গর্বিত স্ফূর্ত্তি
দ্বাদশ ভৌমিক খ্যাত বীরকীর্ত্তি
জ্ঞানদর্শন প্রদর্শিনী।
পুণ্যসুখ মঙ্গলা মা তব রমণী
শঙ্খসিন্দূর শোভা পরব্রত ধারিণী
স্নেহকরুণাধারে প্রযত্ন বারিণী
সংসার লক্ষ্মী রূপিণী।
আপীন পুষ্ট স্তন্যামৃত বক্ষা
হিন্দু মুসলমান সন্তান রক্ষা
ভ্রাতৃপ্রণয় মর সংযম দক্ষা
পূত মৈত্রী প্রেমমন্ত্ররাগিনী।
বর্ণনাতীত তব গুণকোটি গরিমা
নির্জ্জিত সুরপুর বরিষ্ঠ মহিমা
আর্য্য সন্তানে দেহি প্রীতিভক্তি পরমা
শান্তিসম্মিলন সুখবর্দ্ধিনী।

গীত।

ললিত—আড়াঠেকা।

ভারতের দুঃখ নিশি পোহাইল এতদিনে।
সুখ-ভানু সমুদিল পুন সে ভাগ্য গগনে॥
দেখ এবে যত পুত্রে, বাঁধিবে একতা সূত্রে,
নাশিতে মায়ের দুঃখ, মাতিয়াছে মনে প্রাণে॥
না'হ আর হিংসা দ্বেষ, ঘুচায়ে মনের ক্লেশ,
(হল) ভাই ভাই এক ঠাঁই প্রাণের বন্ধনে।
কেঁদনা জননী আর, কেঁদনা মা অনিবার,
ভুলিয়ে বেদনা তার, আশীষ তব সন্তানে।
যেন তব আশীর্ব্বাদে, সুসিদ্ধি লভি অবাধে,
এই বর মাগি মোরা তব রাজীব চরণে।
স্বর্গাদপি গরিয়সী, তব পূত ক্রোড়ে বসি,
আদর করি মা যেন, অমূল্য দেশীয় ধনে।
অতীত গৌরব গাঁথা, বীণার ঝঙ্কার যথা,
শ্রবণ বীবরে পশি হৃদয়ে বাজে সঘনে।
তাই হয়ে দৃঢ় ব্রত, সাধিতে আপন হিত,
স্বদেশের যশোগান করি এস একতানে॥

সম্পাদক।

আলোচনা

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

নবম বর্ষ } অগ্রহায়ণ সন ১৩১২। { অষ্টম সংখ্যা

বিশ্বামিত্র।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

তবে সূর্য্যবংশে মহারাজ সগর এবং চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি ও ভরতকে কিয়ৎপরিমাণে সার্ব্বভৌমিক রাজশ্রীশোভিত বলা যাইতে পারে। কেননা ইহাঁদের বাহুবলে তদানীন্তন আর্য্য ও অনার্য্য রাজ্য সকল বিজিত হইয়া ইহাঁদিগকে পূজোপচার প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু ইহাঁদের প্রতিষ্ঠিত অধিরাজত্ব অধিকদিন অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। একটী মাত্র জয় পরাজয়ে প্রাচীন রাজন্যগণের ভাগ্যনির্ণয় হইত;—মহাপ্রতাপশালী নরপতি একবার মাত্র পরাজিত হইলে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতেন; তদীয় বিপুল প্রজাবল ও কোষবল তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না। সে যাহা হউক, সার্ব্বভৌমিক অধিরাজের জয়লাভে দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তাহার বহুল বিবরণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়বল চির-স্ফোটন-শীল ভীমাবর্ত্তময় সলিলরাশির ন্যায় নিত্য উদ্বেল হইতে উদ্যত;—যতক্ষণ তাহা বেলা অতিক্রম করিতে না পারে ততক্ষণ তীরস্থ উপবনরাজির উদারহাস্যময় সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীকে আনন্দিত করে,—ততক্ষণ সৈকতবাসী ঋষিগণের সামগানে, পঞ্চবটির পেশল হাস্য চারিদিকে স্ফারিত হইতে থাকে; ততক্ষণ ধর্ম্মশাসন ও সমাজবন্ধনের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু সেই সলিলরাশি একবার তীর অতিক্রম করিলে বন, উপবন, নগর, গ্রাম ভগ্ন,—বিচ্ছিন্ন,—বিধ্বস্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হয়; সকল বন্ধন শিথিল—সকল বাধা দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। নূতন সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জগতের যেরূপ বৈষম্যময় অবস্থা সংঘটিত হয়, ক্ষত্রিয়বলের দিগ্‌জয়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা

ঘটিতে দেখা যায়। উপযুক্ত দ্রষ্টা হইলে সেই বৈষম্যকে সাম্যে পরিণত করিয়া তৎসমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ওতপ্রোত উপকরণনিচয়দ্বারা নূতন সমাজ সংগঠিত করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা সামান্য শবসাধনা নহে। আর্য্যভারতে তিনটী মহাপুরুষ এইরূপ উৎকট শবসাধনার জন্য বিকট চেষ্টা করিয়াছিলেন;—বিশ্বামিত্র, শ্রীকৃষ্ণ ও চাণক্য। ইঁহাদের সেই মহতী চেষ্টা সকল হইয়াছিল কি না, আমরা ক্রমে ক্রমে যথাকালে তাহা দেখিব। মহাবীর বিশ্বামিত্র সেই উৎকট শবসাধনায় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি।

সুরিয়ো সুরধুনীর পবিত্র তীরভূমে মহোদয় রাজ্য অধিষ্ঠিত। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুশের দ্বিতীয় পুত্র কুশনাভ কর্ত্তৃক তাহা স্থাপিত। কুশনাভেরই রাজত্ব কালে বায়ুর অত্যাচারে তদীয় কন্যাগণের কুব্জতা সংঘটিত হওয়াতে মহোদয় নাম কান্যকুব্জে পরিণত হইল; কালে কান্যকুব্জই বলবৎ হইল। সংবেষ্টক অবস্থা নিচয়ের অনুকূল প্রভাব এবং রাজার সুশাসনগুণে কান্যকুব্জ রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চ সোপানে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার পরিসর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা একটী প্রধান রাজ্যরূপে পরিণত হইল। মহারাজ গাধি তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন। রাজা গাধির স্বভাব সত্ত্বগুণপ্রধান। স্বরাজ্যের গৌরববৃদ্ধি হইলেও, তিনি তাহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই,—আধ্যাত্মিক চিন্তাতেই তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজ্যের সুখসম্পদ তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে নাই। ক্রমে ঐহিক সুখে তাঁহার বিতৃষ্ণা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, রাজা গাধি সিংহাসনে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরথকে স্থাপিত করিয়া যোগে তনুত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে কান্যকুব্জরাজ্যে রাক্ষসের অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ হয়। যে সকল অনার্য্যজাতি ইতিপূর্ব্বে গাধির প্রচণ্ড বিক্রমে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় অবনত মস্তকে দূরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে অবসর পাইয়া রাজ্যে নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল। প্রজাকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল,—রাজ্যের শান্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গেল। রাজাকে সংসার ত্যাগে উদ্যত দেখিয়া চিন্তাকুল প্রজাবর্গ নানা অনুনয়বিনয় সহকারে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রাজা গাধি তাহাদের কাতর পরিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরথ তখন উপযুক্ত। রাজা সেই উপযুক্ত পুত্রকে সিংহাসনে অভিষেক করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিশ্বরথ পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। প্রজাবর্গ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বীরত্ব ও তেজস্বিতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছিল, সুতরাং মহারাজ গাধির পরলোকগমনে তাহারা বিশেষ ক্ষতিবোধ করিল না। বিশেষতঃ গাধি সংসার ত্যাগ করিবার সময়ে প্রজাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বামিত্র তৎপ্রদর্শিত পদবী অনুসরণ করিয়া রাজ্যপালন করিবেন এবং রাজাসনে অধিরোহণ করিয়াই অত্যাচারী রাক্ষসদিগকে দণ্ডিত করিতে উদ্যত হইবেন। বৃদ্ধ রাজার ঐ প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে প্রকৃতিবর্গ অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইয়াছিল। এক্ষণে বিশ্বামিত্রকে রাজসিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া, তাহারা আপনাদিগকে হতশত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। নবীন ভূপতি বিশ্বামিত্রও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে কৌষিকদিগের যোগ্য প্রতিনিধিরূপে পরিচিত করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজাসনে অধিরূঢ় হইয়াই তিনি দেশবৈরী ও মানববৈরী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরগণ প্রায় প্রত্যহই কান্যকুব্জে অতর্কিতভাবে আপতিত হইয়া অসতর্ক প্রজাদিগকে নিগৃহীত করিত। শত শত নিরীহ প্রজা তাহাদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি গৃহশূন্য হইয়াছে। বিশ্বামিত্র এক্ষণে সেই রাক্ষসদিগকে সংহার করিবার মানসে চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

আর্য্যাবর্ত্তের যে অংশে মহোদয় নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে সেরমাংসাশী অনার্য্যগণ তথায় বাস করিত। আর্য্যসাম্রাজ্য পশ্চিমোত্তর হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছিল। মনুর অযোধ্যা এবং পুরূরবার প্রতিষ্ঠানপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া মিথিলা, কৌশাম্বী, মহোদয়, ধর্ম্মারণ্য, গিরিব্রজ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কৈকয় ও মদ্রক প্রভৃতি অনেকগুলি আর্য্য রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত পঞ্চনদপ্রদেশে পঞ্চালিকা ও কাম্পিল্য, নর্ম্মদাতীরে মাহেষ্মতী, গুর্জ্জরে আনর্ত্ত বা কুশস্থলী এবং মধ্য প্রদেশে বিদর্ভ প্রভৃতি কতকগুলি রাজ্য বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্য রাজনৈতিক ব্যাপারে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও একই প্রকার সামাজিক নিয়মাদি পালন করিতে বাধ্য হইত। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ইহারা সকলে এক অভিন্ন সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আর্য্য জগতের এক প্রান্তে কোন অত্যাচার হইলে অমনি তড়িৎবেগে তাহার বিবরণ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। সকল রাজ্যেই তাহার আলোচনা হইত; সকল রাজাই সেই অত্যাচার ও তাহার বিহিত দণ্ডের কথা প্রজাদিগকে জানাইতেন। এইরূপে প্রায়ে

গ্রামে ইহার বৃত্তান্ত শতমুখে বিবরণ করিতে থাকিত। কিন্তু রাজনৈতিক কোন অভাবনীয় উপদ্রব বা বিপদ ঘটিলে, অন্যান্য রাজন্য তজ্জন্য কিছুই ক্ষতিবোধ করিতেন না। যাঁহার রাজ্যে সেইরূপ উপদ্রব বা বিপদ সংঘটন হইত, তিনিই তাহার ফলভোগী হইতেন; অপরে বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে, তাঁহাকে সাহায্য বা বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেন না;—নিজের রাজ্যে যাহাতে সেরূপ উপদ্রব না ঘটে, তদুপযোগী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। এইরূপে কত রাজা আর্য্য বা অনার্য্য জাতীয় শত্রুর অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত বা বিনষ্ট হইয়াছিলেন, কত সমৃদ্ধ আর্য্য রাজত্ব অসভ্য বর্ব্বরদিগের করতলগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অন্য কোন ক্ষত্রিয় রাজা ক্ষতিবোধ করেন নাই; হয় ত কেহই তজ্জন্য অণুমাত্রও দুঃখিত হয়েন নাই। সূর্য্যবংশীয় রাজা বাহুক অনার্য্য শত্রুদিগের অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত হইয়া নিদারুণ মনোবেদনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন ক্ষত্রিয় রাজাই তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয়েন নাই, কেহই তাঁহাদের দুঃখে একবিন্দু অশ্রুমোচন করেন নাই। প্রাচীন আর্য্য-রাজন্যগণের এইরূপ শোচনীয় অনৈক্যই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল কারণ। যদি তাঁহাদের আপনাদের মধ্যে বলবত্তম রাজাকে চক্রবর্ত্তীরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাবহনে নিরত থাকিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ক্ষত্রিয়বলের নিয়মিত কেন্দ্রীভবন দ্বারা তাহার দুর্জ্জয় প্রচণ্ডতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত, সে প্রচণ্ড বলের দিগ্দাহী তেজে অনার্য্যগণ পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইত এবং ভারতের ভাবী ইতিহাস কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হয় নাই; সামাজিক ও ধর্ম্মবন্ধনে ভারতীয় আর্য্যরাজন্যগণ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইলেও রাজনৈতিক একতা তাঁহাদিগকে বন্ধন করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এ কঠোর শবসাধনায় অনেকেই প্রবৃত্ত হয়েন নাই, দুই একজন প্রবৃত্ত হইয়াও সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন নাই।

নরমাংসাশী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বামিত্র সসৈন্যে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। নৃশংস অনার্য্যেরা তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই গৃহদ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গম গিরিগহনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই সময়ে কীকটদেশে প্রমগন্দ নামে এক দস্যুপতি ছিল; তাহার দুর্দ্ধর্ষ অনুচরগণ পার্শ্ববর্ত্তি দেশ সমূহে আপ্লুত হইয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিত। দস্যুপতি প্রমগন্দের নাম শুনিলে অনেক গৃহস্থই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্র সেই প্রমগন্দের দমন করিবার

নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কি না, তাহার কোন পরিচয় কুত্রাপি পাওয়া যায় না; তবে ঋগ্বেদে প্রমগন্দ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে এই মাত্র জানা যায় যে রাজা বিশ্বামিত্র নিজ ভুজবলে যাহা পারেন নাই, ঋষি বিশ্বামিত্র তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন *।

দস্যুদলনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বিশ্বামিত্র ক্ষুব্ধচিত্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার জয়াভিলাষ পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি স্বরাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড অক্ষৌহিণী লইয়া দস্যুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন; তাঁহার সমভিব্যাহারী বিশাল সেনাদলও উৎকট জিগীষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্বৃত্ত দস্যুগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়াই নিবিড় গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইল। সে দুর্গম প্রদেশে বিশ্বামিত্র প্রবেশ করিতে পারিলেন না; অগত্যা তাঁহাকে প্রতিগমন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিল না। তাহারা যুদ্ধের জন্য গমন করিয়াছিল, বনভ্রমণের জন্য নহে; সুতরাং তাহারা যুদ্ধ করিয়াই প্রতিগত হইবে। চতুর বিশ্বামিত্র তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া তাহাদিগকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখিতে মনস্থ করিলেন। সে কার্য্য সহজ নহে, তাহা বিপুল আয়োজন ও বিক্রম সাপেক্ষ;—তাহা দিগ্বিজয়।

পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া যুবক বিশ্বামিত্র ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা একবার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা রাজনীতির গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া রাজন্য সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতের অনেক স্থলেই আর্য্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত,—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ, দাক্ষিণাত্যের দুই এক স্থান—সর্ব্বত্রই আর্য্য নৃপতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; আর্য্যের সভ্যতাস্রোত সর্ব্বত্রই তরতর বেগে প্রবাহিত। ধর্ম্মবিষয়ে প্রায় সকলেই এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে গ্রথিত, কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে কাহারও একতা নাই, প্রায় সকল রাজাই পরস্পরের বিরোধী। অনেকের কোষবল অপরিমেয়, প্রতাপ অসহনীয়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, একতার অভাবে সেই কোষবল ও প্রতাপ দেশবৈরীর সম্মুখে একবার পর্য্যুদস্ত হইলে আর সহজে

* কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো
না শিরং দুহে ন তপন্তি ঘর্ম্মম্।
আনোভর প্রমগন্দস্য বেদো
নৈচাশাখং মঘবন্ রন্ধয়া নঃ ॥ ১৪ ।
ঋগ্বেদ, ৩ অং। ৩ মং। ৩ সূং।

পুনরুত্তেজিত হইত না; অপর কোন নৃপতিই তাহার উদ্দীপনে চেষ্টা করিতেন না। সকলেই আপনার লইয়া ব্যস্ত, পরের দিকে চাহিয়া দেখিতেন না। ভারতের নানাস্থানে আর্য্যের জাতীয় জীবন পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, এক একটী তেজোবহ্নিকণা ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সন্ধুক্ষিত হইতেছিল; উপযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিলে সেই বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনকে একত্রিত করিয়া এক প্রচণ্ড মহাপ্রাণের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, বিক্ষিপ্ত অগ্নিকণাকে একত্র মিলিত করিয়া বিশ্বদাহী প্রলয় দাবানলের আয়োজন করিতে সক্ষম হইতেন। চতুর বিশ্বামিত্র এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেন; তিনি যত চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা ততই অধিকতর স্থায়ীভাবে তাঁহার মানস-দর্পণে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি কি চেষ্টা করিলে সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবন ও বিক্ষিপ্ত অনলকণা একত্রিত করিয়া এক প্রচণ্ড মহাপ্রাণ ও প্রলয় দাবাগ্নির সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে,—ইহা কঠোর শবসাধনা,—ভীষণ মহাব্রত। এ কঠোর শবসাধনায় সিদ্ধ হইতে হইলে, এ ভীষণ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে গেলে বক্ষ পাতিয়া শত বজ্রপ্রহার সহ্য করিতে হইবে, সহস্র ঝঞ্ঝাবাত ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে হইবে। বিশ্বামিত্র কি তাহা পারিবেন না? সম্মুখে অমরত্বলাভের মহাসুযোগ;—তিনি কি ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন? তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় এই মহাসুযোগ সবলে আক্রমণ করিয়া আপনাকে অমর করিবেন; নতুবা নগণ্য জলবুদ্বুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অলক্ষ্যে কালস্রোতে মিশিয়া যাইবেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রীরামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে একমাত্র সগর ব্যতীত আর কোন আর্য্য নরপতি সার্ব্বভৌমিক অধিপতি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কি না, পৌরাণিক গ্রন্থে তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অবশ্য মহারাজ যযাতি ও ভরতকেও কিয়ৎ পরিমাণে সার্ব্বভৌমিক রাজশ্রীশোভিত বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মহাবীর বিশ্বামিত্র, শ্রীকৃষ্ণ ও চাণক্য যে মহতী শবসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের ও পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণের মধ্যে কাহারও সেরূপ ভীষণ প্রবর্ত্তনা দেখা যায় না। বিশ্বামিত্র দেখিলেন যে, ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিক রাজচক্রবর্ত্তী হইতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না। কিন্তু সহজে রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া যায় না;—এই স্পৃহনীয় অত্যুচ্চ সম্মান লাভ করিতে হইলে অগ্রে ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য সকল নরপতিকেই পরাস্ত করিয়া

অধীন করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। আর্য্য ও অনার্য্য ভারতের কোথায় কোন রাজার কিরূপ সেনা ও কোষ বল, কাহাকে পরাস্ত করিতে কতটুকু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে, তাহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন না; সুতরাং অগ্রেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের আবশ্যকতা বুঝিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সকলের রাজ্য ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য সুমহৎ; তাহা সিদ্ধ হইলে ভারতের এক মহোপকার সাধিত হইত, ভারতীয় রাজতন্ত্রে এক প্রচণ্ড বল প্রোক্ষিত হইত; কিন্তু ভারতবাসীর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তিনি রাজচক্রবর্ত্তীর পদলাভের আশায় ও ভারতীয় আর্য্য রাজন্যগণের একীকরণের বাসনায় যখন নগর ও পত্তনাদি বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময়ে অদৃষ্টদেব অলক্ষ্যে বসিয়া তাঁহার জন্য কি অদ্ভুত ভবিতব্যতার সূচনা করিতেছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। একটী রাজনৈতিক উৎকৃষ্ট মহা সমস্যার মীমাংসা করিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড সামাজিক শবসাধনা যে, তাঁহারে উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল, তাহা বিশ্বামিত্রের তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবের বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদের সূচনা হয়। সেই সামান্য বিবাদের ক্ষীণ ছায়া নির্দ্দেশ করিয়া মহর্ষি চ্যবন একদা রাজা কুশিককে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ এবং তাহা হইতে কুলসঙ্কর উপস্থিত হইবে। তোমার পৌত্র সেই ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়া তেজোবীর্য্য সমন্বিত হইতে পারিবে। কি কারণে ব্রহ্মক্ষত্রে বিরোধ সংঘটিত হয়, ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইয়াছে; মহাত্মা বশিষ্ঠের জীবনী আলোচনা করিবার সময় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। বিশ্বামিত্র যে ভীষণ সংঘর্ষ হইতে কালানলরূপে উদ্ভূত হয়েন, রাজা বেণ ও নিমি সর্ব্বপ্রথম তাহার সূচনা করেন; তাহার পর নহুষ, সুদাস ও সুমুখ প্রভৃতি নরপতিগণের চেষ্টায় সেই বিরোধের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাঁহারা সুশৃঙ্খলরূপে ও নিয়মিত উপায়ে সেই বিবাদবহ্নি উত্তেজিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চেষ্টা নিতান্ত মৃদু, সীমাবদ্ধ ও অপ্রগাঢ়; তাহা তাঁহাদের নিজ নিজ স্বার্থের সহিত জড়িত। কোন বিশেষ বিশেষ স্বার্থের অনুরোধে তাহার উত্তেজনা এবং সামান্য ব্যাঘাত বা প্রতিরোধেই তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। তাহার পর সমাজের বিরাটদেহে তাহার কোন নিদর্শনই স্থান

পায় নাই। কিন্তু বিশ্বামিত্রের চেষ্টা সম্পূর্ণ অতিমানুষী কঠোর শবসাধনা। ভীষণ বজ্রানল ও তরল বাড়বাগ্নির ন্যায় তাহা সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া বিরাট সমাজশরীরকে আমূল আলোড়িত ও প্রদাহিত করিয়াছিল। সেই বিশ্বদাহী ভয়াবহ কালাগ্নির প্রচণ্ড তেজে দেবতারাও তাপিত হইয়াছিলেন; সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহার প্রচণ্ডতা সমভাবে ছিল; লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহাতে বিদগ্ধপাপ হইয়া অপূর্ব্ব পবিত্রতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বর্ণভেদ প্রথার ক্রমিক পরিপুষ্টির সহিত ব্রাহ্মণত্ব পরম্পরাপ্রাপ্ত কৌলিক স্বত্বরূপে পরিগৃহীত হইলে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল; ভণ্ড ও স্বার্থপরের শঠতার সম্মুখে অকপট ও উদার ব্যক্তির ধর্ম্মানুমোদিত উন্নতিস্পৃহা প্রতিহত হইয়া পড়িল; স্বেচ্ছাচারের আবিল স্রোতে ন্যায়ের স্ফাটিক স্বচ্ছতা নিমগ্ন হইল; প্রভুতার অযথা পরিচালনে, অধীনস্থ উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের মঙ্গলোপায় সমূহ নিষ্পিষ্ট, দলিত ও সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। যাহারা সক্ষম, কঠোর প্রতিবাদ করিল; কিন্তু অক্ষম ব্যক্তি সকলে নীরবে সহ্য করিয়া স্বার্থসন্ধির উপযুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এইরূপে দলে দলে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল; ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত ও বলবত্তর হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গার করিতে লাগিল। সেই সমস্ত বিস্ফুর্য্যমাণ অনলকণা ক্রমে ক্রমে একত্রিত হইয়া ভয়াবহ অনলকুণ্ডে পরিণত হইল। তাহার প্রচণ্ড তেজে হিন্দু সমাজ দগ্ধ এবং আর্য্যের গৌরব গরিমা ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল।

ব্রাহ্মণগণই তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম সম্মান সম্ভ্রম সম্ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের অপ্রতিম আধিপত্যের সম্মুখে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও অবনত হইয়াছিল, দেবতাদিগের অমর স্বত্বাধিকারও ভ্রূভঙ্গের বিলাসলীলার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। গৌরব ও সম্ভ্রমে তাঁহারা ভূদেবদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বরং অনেক দেবতা ব্রাহ্মণের সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত বিবিধ উপায়নের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য ব্রাহ্মণের এই অসীম উচ্চতা তাঁহাদের নিজ অদম্য অধ্যবসায় ও অলৌকিক স্বার্থত্যাগের সাহায্যেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। সত্য বটে, ব্রাহ্মণই জগতে সভ্যতার প্রথম পথপ্রদর্শক, জ্ঞানের আদিম প্রচারক, ধর্ম্মের আদ্য প্রবর্ত্তক, কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের মহীয়সী প্রতিভা অজেয় যুগধর্ম্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। বিবেকের চরণতলে স্বার্থের পূর্ণ বলি দিয়া বিশ্বের মঙ্গলোদ্দেশে তাঁহারা অতি লোভনীয় ভোগলালসা অম্লানবদনে উপেক্ষা করিয়াছেন, সমাজবন্ধন দৃঢ়

রাখিবার জন্ত নানা কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু নরদেহ ধারণ করিয়া তাঁহারা মহাকালের অপ্রতিবিধেয় অমর লীলার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় আর্য্যসমাজে লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রাম বৃদ্ধি পাওয়াতে কিরূপে নানা প্রকার অনর্থ প্রবেশলাভ করিল, বিশেষ বিশেষ ঋষিদৃষ্ট মন্ত্ররহস্য তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততিগণের চির-ন্তন স্বত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে কোন কোন ব্রাহ্মণবংশের স্বার্থসিদ্ধির কিরূপ সুযোগ অব্যাহত রহিল, ইতিপূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র-জীবনের এই অংশ ধর্ম্ম্য অবদানের অঙ্গীভূত; এইজন্য তাহা সবিস্তারে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। বিশ্বামিত্রের রাজনৈতিক জীবনী এই স্থানে পরিসমাপ্ত হইল; তিনি যে অলৌকিক বীরত্ব ও লোকবিস্ময়করী অতিমানুষী প্রতিভার সাহায্যে জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মবীর বিশ্বামিত্রের জীবনীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অনুশীলন করা যাইবে। এ অংশটুকু সেই মহাপুরুষের অমরজীবনের সূচনা মাত্র।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যভূষণ।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ-রমণী।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আজ বঙ্গরমণী সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। স্বামী পুত্রের এ আন্দোলনে তাঁহারা যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছেন এবং এ ব্রত পালন করিবার জন্য, এ সঙ্কল্প অটুট অটল রাখিবার জন্য যেরূপভাবে তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিতেছেন, তাহাতে প্রকৃতই নিরুৎসাহের উৎসাহ সঞ্চার হয়, স্বদেশ-দ্রোহীর প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! আমার জ্ঞাতসারে যে সমুদয় মহাপ্রাণা রমণী এইরূপে স্বামী পুত্রকে নিজ হস্তে স্বদেশ সেবাব্রতায় দীক্ষিত করিয়াছেন, নিজ উৎসাহ তেজে তাঁহাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, আমি তাহাদিগের চরণে শ্রদ্ধাভাবে নত হইয়াছি। আমার একজন বন্ধু এই আন্দোলনের সময় একজোড়া বিলাতী চুড়ী নিজ গৃহিণীর জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বে ঐ চুড়ী বড়ই পছন্দ করিতেন। যখন বন্ধু চুড়ী নিজ গৃহিণীর হস্তে প্রদান করিলেন, তখন তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন,—এ কি! তোমরাই স্বদেশ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছ, আবার তোমরাই সে ব্রত ভঙ্গ করিতেছ? 'ছি'! বন্ধু কিঞ্চিৎ অপ্র-

তিত হইয়াও বলিলেন, "তুমি উহা বড় পছন্দ কর, আর হাতেও কিছু নাই ভাই!"—গৃহিণী উত্তর করিলেন, "যখন বুদ্ধি নাই, যখন জানি নাই—তখন পছন্দ করিতাম বটে, কিন্তু জন্মভূমির পদে উহা দিয়াছি! হাতে কিছু নাই কেন? শাঁখা আছে, লোহা আছে, এই আমার জন্ম জন্ম থাকুক। তুমি ও-চুড়ী ফিরাইয়া দাও।" এইরূপ আরও অনেকবাবুর শ্রীশ্রীগতপূজার সময় বিলাতী কাপড়, জামা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন, নিজ নিজ সন্তানকে পূজার কাপড় দেন নাই, তথাপি বিলাতী কাপড় পরান নাই! যাঁহারা আপাদমস্তক বিলাতী সাজসজ্জায় সজ্জিতা হইতেন, আজ তাঁহারা একেবারে বিলাতী পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন, "কঠিন ও কোমলের কেমন আশ্চর্য্য সম্মিলন-রমণী-হৃদয়।" তাঁহারা তাঁহাদের দৃঢ়তা দ্বারা আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছেন। তাঁহারা যেন বলিতেছেন, "ভাই! তোমরা আমাদিগকে অবলা, দুর্ব্বলা, ভূষণপ্রিয়া, বিলাসিনী ইত্যাদি বল, কিন্তু এই দেখ, আমরা সব ছাড়িয়াছি, আর তোমরা পারিবে না!"

বাস্তবিক আমি এই সব রমণীগণের মহাপ্রাণতার একান্ত মুগ্ধ, কিন্তু আমি বিস্মিত নাই! রমণীগণের পক্ষে একাগ্রতা ও দৃঢ়তা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এমন রমণী দেখিয়াছি যিনি ৺জগন্নাথক্ষেত্রে ফলবিশেষ উৎসর্গ করিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তারপর রোগের সময় সাংঘাতিক অবস্থাতে যখন চিকিৎসক সেই ফলের রস ব্যবস্থা করিলেন, তখন তিনি পরীক্ষার ভাবে বলিলেন, উহা আমি বর্জ্জন করিয়াছি, যদি উহা দ্বারা আমার জীবন রক্ষিত হয়, তবে স্বহস্তে সে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিব!" এরূপ দৃঢ়তা হিন্দুস্থানের রমণীতেই সম্ভব। যে সমুদয় রমণী এইরূপেএই পুণ্য স্বদেশীব্রতগ্রহণে আমাদিগের সহায় হইয়াছেন, আমাদিগকে শক্তিমান করিতেছেন, আমাদের ত্রুটি, বিচ্যুতি দেখাইয়া দিয়া আমাদিগকে প্রতিজ্ঞার পথে ঠিক রাখিতেছেন, তাঁহাদিগকে যে আমরা কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, তাহা ভাবিয়া পাই না! তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা নাই। অথবা তাঁহাদিগকে বলিব, "মাতৃগণ, তোমরা মহাশক্তির অংশভূতা—আমাদের সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমাদের শ্রম-ভ্রম-হারিণী, হৃদয়ের শক্তিধারা-বাহিনী, তোমাদের শক্তি অনন্ত, তোমাদের প্রভাব অসীম, আমাদিগকে উপযুক্ত করিয়া দেওয়াইত তোমাদের কার্য্য! তোমরাইতো আমাদের হৃদয়ে প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়ার উদ্দীপনা কর, —তোমরাইতো আমাদের শক্তি, অতএব তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা তোমাদেরই কাজ, তাহা তোমাদেরই নিকট

আশা করিতে পারি, তোমরা এইরূপই করিতে থাক, এইরূপ উৎসাহ উদ্দীপনায় আমাদের হৃদয়ে শক্তি জাগ্রত রাখ, প্রতিজ্ঞা অটল রাখ!

আর 'মা' মহাশক্তির অংশভূতা সংসার-শ্রীরূপিণী কল্যাণধারা-বর্ষিণী, অমৃতধারা-পূর্ণ হৃদয়া গৃহলক্ষ্মী মাতৃগণ, তোমাদের চরণে এই নিবেদন—তোমরা সকলেই এই শুভ সংকল্পের মহত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার সাধন করে আমাদের সহায়, আমাদের উৎসাহ-দাত্রী হও! যাঁহারা এখনও ইহা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন! মা, তোমরা আমাদিগকে অনেক শিক্ষা নিজ নিজ জীবনের কার্য্যেই দিতেছ! তোমরা সহমরণে জ্বলন্ত চিতায় হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আত্মোৎসর্গের পবিত্র মহিমা আমাদিগকে শিখাইয়াছ,—বৈধব্য-অবস্থায় আজীবন কঠোর সংযমের সহিত পূতব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে আমাদিগকে পবিত্র প্রেমের আদর্শ শিক্ষা দিতেছ—রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত খাটিয়া এবং নিজ নিজ আহার ব্যবহারের বিষয়ে একান্ত উদাসীন থাকিয়া পরার্থপরতার চরম দৃষ্টান্তে আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছ, অন্যের দুঃখের নয়ন-অশ্রু সিক্ত করিয়া আমাদিগকে সহানুভূতির পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছ, কত বলিব, কত দেখাইব মা! অতএব তোমাদিগকে একথা বেশী বলিতে হইবে কেন? এস মা, তোমরা সকলে মিলিয়া আজ একপ্রাণ হইয়া এই শুভ স্বদেশী সংকল্প ও আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সফলতা প্রদান কর! তোমরা মা কত ব্রত নিয়ম উপলক্ষে কতই না কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাক, 'সর্ব্বজয়া' ব্রতানুষ্ঠানকারিণী তোমাদের অসাধ্য কঠোরতা আর কি আছে মা! এস মা! যদি তোমাদের স্বামীগণ, পুত্রগণ তোমাদের কোমলাঙ্গে মোটা বস্ত্র দিতে দ্বিধা বোধ করে, তোমরা প্রফুল্ল বদনে সাগ্রহে সে বস্ত্র তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লও, বল মা তাহাদিগকে "তোমরা চট আনিয়া দাও, তাহাও সানন্দে পরিধান করিব! কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা করিও না! বল মা, বল, "তোমরা সূক্ষ্ম কাপড় আনিও না, ফরাশডাঙ্গা, শান্তিপুরী চাই না, দেশী কলের মোটা কাপড় আন—মাথায় তুলিয়া লইব!" আমাদের হৃদয় তোমাদের এ উৎসাহ বাণীতে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন হউক, মা, শিশুগণের হৃদয়ে স্বদেশ ও স্বদেশী প্রীতি তোমরাই উদ্দীপিত করিবে—যাহাতে আমা-দের সন্তানগণ মাতৃভূমির নামে মস্তক শ্রদ্ধাব-নত করে, স্বদেশী বস্ত্র অতি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে, বিদেশী সাজ, বিদেশী সজ্জা লজ্জাকর বলিয়া জ্ঞান করে; তাহা তোমা-দেরই হাতে! তোমাদের পূতবক্ষের অমৃত ভাণ্ডক্ষরিত ক্ষীরের পরিবর্তে যেন স্বদেশ

প্রেমাবৃত নিঃসৃত হইয়া শিশুগণের হৃদয়ের রক্তে মিশ্রিত হয়! 'বন্দে মাতরম্' যেন তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়! যাহাতে তাহারা এ মন্ত্র না ভুলিয়া যায়, তাহার জন্য তোমাদের প্রতি নিদ্রাকর্ষক গীতিতে সে প্রীতি ধ্বনিত হউক, তোমাদের প্রতি স্নেহ আহ্বানে সে মাধুরী ছুটিয়া উঠুক, তোমাদের স্বর্গীয় জ্যোতি বিভাসিত বদনমণ্ডলে স্বদেশ প্রীতির পুণ্যপ্রভা বিকশিত হউক—সে বিমল দীপ্তিতে আমাদের চিরশান্তিময় গৃহ উদ্ভাসিত হউক! ফেল মা, ফেলে দাও দূরে তোমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে ঐ সব দারিদ্র্যবিধায়ক অলক্ষ্মীর অনুচর সাজ সজ্জা তৈজস-অলঙ্কার। তোমাদের পুণ্যভবন হইতে ঐ সব অপবিত্রতাকে মার্জ্জন করিয়া ফেল! তোমাদের পবিত্র অঙ্গ হইতে ঐ সব অনাবশ্যক অর্থনাশক, বহু অনিষ্টবিধায়ক জঞ্জালগুলি খসিয়া পড়িয়া তাহার প্রকৃত শোভা আমাদিগকে দেখিতে দিউক! তোমাদের উৎসাহবাণী আমাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক, তোমাদের মঙ্গল হস্ত আমাদের ললাটে স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র তিলক পরাইয়া দিউক —তোমাদের পুণ্যকণ্ঠে আমাদের গৃহকুটিরে শান্তি, সুখ ও মঙ্গল আবাহন করিয়া অনবরত ধ্বনিত হউক—'বন্দে মাতরম্'।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

স্বদেশী সঙ্গীত।

২। উদ্দীপনা।

(ক) গৌরী মিশ্র—একতালা।

দিন চলে' যায় মাস চলে' যায়
বরষ মিলায় বাতাসে।
পড়ে' থাকে যারা, মরে' থাকে তারা
কাঁদিতে শুধুই হতাশে।
বৃথা কল্পনায় কাটালে সময়
কিবা ফলোদয় বলনা।
দিন যাবে যাক্ গায়ে লেখা থাক্
জীবনের দৃঢ় সাধনা।
জড়পিণ্ড নয় জীব কর্ম্মময়
তবে কেন আর অলসে
অমূল্য জীবনে করম সাধনে
উদ্যম বিহীন অবশে।
কর্ত্তব্যের ভার লহ করি সার
চও আগুয়ান্ হরষে।
নবোদ্যমে মাতি উন্নতির ভাতি
দেখাও বরষে বরষে।
(চাঁদপুর ছাত্রসভার অধিবেশনে গীত)

(খ) রামপ্রসাদী সুর।

তোরা আর ঘুমাবি কত।
সেই ত্রেতার কুম্ভকর্ণের মত।
ভাঙ্গবে না কি মোহনিদ্রা
থাক্‌বি শুয়ে অবিরত।

দেখ্‌রে জেগে সাড়া দিচ্ছে
সবাই ঘুমিয়ে ছিল মানুষ যত।
চোরে লুটে নিলরে সব ধন রত্ন ছিল যত
(মায়ের সোণার ভাণ্ডারে রে)
(ঐ দেখ্‌) মায়ের বুকের রক্ত শুষে নিল
বিদেশী জলৌকা শত।
(তোমা) ঘুমের ঘোরে গরব ভরে
স্বপন্ দেখিস্ অবিরত।
(সে যে) স্বপন স্মৃতি জাগিয়ে নিতি
তার দোহাই আর দিবি কত।
আর ঘুমনয় জাগরে ভাই
দেখি একবার জাগার মত।
(একবার) মা, মা, বলে কোমর বেঁধে
কাজে লাগো দিন যে গত।

লজ্জা নিয়ে বসেন পাটে
দেখেও তা দেখিনা ভাই।
(মোরা) মায়ের ঘরের সোণা ফেলে
বিদেশী রাং পরি গলে
ছি, ছি, ছি! তাই দেরে ফেলে
দেখে লাজে মরে যাই।
ওই দেখ ভাই ডাকেন মায়
"আয়রে বাপ্ সব ঘরে আয়,
কলঙ্ক লেপিস্‌নে আর গায়
মেখে সব বিদেশী ছাই।"
আয়রে ভাই সব ফিরে ঘরে,
মায়ের কোলে গরব ভরে
মায়ের ছেলে মা, মা, বলে
মার নামে জগৎ মাতাই।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ঘর থাক্‌তে কেন পরে দ্বারে
বসন ভূষণ মাগ্‌তে যাই।
(ওরে) কল্পলতা মা যে মোদের
যখন যা চাই তাইতো পাই।
মায়ের ক্ষেতে সোণা ফলে
হীরার স্রোত ওইমায়ের জলে
মায়ের গাছের মিষ্টি ফলে
কি সুতার আর তুল্য নাই।
মায়ের কাপাস মায়ের পাটে
মায়ের বাজার মায়ের হাটে

প্রার্থনা।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

অজ্ঞান সন্তান সুখ দুঃখ কিছু জানিনা
জননী জানি কেবল।
তাঁর মলিন মুখ দেখলে কাঁপে বুক
চোখ্ ফেটে বয় ধারা অবিরল।
উৎসব আমোদ কিছু নাই
ভালতো লাগে না পূজার উপহার
মায়ের মুখ চেয়ে বেড়াই মলিন হয়ে
মা, মা, বলে কাঁদি ধরিয়া অঞ্চল।
কবে আমরা সব হয়ে সুসন্তান,
মায়ের দুঃখ দৈন্য কোর্‌বো অবসান

মাথায় তুলে লব মায়ের যত দান,
সে পদে অর্পিব জ্ঞান, বুদ্ধি, বল।
কৃপাময়ে নমি ভক্তি নতশিরে
এ দীন যাচ্না যেন গো অচিরে
মায়ের মুখে হাসি, দেখে সুখে ভাসি
শিরে ধরি' যেন কল্যাণ মঙ্গল।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভক্তির জন্ম।

প্রথম অধ্যায়।

অকপট অনুরাগ ভিন্ন, ভগবদ্ করুণা লাভ হয় না। মানসিক বৃত্তিনিচয় বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট রাখিয়া, বক-ধার্ম্মিকের ন্যায় মুখে কেবল "হরিবোল, হরিবোল" বলিলে, অনন্ত জীবনেও উদ্ধারের আশা নাই। ভগবদ্-সাধনমার্গ সমূহ মধ্যে ভক্তিমার্গই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও বিঘ্ন-বিরহিত,—তাই সকল শাস্ত্রে এবং সকল সাধকমুখে উহার ভূয়সী গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির-আসন বহু উচ্চে অবস্থিত। যেহেতু, প্রকৃত জ্ঞানলাভ, বড়ই দুরূহ এবং দুরারাধ্য। এ সংসারে প্রকৃত জ্ঞানী বড়ই বিরল। পক্ষান্তরে, ভক্তির সহজ-সাধ্য সুগম পথ অবলম্বন করিলে, সাধক বহু অনায়াসে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইতে পারেন। জ্ঞানের সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অভ্রান্ত হয় না; তাই অনেকে বলিয়া থাকেন,—"জ্ঞানকে কখন বিশ্বাস করিও না।" সিকতাময় ক্ষেত্রোপরিস্থ সৌধের স্থায়িত্ব যেমন অনিশ্চিত, জ্ঞানের সিদ্ধান্তেরও প্রায় সেইরূপ নিশ্চয়তা নাই। কল্য কোন জ্ঞানী, যে বিষয় অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, অদ্য অন্য একজন জ্ঞানী তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আর একটি নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বুঝাইলেন যে, এইটিই প্রকৃতপ্রস্তাবে অভ্রান্ত। কিন্তু অদ্যকার সত্যটিই যে নিরঙ্কুশ, এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই সত্যটিও আর একদিন অন্য কোন জ্ঞানী কর্ত্তৃক অসার প্রতিপন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে না? ফলতঃ জ্ঞানের এই ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে জ্ঞানানুশীলনকারীদের অনেক সময়ে জ্ঞানবাদের উপর বিশ্বাসবিহীন ও বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়।

যে বসুন্ধরা সেই অনন্ত জ্ঞানময় বিরাট-পুরুষ সৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং এই পরি-দৃশ্যমাণ ক্ষুদ্র বসুন্ধরার একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি, এখন যাহাদের কল্পনামার্গের সুদূর প্রান্তে সমুপস্থিত হইতে

নিতান্ত অশক্ত, এই ক্ষুদ্রতম বসুমতীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবীয় শক্তি কোন্ শক্তিবলে সেই বিরাট মহীয়সী শক্তির মহত্তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ হইবে? যাহার অনন্ত জ্ঞানবলে অনন্ত আকাশমার্গে অনন্ত গ্রহ পরম্পরা অনুক্ষণ অনন্তপথে ধাবমান রহিয়াছে, যাঁহার অনির্বচনীয় মহিমাচ্ছটার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনস্বরূপ অদ্ভুত তেজাধার দিনমণি, অনুদিন আকাশমার্গে বিরাজমান থাকিয়া সৃষ্টিজগতের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য বিধান করিতেছেন, যাঁহার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় এবং অপ্রতিহত শাসনগুণে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন যথাক্রমে ও যথানিয়মে গমনাগমন করিতেছে, যাঁহার নির্দেশক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ষড় ঋতুসমূহ পর্য্যায়ক্রমে সমুপস্থিত হইতেছে, যাঁহার আদেশ অনুসারে বারিধি বক্ষ হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে এবং অলক্ষ্য শক্তিবলে বাষ্পরাশি উদ্গত হইতেছে এবং সেই বাষ্পরাশি আবার মেঘাকারে পরিণত এবং দিগদিগন্তে বিস্তারিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে অজস্রধারে সুধারাশি সিঞ্চন পূর্ব্বক জীব, উদ্ভিজ্জের জীবনীশক্তি সংরক্ষণ, সংপোষণ ও সংবর্দ্ধন করিতেছে, সেই অশেষ-মহিমময় মহামহেশ্বরের মহিমা-সীমা কীটানুকল্প ক্ষুদ্র মানব, কোন্ জ্ঞানবলে নির্ণয় করিবে?

ভাই জ্ঞানগর্ব্বি, বল দেখি, তোমার জ্ঞানের মাত্রা কতটুকু? বল দেখি, সৌরজগতের সকল গ্রহের কথা বলিতে চাহি না,—বল দেখি, তোমার আধারভূতা এই ধরিত্রী সম্বন্ধেই বা তুমি কতটুকু তথ্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছ? শুনিতে পাই, উন্নত পর্ব্বত-শিখর হইতে গভীরতম রত্নাকরগর্ভের কিঞ্চিৎ মাত্র বিবরণ তোমার জ্ঞান-নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু উন্নত পর্ব্বতচূড়া হইতে সুগভীর সমুদ্রগর্ভের পরিমাণ কয়েক মাইল মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব যদি পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ আট সহস্র মাইল অবধারিত হইয়া থাকে, তবে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হইতেছে, তোমার কাদামাখা মাত্র সার হইয়াছে—প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় এখন তোমার বহুদূরে পড়িয়া আছে।

ভাই জ্ঞানী, তোমার অনুমান সূত্র পরিত্যাগ করিয়া বল দেখি, কি কৌশলে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? কি কৌশলে ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে?—কি কৌশলে ঐ পঞ্চ মহাভূতের যোগ বিয়োগে অসংখ্য, অনন্ত, অপ্রমেয় জীব, উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় হইতেছে?—কি কৌশলে অণুপ্রমাণ বীজ হইতে অভ্রস্পর্শী মহাদ্রুমের উৎপত্তি হইতেছে এবং কি কৌশলেই বা জড়ময়-বপু দেহীদিগের কলেবরে, বিচিত্রজ্ঞানময়ী চৈতন্য-শক্তির আবির্ভাব হইতেছে? হে ভাই জ্ঞানি! যদি তুমি এই সকল বিষয়ের

প্রকৃত সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হও, তবেই ত তোমার জ্ঞানবত্তার গৌরব করিব ? নচেৎ অবশ্য বলিব,—এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর গোটা-কুট অকিঞ্চিৎকর তথ্য নির্ণয় করিতেই যখন তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির এত দুর্দ্দশা, তখন সেই বিরাট জ্ঞানময়ের বিচিত্র-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে নিতান্তই বাতুলতার পরিচায়ক। তাই বলিতেছি, হে জ্ঞানগর্ব্বি ! তোমার জ্ঞানের গরিমা পরিত্যাগ কর, সন্তরণ দ্বারা সিন্ধু অতিক্রমের অলীক প্রয়াস প্রকাশে আর উপহাসাস্পদ হইও না।

জ্ঞানানুশীলন দ্বারা তুমি বহু জন্মেও ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের কৃপালাভে অভিলাষ থাকে, ভক্তিমার্গের পথিক হও, ভক্তিভরে তাঁহার নাম জপ কর, জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিল জঞ্জাল পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিতে থাক, মনে প্রাণে এক করিয়া, কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাক, সেই অভয় চরণ-সরোজে চিত্ত সংযোজন করিয়া, কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাক, তদ্গতপ্রাণ হইয়া, তন্ময়চিত্ত হইয়া, অটল বিশ্বাসভরে ডাকিতে থাক,—দেখিবে, তোমার জ্ঞানগবেষণা, প্রমাণ পর্য্যবেক্ষণা, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান কিছু-রই প্রয়োজন হইবে না, একমাত্র ভক্তিবলে তুমি অনায়াসে সেই জ্ঞানাতীত, বোধাতীত, কল্পনাতীত ভববন্ধনহারী হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, চরমে পরম পরমার্থ লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।

হৃদয়ে অকপট ভক্তি থাকিলে, অবশ্যই ঈশ্বরের করুণা আকর্ষণে সমর্থ হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প, আমরা আমাদের আলোচনার ধর্ম্মপিপাসু পাঠকবর্গকে অদ্য উপহার প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধের উপ-সংহার প্রদান করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। জ্ঞানার্জ্জনের লালসা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনুশীলনে তিনি উক্ত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার, তন্ত্র, স্মৃতি এবং দর্শনাদি অশেষ শাস্ত্র, সর্ব্বদা তাঁহার জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত। নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াও কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন পিপাসার শান্তি হইত না—সর্ব্বদা অভিনব শাস্ত্র-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে বড়ই ভালবাসিতেন।

নানা শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে থাকিয়া যে, ব্রাহ্মণ ঈশ্বর-চিন্তায় বিরত থাকিতেন এরূপ নহে, বরং ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁহার জীবনের সার ব্রত ছিল—ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁহার—জীবনের প্রধানতম লক্ষ্যস্থল ছিল। তাঁহার

পাঠ্য শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ মধ্যে যে সকল শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সংবাদ অধিক দেখিতে পাইতেন, সেই সকল শাস্ত্রের অনুশীলনেই তিনি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শাস্ত্রাধ্যয়নেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ জন্মাইত না। নানাশাস্ত্রের জটিল মত বাদ ঈশ্বর তত্ত্বের মীমাংসায় তাঁহার মনে নানারূপ সংশয় আনিয়া দিত—নানা শাস্ত্রের নানা কূটতর্কে, ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণে তাঁহার পক্ষে প্রবল পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইত। কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর সাকার, কোন শাস্ত্রে লিখিত আছে ঈশ্বর নিরাকার; কোন শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে, ঈশ্বর অদ্বৈত, কোন শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে, ঈশ্বর দ্বৈত; কোন শাস্ত্রকার বলিতেছেন, ঈশ্বরকে প্রকৃতিরূপে ভজনা কর, কোন শাস্ত্রকার বলিতেছেন ঈশ্বরকে পুরুষরূপে ভজনা কর; কোন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—ঈশ্বরের রূপ, অসীম অনন্ত; প্রকৃতি পুরুষ এ দুইটি তাঁহার সেই অনন্তরূপের অভেদ মূর্ত্তিমাত্র, অতএব সাধক ইচ্ছা করিলে রূপ বৈষম্য বা দ্বৈতভাব পরিবর্জ্জন করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ রূপের ব্যষ্টিভাবে কিম্বা উভয়রূপ সমষ্টির একত্রে উপাসনা করিতে পারেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকার ভিন্ন২ শাস্ত্রে আপনাপন মতের খ্যাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু নানাশাস্ত্র কূটজালে নিপতিত হইয়া তিনি ইষ্ট মন্ত্রে স্থির বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্রোতোনিক্ষিপ্ত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবল নিরুদ্দেশ্য নানামতের অনুবর্ত্তন করিতেন। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইতে লাগিলেন, মহাকালের করাল মূর্ত্তি ক্রমশঃ পুরোবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অন্তিমের ভাবনায় আকুল করিয়া তুলিল। অতঃপর এই ভীষণ ভবার্ণব কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন, এই চিন্তা প্রবলা হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়নেও তাঁহাকে বীতরাগ করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ দারুণ দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়, আজীবন জ্ঞানানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া আমার কি ফলোদয় হইল? এতদিন আমি কাহার উপাসনা করিলাম? কিন্তু জ্ঞান কই? কোথায় জ্ঞানের অস্তিত্ব? জ্ঞানকে কি আমি দেখিতে পাইয়াছি? ভ্রম,—মহাভ্রম; জ্ঞানকে কে কবে দেখিতে পাইয়াছে? জ্ঞানের আরাধনায় কে কবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? কোন মূর্খ দর্প করিয়া বলিতে পারে,—আমি জ্ঞানী? জ্ঞান সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, তন্মধ্য রত্ন আহরণ করা সুদূরপরাহত, আমি জ্ঞানসিন্ধু তীরস্থ সামান্য উপলখণ্ড সংগ্রহেও সমর্থ হই নাই। হায়!

জ্ঞানচর্চ্চার মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদিন আমি দুর্লভ মানব জীবন বৃথায় যাপন করিয়াছি, "জ্ঞান, জ্ঞান"—করিয়া সারাজীবনটা বৃথায় ক্ষেপণ করিয়া দুকূল হারাইয়াছি। এক্ষণে অন্তিমে, এই অকূল ভব-জলধি কিরূপে অতিক্রম করিব ভাবিয়া যে কূল পাইতেছি না। শাস্ত্র কূট লইয়া বিতর্ক করিবার আর এখন সময় কই? হায় হায়! জ্ঞানমদে অন্ধ হইয়া, ভ্রমেও একদিন গুরু-মন্ত্র উচ্চারণ করি নাই। বুঝিলাম এখন,—শাস্ত্রের বিতর্ক সব ভুয়াবাজীমাত্র,—কিছুতেই কিছু নাই,—বিশ্বাসই পরম পদার্থ,—বিশ্বাসই মূলমাত্র,—আপনাপন ইষ্টমন্ত্রে নির্ভর করাই সুবিজ্ঞের কার্য্য। হে দয়াময়ি! হে দীন তারিণি! হে জ্ঞান গর্ব্ব খর্ব্ব কারিণি কালীকে! এই অধম জ্ঞানান্ধের মনের ধন্দ অপনোদন কর মা! বুঝিলাম! তুমি জ্ঞানের অগোচরা,—শাস্ত্র ঘাটিয়া তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। হে অজ্ঞান নাশিনি! আমার জ্ঞানের গর্ব্ব, পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব সব চূর্ণীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে অবোধ সন্তান—অজ্ঞান তনয়, কি উপায়ে তোমার অভয় চরণ সরোজে স্থান পাইবে বলিয়া দাও?

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

সুখ ও দুঃখ।

সুখ কি, এবং দুঃখই বা কাহাকে বলে,—এতদুভয়ের সম্বন্ধই বা কিরূপ, মানব একদিনের জন্যও সে চিন্তা করে না, অথচ সুখের জন্যই লালায়িত সুখের দিকেই সর্ব্বদা প্রধাবিত। দুঃখের নাম গন্ধ তাহাদের সহেনা, দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথে এক দিনের জন্যও বিচরণ করিতে চাহেনা, অপিচ "সুখ সুখ" করিয়াই বিব্রত এবং সুখান্বেষণেই তাহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট। তাই তাহাদের কর্ম্মের ফল ও জীবনের শেষ সম্বল, মহা দুঃখ,—অনন্ত নরক। সুখ-দুঃখের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিয়া যদি আমরা সুখাবেক্ষণে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হই এবং সুখের আশায় দুঃখরূপ মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে ও প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলেই আমরা দেখিব, আমাদের ঐ দুঃখমূলক কর্ম্মের শেষ পরিণাম,—অনন্ত সুখ ও অপার আনন্দ। তাই বলি, সুখ দুঃখের বিষয় একটু বিশেষ চিন্তা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুখ কি?—না, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আত্যন্তিক প্রফুল্লতা। দুঃখ তাহার বিপরীতার্থের উদ্বোধক। কিন্তু তাহাহইলেও

দুঃখই বিবর্ত্তনে মানবের হৃদয়াকাশে সুখ সূর্য্য। দুঃখের পরিণামেই মানবের সুখৈশ্বর্য্য। কিন্তু তথাপি ভ্রান্ত মানব দুঃখ মূলক সুখের আশায় দুঃখ ছাড়িয়া সুখের জন্যই উদ্‌ভ্রান্ত। সুখেচ্ছু মানব! এরূপ অবস্থায় তোমাকে "সুখ সুখ" করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় কেবল ঘুরিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তোমার কাঙ্ক্ষিত সুখচন্দ্রের স্নিগ্ধ ও শান্তিপ্রদ সুশীতল জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে নিদাঘের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে তোমায় দগ্ধ হইতে হইবে। তুমি যাহার দিক দিয়া ঘেঁসিতে কাপুরুষের ন্যায় আপন হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অভিব্যক্ত করিতে, শেষে সেই দুঃখই তোমার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিবে এবং দুঃখ ছাড়িয়া সুখের অন্বেষণে গিয়া "হা সুখ! হা সুখ!" করিয়া অনন্ত দুঃখসাগরে ডুবিয়া মরিবে। তাই বলি মানব! সুখের আশা করিতে হইলে দুঃখকে ছাড়িও না; দুঃখই * তোমার ভাবী উন্নতির মূল!

* সর্ব্ববিধ আকস্মিক বিপদ বা দুঃখ কখনও সুখের নিদান হইতে পারে না। যেমন কাহারও পুত্রের প্রাণবিয়োগ হইল, কাহারও বা বন্ধুর বিয়োগ ঘটিল। এই শ্রেণীর দুঃখ কখনই সুখ মূলক হইতে পারেনা। পরন্তু তাহা মহা দুঃখেরই মূলীভূত কারণ।

জগতের সকলই সুখের অভিলাষী, সুতরাং সুখান্বেষী। পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ সম্প্রদায় ভুক্ত প্রত্যেক মানবহৃদয় একে একে অন্বেষণ কর দেখিবে তাহাদের প্রত্যেকেই সুখী হইবার বা সুখ পাইবার জন্য সুখের অনুসন্ধানে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত বহুবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখিয়াছে। কিন্তু যে যে পথেই সুখের অনুসন্ধান করুক না কেন, আমরা দেখি সুখের পথ একটী, তাহার নাম দুঃখ। এই দুঃখ পথ আবার সতত কণ্টকাকীর্ণ, বিবিধ অন্তরায়ে সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন। সুতরাং সুখের অন্বেষণে এপথে পদে পদে বিপদ সম্ভব। এবম্বিধ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দৃঢ়তা সম্পাদনে কিংবা ধৈর্য্য অধ্যবসায় ও ন্যায়ানুমত বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ পরিচালনে অসমর্থ হইলে, অথবা গন্তব্যপথের বিবিধ অন্তরায় দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইতে না পারিলে সুখের আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে। পক্ষান্তরে সুখের আশা হৃদয়ে ধরিয়া এবং সাধনার কঠোরতম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ধৈর্য্য, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা দ্বারা দুঃখের পথে সুখের অন্বেষণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া— বিপদের পর বিপদে পড়িয়া, কষ্টের পর কষ্ট সহিয়া ও দুঃখের পর দুঃখ পাইয়া উহা সুখ সম্পদলাভের প্রধানতম উপায় জানে লক্ষ্য

স্থির রাখিতে পারিলে এবং সুখ রাজ্যের পরিপন্থী সমূহের নিকট একবার দুইবার এমন কি সহস্রবার পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়া ও বিচলিত ভগ্নোদ্যম বা পদস্খলিত না হইয়া বিজিত হইবার উল্লাসে বদ্ধ পরিকর হইতে শিখিলে তখন আশার প্রদীপ্ত আলোকে বিমল সুখের নির্ম্মলভাতি মিশিয়া অনাগত অদূরবর্ত্তী সুখের মন্দির আলোকিত করিয়া তুলিবে। সেই আলোকে তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূরে পলাইবে, শেষ সুখের অস্তিত্বাবধারণে সমর্থ হইবে, তখন তুমি আপনাকে সুখী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবে।

সুখ সাধনার জিনিষ।—সাধানায় কিনা হয়! দরিদ্র রাজা হয়, মূর্খ পণ্ডিত হয়। এবং সংসারে অতি ঘৃণ্য ঘোর নারকীও সাধন সূত্র ধরিয়া স্বর্গের দ্বারে উপনীত হয়, অমরত্ব লাভ করে। তবে সাধনায় সুখ পাইবে না কেন? শ্রাবণের প্রথমাবধার পাপাচারে নিরত ও ঘোর নারকীর অভিধানে উদ্ধৃত যে রত্নাকর অর্থের লোভে সামান্যের জন্য নরহত্যা করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, সেই রত্নাকর সেই কঠিন হৃদয়, নির্ম্মম দস্যু রত্নাকর শেষে সাধনার বলে বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়া কিরূপে পরমার্থ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা একবার ভাব দেখি? আর সেই সঙ্গে মহারাজা বিশ্বামিত্রের বিষয়ও একটু চিন্তা করিয়া দেখ, তিনি প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, বাহ্য সুখ সম্পদে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রতিভাত হইত, লোকে তাঁহাকে পরম সুখী জ্ঞান করিত। আর ইহাও নিশ্চিত যে, স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অপরিমেয় সুখের সম্পদ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, মহারাজ বিশ্বামিত্রের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। তবে কেন তাঁহার চিত্তের বিকার ঘটিয়াছিল? কেনই বা তাঁহার সমুদয় বাহ্য সুখ সম্পদে—মালিন্য পড়িল? না, যখন তিনি দেখিলেন জটা বল্কলধারী, সামান্য কুটির নিবাসী বনবাসী ব্রাহ্মণের নিকট—ব্রাহ্মণের মানসিক শক্তির নিকট, তাহার তুচ্ছ শারীরিক ও মানসিক শক্তি ফুৎকারে উড়িয়া গেল; তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সুখের পরিমাণ কতটুকু। তাই তিনি আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে ও বিমল সুখের অন্বেষণেই সমুদয় বাহ্য সুখ সম্পদ ছাড়িয়া কঠোরতম তপশ্চর্য্যায় নিরত হইলেন। তপ ও কঠোরতম সাধনার বলে অদম্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে যেরূপ অপার আনন্দ ও অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আর মনে হয় সাধনায় কিনা হয়? সেই জন্যই বলি দুঃখী, তুমি দুঃখ করিওনা, সুখ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি সুখের জন্য দুঃখ কর,

সাধন মন্ত্রে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূর কর সুখ তোমার স্বাধিকারগত হইবে। জ্ঞানহীন বালক বাল্যকাল হইতে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি কল্পে সাধনার অঙ্গ স্বরূপে বিবিধ কষ্ট-ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে অজ্ঞান অন্ধকার হইতে জ্ঞানের শুভ্র ও নির্ম্মল আলোক প্রাপ্তে জগতের সমুদয় রহস্য একে২ স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়, হে দুঃখি! তুমিও সেইরূপ বালকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুখের সীমায় পা দাও, তোমার দুঃখের অবসান হইবে।

দুঃখ সাধকের সাধন মার্গ, দুঃখ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লাভের অব্যর্থ সাধন মাত্র, দুঃখই বিবিধ দুঃখমূলক বাধা বিপত্তি নাশের শাণিতাস্ত্র। দুঃখ বিনা সাধনায় সিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাই বলি, সুখ তুমি দুঃখ বিনা দুর্লভ, দুঃখের সহিত তোমার সংস্রব নিয়ত বিমিশ্রিত। সেই জন্যই কোন কবি স্বকীয় হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়া মধুর সুরে গাহিয়াছিলেন,—

"এ সংসার সরসীর মাঝে
এক বৃন্তে পুষ্প দ্বয়, ফোটে সুখ দুঃখময়,
কেহনা তুলিতে পারে একটী কমলে।
একের আশয়ে নীরে গিয়া, উঠে হাতে দুটী জড়াইয়া,
ক্রমে উভয়ের হাত পরে লোকে গলে।"

কবির এই উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, বোধ হয় সুখান্বেষী পাঠকবর্গ স্থিরচিত্তে একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। যাহা হউক, এখানে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে সুখ,—দুঃখ বিনা দুর্লভ। এক্ষণে দেখা যাউক যে সুখ কোথায়?—

ধনীর প্রাসাদে, কুবেরের ধন ভাণ্ডারে, বিলাসীর প্রিয় নিকেতনে, পণ্ডিতের প্রশস্ত মনে, কোকিলের বাসন্তি গানে, দাম্ভিকের আত্মাভিমানে, ধনীর ধন গর্ব্বে, তার্কিকের তর্ক কৌশলে, দরিদ্রের ভগ্ন ভবনে, মূর্খের অজ্ঞানে একে একে অন্বেষণ কর; সুখের সন্ধান পাইবে কি না সন্দেহ। তবে সুখ কোথায়?—না, মানবের অন্তরে অন্তরে,—মানস মন্দিরে, এই মন্দিরের পঞ্চদ্বার। এই প্রত্যেক দ্বারের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। সুখের সন্ধানে একে একে ঐ সকল দ্বার উদ্ঘাটন কর, মানস মন্দিরে সুখের সত্তা অনুভব করিতে পারিবে,—সুখ কোথায় দেখিতে পাইবে, অতঃপর আমরা যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারের বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি অথবা পরিতৃপ্তিতে মনের স্ফূর্ত্তি অনুভব করি, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,—সুখ জ্ঞানের দ্বারে মনের ভিতরে।—মনের অনুভূতিতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে স্ফূর্ত্তি তাহাতেই সুখের পূর্ণ বা চরম বিকাশ। নহিলে

সুখের অস্তিত্ব কোথায়? দুঃখী, তুমি এ সুখে বঞ্চিত হইবে কেন? তুমি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ করে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সহযোগে নিষ্পাপ কর্ত্তব্য পালনে যত্নশীল হও, মানস মন্দিরকে নিয়ত নির্ম্মল রাখ, কুচিন্তা কালিমায় আপনাকে কখনও কলঙ্কিত করিও না, সুখ তোমায় কদাচ পরিত্যাগ করিবে না, তুমি দুঃখের অবস্থাতেও সুখের মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

জগৎ কর্ম্মের দাস এবং কর্ম্মের পরিণাম সুখ দুঃখ। জড় জগৎ আপনা হইতে কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ, সুতরাং নিশ্চেষ্ট, কিন্তু প্রাণী জগৎ স্বকীয় মানসিক গতিতে অবিরত গতি বিশিষ্ট। এই হেতু মনের অনুভূতি ক্রমে কর্ম্ম করিতেই সচেষ্ট। এই মানবক গতিক্রমে আমরা বিবিধ কর্ম্মের উদ্দেশ্যে নানা পথে চলিতেছি। আমরা সকলেই যখন কর্ম্মের দাস এবং মনের অবাধ গতিতে সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট, তখন কেহ সুখী কেহ দুঃখী হয় কেন? না, যাহারা ভিত্তিহীন বা লক্ষ্যবিহীন কর্ম্মের উদ্দেশ্যে শূন্য মনে উদাস প্রাণে স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করে, অথবা কর্ত্তব্যের পথে বেশ চলিতেছে, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বেশ কার্য্য করিতেছে, কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া হঠাৎ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হইল, কিম্বা বিশৃঙ্খল ভাবে চলিয়া দুঃখেরই সহগামী হইয়া পড়িল, যে সকল মানবের কর্ম্মের অভিনয় এই ভাবে পরিসমাপ্ত হয়, বিধির বিধানে তাহাদের অদৃষ্ট লিপি তাহাদের অনন্ত দুঃখ ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া লক্ষিত বিষয়টীকে জীবনের ধ্রুব তারা জ্ঞানে এক মনে এক ধ্যানে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে এবং কর্ম্মের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে, বিধাতার অদৃষ্ট লিপি, তাহার অনুগ্রহ ব্যঞ্জক সুখের সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

জগতে দুই মতের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, একদল কর্ম্মবাদী, অন্য দল অদৃষ্ট পক্ষপাতী, কর্ম্মবাদী ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্ব কালেই অদৃষ্টের ফলাফল কর্ম্ম সূত্রের সহিত গ্রথিত দেখেন, আর অদৃষ্ট পক্ষপাতীর দল স্বকৃত কর্ম্মের প্রত্যেকটীতেই আপন অদৃষ্টের ফলাফল দেখিতে পান এবং কেহবা নিজ কৃত কার্য্যের প্রত্যেকটীতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অবলোকন করেন, এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোক অতি ভয়ঙ্কর, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া প্রকারান্তরে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের উপর ভয়ানক দোষারোপই করিয়া থাকেন এবং ভগবানের নামে কর্ম্মের পথে কাঁটা দিয়া নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সচেষ্ট হইয়া দুঃখেরই পথ পরিষ্কার করিয়া লয়। জগতে ঈদৃশ অলস ও নিষ্কর্ম্মার পরিণাম অসীম দুঃখ, অনন্ত নরক।

যাহা হউক, একণে আমরা সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার ক'রব।

সুখ দুঃখের কিরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কতকটা চেষ্টা করা গিয়াছে, একণে দেখা যাউক, দুঃখের সহিত সুখের আর কোনরূপ ঘনিষ্টতা আছে কি না।

দুঃখ, সুখের মান দণ্ড।—সুখ, দুঃখের তুলা দণ্ডে নিয়ত তুলিত। দুঃখ ভোগ না করিলে সুখের মধুরিমা সম্যক উপলব্ধি হয় না। দুঃখ না থাকিলে সুখের অস্তিত্ব থাকিত না, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের অবস্থায় পরি-তৃপ্তি এবং তাহাতেই আশার নিবৃত্তি। মানব! তুমি সুখের অন্বেষণে যে দিকে যাও সেই দিকেই দুঃখের নিদারুণ বিভীষিকা দেখিতে পাইবে, যদি তাহাতে ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হও, তবে সুখ প্রাপ্তির আশা দূরে থাক তোমার দুঃখের অবসান অনন্ত নরকে। সুখ দুঃখের এরূপ অবস্থা বুঝিয়া যদি সুখ ভোগের বাসনা করিতে চাও তবে দুঃখকে সঙ্গে লও, দুঃখের সহযোগিতায় প্রকৃত কর্ম্মের পথে অগ্রসর হও, সুখ তোমার স্বাধিকারগত হইবে।

আমাদের কথা।

আমরা আজ ৮ মাস হইল গ্রাহকগণের নিকট নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাঠাইয়া আসিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট মূল্য আদায় হয় নাই, সামান্য ১৲ টাকা মাত্র বার্ষিক লইয়া প্রতি-মাসে সকলের নিকট পত্র লেখা সম্ভবপর নহে, আজকাল বাঙ্গালী স্বদেশবৎসল হই-য়াছে। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বদেশীয় দ্রব্যের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতে এখন তাহারা মুক্তহস্ত, কিন্তু আমাদের সামান্য মাত্র বার্ষিক ১৲ টাকা যে এখন পাড়য়া রহিয়াছে, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়; যাহা হউক, স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত গ্রাহক মহোদয়গণ সমীপে আমাদের করপুটে নিবেদন এই যে, এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র তাঁহারা যেন স্ব স্ব বার্ষিক সাহায্য ১৲ পাঠাইয়া আমাদের উৎ-সাহ বর্দ্ধন করেন, নতুবা আমরা আগামী বারে সকলের নিকট ভিঃ পিঃ তে পত্রিকা পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

স্বপ্ন।

গভীর তন্দ্রার ঘোরে স্বপন মধুর
কি শান্তি ঢালিল আহা, কি সুখ সংযোগ
লভিল বিদগ্ধ প্রাণ বিরহ বিধুর,—
স্বরগের কি সৌন্দর্য্য সুধা উপভোগ!
নিতম্ব চুম্বিত সেই দীর্ঘ কেশরাশি,
প্রফুল্ল গোলাপী গণ্ড, রক্তিম অধর,
কুন্দ শুভ্র দশনের সৌদামিনী হাসি,
আবার মুহূর্ত্তে যেন মোহিল অন্তর!
কত বর্ষ, কত যুগ হেরিনি তাহার
বিমল প্রতিভা দীপ্ত দেব দেহখানি,
আজি আলিঙ্গনে বাঁধি, সে মূর্ত্তি আমার
দিয়াছে কতই সুধা ঢালিয়া না জানি!
কি মদিরা প্রেমময়,—প্রীতি প্রস্রবণ,
দু'জনের বিনিময় একটি চুম্বন!

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

কলিকাতা,—১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আলোচনা।

"মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।"

নবম বর্ষ। } পৌষ সন ১৩১২ { নবম সংখ্যা।

ভক্তির জয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের একটি চতুষ্পাটী ছিল। অনেক-গুলি ছাত্র; তাঁহার সেই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। পাঠার্থী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অরবিন্দ নামক একটি আট নয় বৎসরের ব্রাহ্মণ বালক ছিল। অরবিন্দের বুদ্ধি বৃত্তি এবং প্রতিভা যেরূপ অসামান্ত ছিল, প্রকৃতিও সেইরূপ নানা সদগুণে বিভূষিত ছিল। একাধারে মণি কাঞ্চনের সংযোগ হইলে যেরূপ প্রীতিকর দেখায়, বিদ্যাও গুণের একত্র সন্নিবেশে ভগবান্ তাহাকেও সেইরূপ প্রিয় দর্শন করিয়াছিলেন। বালক শিক্ষা গুরুকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, গুরুও তাহাকে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিদ্যা রত্ন দান করিতেন।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একণে আর বৃথাকাজে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করা আত্মবঞ্চকের কার্য্য। বহুদিন হইতে তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আর এরূপে কালহরণ করা কর্ত্তব্য নহে, সমস্ত জঞ্জাল মিটাইয়া এখন ঈশ্বরের চিন্তা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি একে একে সকল ছাত্রকেই বিদায় দিতে লাগিলেন। অরবিন্দকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন, সুতরাং তাহাকে বিদায় দিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন, সে নিকটে থাকিলে পাছে তাঁহার বাঞ্ছিত বিষয়ে কোন প্রকারে বাধা পড়ে, এই ভয়ে অবশেষে তাহাকেও বিদায় দেওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ অরবিন্দকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ বৎস! আমি ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য সীমায় উপনীত হইতেছি, চিরদিন পার্থিব বিষয়ের আলোচনায়

ব্যাপৃত থাকা অবিবেচকের কার্য্য; অনিত্য জগত,—অনিত্যদেহ; অনিত্য ভবসাগরে আমরা এক একটি অনিত্য জলবিম্ব,—"কখন আছি কখন নাই"—কে বলিতে পারে? বৎস! আমার অনিত্য জীবনের অসার লীলাখেলা ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে, এই সময়ে পরকালের পথ দেখা শাস্ত্রানুমোদিত; এজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি, এখন হইতে যথা সম্ভব পার্থিব সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অবহিতচিত্তে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিব। বৎস! সত্য কথা বলিলে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হয়, নচেৎ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সকল ছাত্র অপেক্ষা তোমাকে আমি অধিক স্নেহ করি। আমি একে২ সকল ছাত্রের নিকটেই অবসর গ্রহণ করিয়াছি, অতঃপর। তোমার নিকটেও অবসর চাহিতেছি। ভগবানের কৃপায় তুমি আমার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ, তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ করি,—তুমি চিরজীবী হও, এবং ধর্ম্ম পথে লক্ষ্য রাখিয়া পরম সুখে কালযাপন কর।"

জয়। গুরো! আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই আজ আপনার কাছে এই মর্ম্ম ভেদী কথা শুনিতে হইল। শিশুকাল হইতে ভগবান আমাকে পিতৃ মাতৃ-স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু আপনার নিকট আসিয়া অবধি একদিনও আমার তাঁহাদিগকে মনে পড়ে নাই। আমি যে পিতৃ-মাতৃহীন, আপনার অকৃত্রিম-স্নেহে তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিবার অবকাশ পাই নাই! হায়! আজ হইতে আমাকে যথার্থই পিতৃ-মাতৃহীন হইতে হইল। যাহাহউক গুরো! সেজন্য আর পরিতাপ করিয়া ফল নাই। আমি আত্মসুখের জন্য আপনার অভীপ্সিত পথে কণ্টক প্রদান করিতে চাহিনা। কর্ম্মফল ভোগ অনিবার্য্য,—জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টলিপি যেরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন; অবশ্যই তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু অধম আমি, আশৈশব আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া,—অশেষ আপনার নিকটে অশেষ উপদেশরত্ন লাভ করিয়া, সামান্য পরিমাণেও আপনার উপকার করিতে পারিলাম না, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। গুরো! আপনার ত কিছুই অজ্ঞাত নাই,—আপনিত সকলই জানেন, আমার ন্যায় নিরাশ্রয়, অনাথ এ মহীমণ্ডলে দুর্লক্ষ্য। গুরো! এদীন হীনের দ্বারা যে আপনার কোন বিশিষ্ট উপকার হইবে সে সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নাই। জানি আমি, অনন্ত জীবনেও গুরুর ঋণ অপরিশোধ্য।—কে কবে গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে? তথাপি গুরো! আমার একান্ত অভিলাষ, অধমের প্রতি

কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার কায়িক শ্রমলব্ধ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণে জীবন সার্থক করুন।"

ছাত্র অরবিন্দের অগাধ গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপরই বিদিত ছিলেন। এক্ষণে তাহার ভক্তির অটলতা, লোকাতীত কৃতজ্ঞতা এবং অপূর্ব্ব সরল হৃদয়তা দর্শনে মোহিত হইয়া গেলেন,—জানিনা, তাঁহার মনে কি এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল, অভ্রাপসৃত শশধরবৎ, তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট বদন মণ্ডলে সহসা হর্ষের বিমলবিভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মনেং ভাবিতে লাগিলেন,—বুঝিবা এই ব্রাহ্মণ বটু দ্বারাই জগদম্বা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাহাহউক, অতঃপর, তিনি মনোভিপ্রায় কিছুমাত্র পরিস্ফুট না করিয়া বসিলেন,—"বৎস অরবিন্দ! তোমার ন্যায় পূতচরিত্র বালক এ সংসারে দুষ্প্রাপ্য, তোমার সদিচ্ছা প্রণোদিত বাক্যে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যদি গুরুদক্ষিণা দানে তোমার একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার একটি কার্য্য করিতে পার। সেই কার্য্যটি তোমার দ্বারা সম্পন্ন হইলে, আমি বড়ই উপকৃত হইব।"

অরবিন্দ। বলুন গুরো! এ দাসকে কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? আদেশ প্রাপ্ত হইলে এদাস কৃতার্থ হয়।

ব্রাহ্মণ। বৎস! আমার কার্য্যটি বড়ই গুরুতর, বড়ই শ্রম সাধ্য,—বালক তুমি, তোমার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর বিবেচনায় প্রকাশে ইতস্ততঃ করিতেছি।

অরবিন্দ। অকুণ্ঠিতচিত্তে বলুন গুরো! সাধ্যের অতীত হইলেও তৎসাধনকল্পে কথনই পরাঙ্মুখ হইব না। অথবা যদি সেই কার্য্য সাধনে আমার জীবন গ্রহণেরও আবশ্যকতা থাকে তাহাও অম্লান বদনে ব্যক্ত করুন, এই কৃমি-কীট-ভোজ্য নশ্বরজীবন গুরুর চরণে উৎসর্গীকৃত করিয়া জন্ম সফল করি।

ব্রাহ্মণ। বৎস! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, জীবন পণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে সেই কার্য্যটি সাধন করিতে, একটু কঠোরতা, একটু একাগ্রতা, একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা, একটু ধৈর্য্যশীলতার প্রয়োজনতা দেখিতেছি এ সকল গুণ তোমার প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।—বোধ হইতেছে যেন, তোমার দ্বারা সে কার্য্যটি সম্পন্ন হইলেও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ নিরুত্তর হইলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া অরবিন্দ বলিল,—"গুরুদেব! মৌন হইয়া রহিলেন কেন? দয়া করিয়া অভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করুন।"

ব্রাহ্মণ! বৎস! বলিব কি, সে বড় হৃদয় ভেদী কথা। কোন মহাপুরুষের কৃপায় আমি একটি কল্পতরু লাভ করিয়া-

ছিলাম, বহুদিন গত হইল আমি সেই কন্যা-রত্নটি, সেই এক মাত্র প্রাণের—তনয়াটি কপালদোষে হেলায় হারাইয়াছি। আমার সেই প্রাণাধিকা নন্দিনী অদৃশ্য হওয়ার পর,—কতদিন; কত বৎসর গত হইল, আর তাহার কোনই সন্ধান পাই নাই। বৎস! তাহার অনুসন্ধান জন্য, এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করি নাই, কত গ্রহ পূজা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াছি, তাহার সন্ধানের আশা প্রদান করিয়া যে যাহা বলিয়াছে তাহাই করিয়াছি, কিন্তু হায়! আমার এম্নি দুরদৃষ্ট কিছুতেই কিছু হয় নাই। বৎস! আশা করিয়াছিলাম, হয়ত কোন না কোন সময়ে তাহার সাক্ষাৎ পাইব, কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ সে আশায় নৈরাশ হইয়া পড়িতেছি। প্রাচীনদেহ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ দিন২ অল্পে অল্পে শিথিল ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে,—জানিনা কোন্ দিন প্রাণ পক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে! তাই বলিতেছি, বৎস! বুঝি এ জীবনে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

অরবিন্দ। গুরুদেব! আমাকে কি আপনার সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটির উদ্দেশ করিতে হইবে? গুরো! এত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা,—এ কথা প্রকাশে এত ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? দাসকে অনুমতি প্রদান করুন, যদি আপনার শ্রীপাদ পদ্মে আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ করিব।

ব্রা। হাঁ বৎস! তোমার অনুমান যথার্থ হইয়াছে, আমার সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটির অনুসন্ধানের ভার তোমাকে অর্পণ করিবার মনন করিয়াছি।

অ। গুরুদেব! আপনার আদেশে দাস আজ ধন্য হইল। এখনই আমি তাঁহার অনুসন্ধান বহির্গত হইব,—যতদিন জীবিত থাকিব প্রাণ-পণে অনুসন্ধান করিব, যদি কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবেই আবার ফিরিব, নচেৎ এইই শেষ বিদায় জানিবেন। কিন্তু আমার অনুসন্ধান সৌকার্য্যার্থে আপনার কাছে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে।

ব্রা। বৎস! তোমার যে যে বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ কর।

অ। আপনার কন্যার নাম, রূপ এবং বয়সের পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রা। যথার্থ কথা বলিয়াছ। বৎস! আমার অনেকগুলি নাম আছে, তন্মধ্যে প্রধানতঃ আমি তাহাকে 'কালী' নামেই ডাকিতাম। অতএব তুমিও ঐ নামেই তাহার তাহার অনুসন্ধান করিও। তোমার অপর দুইটি প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা সাপেক্ষ,—বহুদিনের কথা। বৎস! রূপটি যেন ঠিক মনে পড়িতেছেনা, নিতান্ত শৈশবের দেখা; তবে, শুনিয়াছি, তাহার রূপের নাকি সীমা

ছিলনা। ইদানীং যে সকল লোক দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, মেয়েটি নানারূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাঁহাদের কেহ বলেন,—সে কৃষ্ণ বর্ণ, কেহ বলেন,—সে নীলবর্ণ; কেহ বলেন সে লালবর্ণ; কেহ বলেন,—সে শ্বেতবর্ণ; কেহ বলেন,—সে পীতবর্ণ; এইরূপে তাঁহাদের নানাজনে নানারূপ রূপের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বৎস! তাহার স্বরূপ রূপ কিরূপ আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সকলেই বলেন মেয়েটি বহুরূপিণী।

অ। তবেত বড় বিষম সমস্যা দেখিতেছি! আপনার কন্যার প্রকৃত রূপ না জানিতে পারিলে, কিরূপে অনুসন্ধান করিব, তাঁহার কি একটা স্বাভাবিক রূপ নাই?

ব্রা। আছে বই কি বৎস! অবশ্যই একটু অপেক্ষা কর, আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছি;—হাঁ হাঁ বৎস! এইবার ঠিক মনে পড়িয়াছে,—এইবার আমি তাহার প্রকৃত রূপটিই বলিয়া দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আমার কন্যার রূপ, স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ; শারদ পৌর্ণমাসী রজনীতে নভোমণ্ডলের সুদূর প্রান্ত হইতে যেরূপ মধুরোজ্জ্বল কমনীয় কৃষ্ণাভ বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ; অথবা ঘোরান্ধকারময়ী রজনীতে বিদ্যুদ্দামবিলসিত বর্ষণোন্মুখ বারিদবক্ষ হইতে যেরূপ অনির্ব্বচনীয়প্রভা উদ্গীর্ণ হয় সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। নিবিড় কৃষ্ণ কাদম্বিনী কোণে যুগপৎ কোটিং বিদ্যুদ্বিচ্ছুরিত হইলে তাহার রমনীয়তা যেমন অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করে, আমার কাল মেয়ের কাল অঙ্গে যেন সেইরূপ রূপরাশি অনুক্ষণ বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার নীল-নীরদনিন্দিত নিবিড় কুন্তলকলাপ আলুলায়িত অবস্থায় সতত ধরণীতল স্পর্শ করিয়া থাকে। সুবর্ণাদি রত্নালঙ্কারে তাহার কখনই স্পৃহা নাই,—সর্ব্বদা নরকরশির-নিকর-নির্ম্মিত-আভরণ সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিয়া থাকে। শৈশব হইতে সে কখন বস্ত্র পরিধান করে নাই, সর্ব্বদা নগ্নাবস্থায় থাকিত এজন্য কেহ কেহ তাহাকে দিগম্বরী বলিয়া ও সম্বোধন করিত। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়, তাহার চারিটি হস্ত এবং তিনটি নয়ন দেখা গিয়াছিল, শুনিতে পাই এখন তাহার সেইরূপ আকৃতিই আছে। কেহ২ বলেন, সে নাকি সেই চতুর্হস্তের দক্ষিণের দুইটিতে বরাভয় এবং বামদিকের দুইটিতে উলঙ্গ কৃপাণ ও ছিন্ন নরশির ধারণ করিয়া থাকে। বৎস! এই আমার কন্যার রূপ; তুমি অনন্যচিত্ত হইয়া এইরূপ আকৃতি বিশিষ্টা কামিনী অন্বেষণ করিও।

অ। আহা গুরুদেব! আপনার কন্যার রূপত বড়ই অদ্ভুত বড়ই বিচিত্র, মরি মরি! এরূপের কি আর তুলনা আছে। গুরো!

একণে তাঁহার বয়সের কথা বলিয়া ঔৎসুক্য দূর করুন।

ব্রা। বৎস! তাহার বয়সের পরিমাণটা ঠিক করিয়া বলা কঠিন দেখিতেছি, বহুদিনের কথা, কিছু স্মৃতি পথে আসিতেছে না। যাহা হউক, ইহার জন্য তোমার চিন্তার কোনই কারণ নাই,-বয়সের পরিমাণ জানা না থাকিলেও তোমার আসল কার্য্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবে না, আমার কন্যার রূপের এমি একটা অদ্ভুত লালিত্য আছে যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন তাহার বয়স ষোড়শবর্ষের ঊর্দ্ধগত হয় নাই। এইত বৎস! তোমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিলে একণে আর কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন থাকিলে বলিতে পারে।

অ। না গুরুদেব! আর আমার কিছুই জ্ঞাতব্য নাই, একণে আশীর্ব্বাদ করুন যেন বাসনা পূর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণ কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অরবিন্দ আচার্য্য চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাশীধাম। এখন বিভাবরীর অবসান হয় নাই। স্বর্গীয় দীপমালা স্বরূপ তারকারাজি এখন সমুজ্জ্বল রশ্মিতে আলোকরাশি বর্ষণ করিতেছে। অবিমুক্ত ক্ষেত্রের অসংখ্য নর নারী এখন সুষুপ্তিদেবীর ক্রোড়ে নিমগ্ন। বিরাট নৈশ অন্ধকার সুবিস্তীর্ণ কাশীক্ষেত্রের বিরাট কলেবর এখন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। বোধ হইতেছে যেন, বারাণসীনগরী বিশ্বেশ্বরের বিচিত্র লীলা অনুধ্যান করিতে করিতে ঘোর সমাধিতে চিত্ত সমাধান করিয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরস্থ ভাগীরথীতীর সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র কুটীর হইতে একটি সুললিত সংগীত ধ্বনি নিঃসারিত হইয়া, নৈশবায়ুর মৃদুল প্রবাহ-বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভ এবং উভয় তীরস্থ বহুদূর ব্যাপী স্থলভাগ প্রতিনাদিত করিতে লাগিল। একজন সন্ন্যাসী গাহিতেছিলেন,—

"এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যেদেশে রজনী নাই মা,
সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে,
সোনাতে রং ধরায়েছি।

মণি মন্দির মেজে দিব,
মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি,
উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামা নাম ব্রহ্মজেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥

দেখিতে২ রজনীর অবসান হইল। উষা সুন্দরী বালারুণের সুবর্ণ-কিরণ-মণ্ডিত-কিরীট শিরোদেশে পরিধান করিয়া পূর্ব্ব গগনে দেখা দিলেন। বিহঙ্গমগণ কলরবছলে নিদ্রিত নরনারীকুলকে প্রভাতবার্ত্তায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আপনাপন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌দিগান্ত প্রস্থান করিতে লাগিল। সমস্ত রজনী জাহ্নবীবক্ষে কোনরূপ তরঙ্গোচ্ছ্বাস ছিল না, একণে প্রভাত বায়ুর মৃদু মৃদু হিল্লোলে ক্ষুদ্র২ ঊর্ম্মির উৎপত্তি হইয়া ঈষদ-স্ফুটধ্বনি সহকারে তটভূমি স্পর্শ করিতে লাগিল, বোধ হইল, যেন দেবী সুরধুনীও যামিনীযোগে স্বামী সহবাসে সুখ নিদ্রায় নিমগ্না ছিলেন,—এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া; সুখ-শয্যা পরিত্যাগান্তে তরঙ্গলীলাচ্ছলে বারংবার মস্তক-দেশ অবলুণ্ঠন এবং হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি প্রকীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রাণপতি বিশ্বেশ্বরের বিশ্বারাধ্য পদারবিন্দে প্রণাম করিতেছেন। ক্ষণকালের মধ্যে উষাসুন্দরীও অন্তিমদশা প্রাপ্ত হইলেন। সকল ভুবন প্রকাশক নিখিল মঙ্গল নিলয় দেব অংশুমালী বিপুল আলোকমালায় মণ্ডিত কলেবর হইয়া, ক্রমে২ উদয়াচলে প্রকাশমান হইতে লাগিলেন। প্রাতঃ স্নানার্থীনাগরিকগণ, প্রথমতঃ একটি২ করিয়া আসিতে২, অবশেষে বিপুল সংখ্যায় আসিয়া দশাশ্বমেধ ঘাট পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। যোগী, ভোগী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা লোকের কণ্ঠ সমবায়ে এক অভিনব ধ্বনির সৃষ্টি হইয়া গঙ্গাগর্ভ শব্দায়মাণ করিয়া তুলিল। তখন সেই সন্ন্যাসীটি গাহিতেছিলেন,—

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধজলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর মূলে ॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝেরে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তিকর কুড়ায়ে পাবে,
শিবযুক্তি মতন মিলে ॥
কামাদিছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও,
ছোবেনা তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত; পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপদাওমন,
মিলবে রতন, ফলে ফলে ॥

বেলা ক্রমশঃ অধিক হইয়া উঠিল, দশাশ্বমেধ ঘাটের বিপুল জন কোলাহলও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল, সকলেই স্নানক্রিয়া সমাপনান্তে আপন আপন গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। কেবল একটি দরিদ্র বালক ঘাটের একধারে নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া রহিল। আহা! এতলোক আসিল গেল, ঐ হতভাগ্য দরিদ্র বালকটির প্রতি কেহই একবার চাহিয়া দেখিল না। হায়! এ সংসারে কয়জন লোক দুঃখীর দুঃখে দয়াদ্র-চিত্ত হয়? কয়জন লোক দরিদ্রের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করে? কয়জন লোক শোকাতুরের শোকাগ্নিতে সান্ত্বনা বারি বর্ষণ করে? যে ব্যক্তি চিরসুখী, চিরদিন সুখের কোলে লালিত পালিত, দুঃখের দাবদাহন, কিরূপ অসহনীয়, কেমন করিয়া সে তাহা অনুভব করিবে? সর্পদষ্ট ভিন্ন সর্প দংশনের জ্বালা অন্যের বুঝিবার উপায় নাই।

দরিদ্র বালকটির কটিদেশে একখণ্ড অতি মলিন চির,—তাহাও আবার স্থানে২ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; অংসদেশ বিলম্বী ভ্রমর-কৃষ্ণ চাঁচর চিকুরদাম, অযত্নে জটার আধানে পরিণত হেলাভাবে সর্বাঙ্গে খড়ি উড়িতেছে; কঙ্কাল মালা যেন গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিয়া, উহার অনাহার জনিত শোচনীয় অবস্থা অভিব্যক্ত করিতেছে। আহা! দীনতার দারুন নিষ্পীড়নে উহার সুমোহন গৌরকান্তি, যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। অঙ্গের স্থানে২ আঘাতের চিহ্ন, তাহা হইতে অল্পে২ রুধির ক্ষরণ হইতেছে। ঘাট জনশূন্য হইলে, বালক রোদন করিতে লাগিল,—অশ্রুর প্রবল প্রবাহ, গণ্ড ও বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ এইরূপে ক্রন্দন করার পর, সে হতাশ নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—"হা অদৃষ্ট! এখানেও দর্শন পেলাম না? অনাহারের আশীবিষ দংশন, অনিদ্রার উৎকট অবসাদ উপেক্ষা করে কত দেশেই না ঘুরিলাম, কতগ্রামে, কতনগরে, কত রাজ্যেই না পর্য্যটন করিলাম, কোথাও অন্বেষণ পেলাম না। শেষে বড় আশা করেছিলাম, দেবাদিদেব মহাদেবের পবিত্রক্ষেত্র বারাণসীধামে নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাবো;—কিন্তু হায়! আর সে আশা কোথায়? কয়দিন হলো, এখানে এসেছি,—দিবারাত্র অনুসন্ধানের বিরাম নাই,—পাতি২ করে প্রত্যেক স্থান খুঁজেছি, যাঁকে সম্মুখে পেয়েছি তাঁকেই গুরু কর্ত্তার কথা জিজ্ঞাসা করেছি,—কোথাও দর্শন পাই নাই,—কেহই তাঁর সংবাদ বল্‌তে পারে নাই। আমার কথা শুনে সকলেই আমাকে পাগল বলে কত উপহাস করে, কাল কতকগুলি বাল-কের হাতে কি লাঞ্ছনাই না হয়েছে,—আমি

যাই তাঁদের গুরুকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করেছি অমি তারা "হো হো" শব্দে হাস্য ক'রে, পাগল! পাগল! ব'লে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল। উঃ কি কষ্টই না দিয়েছে—সে অবস্থা মনে হ'লে, এখন যেন হৃৎকম্প হয়;—দারুণ প্রহারে সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত—ক্ষত বিক্ষত, এখনো শোণিতস্রাব হচ্ছে। আহা! আমিত তাঁদের কোন ক্ষতি করি নাই—একটিও কর্কশ কথা বলি না, কাঙা-লের ন্যায় কেবল গুরুকন্যার কথাই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম,—হরি! হরি! তাতেই কি তাঁদের অপমান বোধ হ'ল? তা'তেই কি তা'রা, আমাকে পাগল ঠাহর করে, শেষে প্রহার পর্য্যন্ত কর্‌লে? হা জগদীশ্বর! যদি এত কষ্ট ভোগের পরও গুরুর দেখা পে'তাম তা'হলে কিছুমাত্র আক্ষেপ কর্‌তাম না। হা গুরুকন্যে! তোমার মনে কি এই ছিল মা? মাগো! কি দোষে এদাসকে দর্শনদানে বঞ্চিত ক'র্‌ছ? হা বিশ্বেশ্বর! হা কৃপা-নিধান! হা বাঞ্ছা কল্পতরু! শুনেছি নাথ, যে যা মনে ক'রে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তুমি তার সেই বাঞ্ছাই পূর্ণ কর; দয়াময়! আমার বাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে না? আশুতোষ! কৃপাসিন্ধো! কৃপা ক'রে আমার গুরুকন্যার দর্শনের উপায় ব'লে দাও? হা গুরুদেব! হা জ্ঞানদাতা আচার্য্য! বুঝলাম প্রভো! এ পাপাত্মা হ'তে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হবেনা,—এ অকর্ম্মণ্য নরাধম হ'তে আপনার কন্যার উদ্ধারের আশা নাই। গুরো! আপনার কাছে ব'লে এসেছি,—"যদি কখন আপনার কন্যার সাক্ষাৎ পাই—তবেই আবার ফিরিব, নচেৎ এইই শেষ বিদায়,"—জগদীশ্বর জানেন ত্রুটী করি নাই,—কপাল-দোষে সকলই বিফল হ'ল। এখন আর কি ব'লে আপনার কাছে ফির্‌বো? কি ব'লে আবার আপনার কাছে এ মুখ দেখাব? তাই আজ আপনার কাছে শেষ বিদায়ের প্রার্থনা ক'র্‌ছি।" বালক সহসা উত্থিত হইল এবং সুর-ধুনির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আবার বলিতে লাগিল, "মা পতিতোদ্ধারিণি ত্রিতাপতারিণি ত্রিপথগে! শুনেছি মা, কেবল তুমিই নাকি পাপী, তাপী, পুণ্যবান সকলকেই সমান স্নেহে—সমান যত্নে আপন অঙ্কে স্থান দাও, তাই মা আজ এই অন্তিম কালে তোমরাই আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষী হ'য়েছি। মা! আমি বড় পাপী, এই দেখ মা, পাপানলের প্রচণ্ড শিখায়, পলকে ২ হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ভস্মীভূত হ'য়ে যাচ্ছে? মাগো! আমার জুড়াইবার স্থান আর কোথাও নাই তাই আজ শেষে তোমারই কাছে জুড়াতে এসেছি, তোমার পূত শীতল কোলে স্থান দিয়ে সকল যন্ত্রণার অবসান কর।" এই সকল কথা বলিয়া, বালক যেমন গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদানে উদ্যত হইবে, অমি পশ্চাৎ দিক হ'তে একটী অর্দ্ধ-

পরিচিত লোক আসিয়া, সহসা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঐ বালকটি—অরবিন্দ। দুই বৎসরের পর আজ উহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইল। আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণের পর নানা বন পথে গুরুকন্যার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে কাশীধামে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া তাহাকে কিরূপ দুর্গতিভোগ করিতে হইয়াছে, সে সকল কথা উহার নিজ মুখে শুনিয়াছেন।

অরবিন্দ জাহ্নবী জলে জীবন সমর্পনকালে যে লোকটি দ্বারা ধৃত হইল, উনি সেই সন্ন্যাসী,—যিনি রজনীযোগে এবং প্রভাত কালে, অপূর্ব্ব স্বরলহরী বিস্তার করিয়া, সাধক প্রবর রামপ্রসাদের মনোহর সঙ্গীতে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাট নির্জ্জন হইলে, উনি কুটির হইতে বহির্গত হইয়া, মৃদুপাদক্ষেপে গঙ্গার তীরে ২ ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় উক্ত ঘাটের নিতান্ত সন্নিহিত হইলে, অরবিন্দের করুন ক্রন্দন এবং কাতর উক্তি উহাঁর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে তাহার বিমল মুখকান্তি দর্শনে এবং অদ্ভুত বিলাপ উহাঁর শ্রবণে অন্তঃকরণে যুগপৎ কৌতূহল ও করুণার উদ্রেক হইলে ভ্রমণে বিরত হইয়া উহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মাণ হইলেন। উক্ত অবস্থায় বালকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সন্ন্যাসী স্বকীয় অলৌকিক সাধন প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এ বালক, বড় সামান্য বালক নহে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে, মানুষ ভগবদ্ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, যে সকল চিহ্ন থাকিলে, মানুষ ভব বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মোক্ষমার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে, এই অদ্ভুত বালকটিতে সেই সকল লক্ষণ, সেই সকল চিহ্ন, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল আশ্চর্য্য দৈব লক্ষণ দর্শন করিয়া, উহাঁর মনে বালকটির সবিশেষ পরিচয় জানিবার লালসা বলবতী হইয়া উঠিল এবং তজ্জন্য উহাঁর বিলাপের নিবৃত্তি কাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তৎপরে ঘটনা আপনার অবিদিত নাই।

শ্রীবিজপদ চট্টোপাধ্যায়।

কন্যাদায়।

১

জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানুষকে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার দায়ে ঠেকিতে হয়। দায়ের হস্তে পতিত হইয়া ব্যস্ত বিব্রত হইতে হয় নাই, এমন লোক জগতে অতি বিরল। সামান্য দীন দরিদ্র হইতে রাজাধি-

রাজ পর্য্যন্ত সকলকেই একবার না একবার হয় পিতৃদায় না হয় মাতৃদায় অথবা কন্যাদায়ে ঠেকিয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে। পিতৃ, মাতৃ ও কন্যাদায় এই ত্রিবিধ দায়ের মধ্যে শেষোক্ত দায়ই বর্ত্তমান কালেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। অর্থ থাকিলে সকল দায় হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই ধনের সংসারে ধনের দ্বারা সংশোধিত হয় না, এমন কার্য্য নাই। কিন্তু কন্যাদায়ে তুমি যতই কেন অর্থ ব্যয় করনা, লাঞ্ছনাভোগ অনিবার্য্য ইহা সহ্য করিতেই হইবে। যাহার অর্থনাই—পিতা মাতার মৃত্যুর পর কেবল রোদন মাত্র সার করিয়া, অকৃতিপুত্র সে দায় হইতে অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে সনাতন আর্য্য শাস্ত্রে আমাদের এরূপ ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু কন্যাদায় উপস্থিত হইলে, অধুনা যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, এক্ষণে সামান্য পাত্রে কন্যাদান করিতে হইলেও পিতা মাতাকে প্রমাদ গণিতে হয়। শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন পাত্রের ত কথাই নাই, দরিদ্রের এমন সাধ্য নাই যে তাহার নিকট অগ্রসর হয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যাহারা বহুকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন, সামান্য আয়ে যাহাদিগকে সংসার পরিচালন করিতে হয়, তাহাদিগকে একবার কন্যাদায়ে ঠেকিতে হইলেই চারিদিক অন্ধকার! এরূপ কত শত দৃষ্টান্ত যে আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষের সম্মুখে দর্শন করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়! বঙ্গসমাজ আজ অর্থের জন্য কি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে।

বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর গ্রামে ভজহরি বন্দ্যোপাধ্যায় যাজনক্রিয়ার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, সম্প্রতি তিনি যমুনানাম্নী একমাত্র কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী সামান্য চাষ বাসের আয়ে কন্যাটীকে লইয়া বহুকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে যমুনা বড় হইতে লাগিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপের জ্যোতি পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কাঞ্চনপুর গ্রামে অনেক বড় বড় লোকের বাস। ভজহরির বাটীর নিকট বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাস, তিনি কলিকাতায় দালালীর কার্য্য করিয়া বেশ সম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া নিজগ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। পল্লীগ্রামে দুই তিনশত টাকায় মাসিক আয় হইলে তাহার প্রভাব, তাহার প্রতিপত্তি সহজেই বিবেচ্য। বীরেশ্বরকে পাড়ার সকলেই মান্য করিত, গ্রামে কোন কার্য্য কর্ম্ম হইলে, কোনও নালিশ মোকদ্দমা হইলে বীরেশ্বরকে সকলেই মধ্যস্থ মানিত; বীরেশ্বর নিজের বুদ্ধি অনুসারে তাহার

নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন; সে মীমাংসার আর কোন প্রতিবাদ চলিত না, বীরেশ্বর বাবু যাহা করিবেন তাহাতে দ্বিরুক্ত করে কার সাধ্য। শুনিতে পাওয়া যায় কলিকাতায় অবস্থান-কালীন বীরেশ্বর বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে, অনেক কথা কহিতেন, তিনি প্রায়ই কাঞ্চনপুরে আসিতেন না, বাটীতে মাতা; পুত্র পত্নী এবং বিধবা ভগিনীর জন্য কিছু কিছু খরচ পাঠাইতেনমাত্র। বাটীতে না আসাতেই সকলে তাহার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিত কিন্তু এক্ষণে তিনি দেশে আসিয়াছেন তাহার অর্থ হইয়াছে, এখন তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করে কার সাধ্য,—অর্থ থাকিলে সে সমস্ত দোষ ঢাকিয়া যায়, অথবা দোষ থাকিলেও কেহ তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারে না। অর্থের এতই প্রভাব! এখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি তপস্বীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার অর্থও যথেষ্ট ছিল বলিয়া পূর্ব্বদোষ কেহ ধরিত না। বীরেশ্বর বাবুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর সহিত যমুনার মাতা বিন্দুবাসিনীর বড়ই সদ্ভাব ছিল। এই জন্য বীরেশ্বর বাবুর পুত্র ললিত মোহনের সহিত যমুনার বড় ভাব হইয়াছিল, তাহারা সদা সর্ব্বদাই একত্রে খেলা করিত, আহার করিত, বেড়াইত। যমুনা শৈশবে পিতৃহীনা বলিয়া জাহ্নবীদেবী তাহাকে বড়ই যত্ন করিতেন। ; বালক-বালিকা আর

পাইলে পায় কাছ ছাড়া হইতে চাহে না। এই জন্যই যমুনা সদাসর্ব্বদাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে থাকিত। বিশেষতঃ ললিত মোহন যমুনাকে বড়ই ভাল বাসিত তাহাকে একদণ্ড না দেখিলে দিশা হারা হইত। ললিত মোহন গ্রাম্য বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত, স্কুলের ছুটির পর বাটীতে আসিয়া একত্রে যমুনার সহিত খেলা করিত, পরে সন্ধ্যা হইলে যমুনা কেবল মাত্র বাটীতে আহার করিয়া পুনরায় ললিতের কাছে আসিত; ললিত আহারাদির পর পাঠ অভ্যাস করিতে বসিত, যমুনা তাহার নিকট বসিয়া এটা ওটা সেটা নাড়িত, পেন্সিল লইয়া খাতায় আপন মনে কত কি লিখিত, এখন যমুনার বয়স সাতবৎসর, ললিতের বয়স দ্বাদশ বৎসর। ললিত বেশ মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিল, ক্রমে সে গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জাহ্নবী ও বিরেশ্বরের আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্র শিক্ষিত হইলে কোন পিতামাতার না আনন্দ হয়? জাহ্নবীদেবী পুত্রের উন্নতির জন্য কত পূজাদি প্রদান করিলেন, কয়দিন তাহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। বিন্দুবাসিনীও এ আনন্দ সংবাদে যার-পর-নাই আনন্দ অনুভব করিলেন। আর আনন্দ হইল যমুনার, সে যদিও অত বড় কিছুই ভাল বুঝিতে পারিল না, তথাপি সে

প্রাণের ললিতের সুখ্যাতি শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করিল।

৩

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হইল। বীরেশ্বর বাবু পুত্রকে কলিকাতায় পড়াইবার মনস্থ করিলেন কিন্তু জাহ্নবীদেবী ইহাতে বড়ই নারাজ, পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই, তাহার মতে, ললিত যাহা শিখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট তাহাকে ত আর রোজগার করিয়া খাইতে হইবে না। বিশেষতঃ তিনি একমাত্র নয়নের মণি প্রাণের আনন্দ, হৃদয়াকাশের ধ্রুব তারা ললিতকে দূরদেশে পাঠাইয়া কেমন করিয়া থাকিবেন? কিন্তু কি করিবেন স্বামীর অমতে ত হিন্দু রমণী কোনও কার্য্য করিতে পারেন না, অবশেষে পুত্রকে কলিকাতায় লেখা পড়া শেখানই স্থির হইল। বীরেশ্বর বাবু গৃহিণীকে অনেক বুঝাইয়া শুভ দিনে পুত্রকে লইয়া শ্যামবাজারে তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালকের নিকট রাখিয়া লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ললিতমোহন মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। ললিত কলিকাতায় গমন করিলে পর যমুনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। যমুনা এখন আর মুখুর্য্যেদের বাটী প্রায় যায়না, বাটীতে থাকিয়া মাতার কাজ কর্ম্মের সহায়তা করে, এবং সময় পাইলে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ললিতের চিন্তা করিয়া থাকে? ক্রমে ক্রমে ফুল্ল কুসুমে কীট প্রবেশ করিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয় যমুনার সেই দশা হইতে লাগিল। ললিত যে একেবারে যমুনার চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহা নহে, তবে পল্লীগ্রামের বালক আজব সহর কলিকাতায় আসিয়া, কলিকাতার নগরী শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক প্রকার চিত্ত স্থির করিতে পারিয়াছিল, মনে করিয়াছিল কলিকাতার পাঠ শেষ করিয়া দেশে গিয়া পুনরায় যমুনাকে দেখিয়া সুদীর্ঘ প্রবাসের কষ্ট বিস্মৃত হইব। কাঞ্চনপুরে এই দুইটী শিশুর শৈশব সুখ বহুদিন হইতে প্রগাঢ় হইতে ছিল। যে দেখিত, সেই সুখী হইত, কেবল হইত না একজন। সে অনন্ত তীব্র হাসি হাসিত, তাঁহাকে তোমরা যতই কেন ভাল বল না, যতই কেন তাঁহার দয়ামায়ার কথার ব্যাখ্যা কর না, আমরা কিন্তু তাঁহাকে দয়াময় বলিতে পারিব না; তিনি নিষ্ঠুর অতীব নিষ্ঠুর। মানুষ যাহা মনে করে, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দেন। এ বিশ্বসংসারে তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তিনি যে খেলা খেলিবেন তাহার প্রতিরোধ করা ত্রিজগতে কাহারও সাধ্য নাই। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সে খেলুড়ের মায়া খেলায় অভিভূত; আমরা ক্ষুদ্র জীব সেই ধারণাতীত বিধাতার লীলা কি

বু বক ? আর সেই লীলাময়ের লীলায় প্রণয়ী যুগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে লাগিল।

৪

বিরেশ্বর বাবু পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া বাটীতে আসিলেন। পুত্র গত প্রাণা মাতা পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরেশ্বর বাবু বলিলেন—"ললিত বেশ সাধনের সঙ্গে আহার বিহার করিতেছে, লেখা পড়া করিতেছে, তাহার তথায় থাকিবার কোনও অসুবিধা হইবে না। বলা বাহুল্য যে সাধন তাঁহার শ্যালক পুত্রের নাম, ললিতের সম বয়স্ক।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, দাদাকে বেশ ভাল করিয়া বলিয়া আসিলে ত?

বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, সে বিষয় আর তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছি"।

আহারাদি করিতে রাত্রি অধিক হইল। বিরেশ্বর বাবু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শয়ন করিলে, জাহ্নবীদেবী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে বিন্দুবাসিনী কথিত ললিতের বিবাহ সংক্রান্ত কথার উত্থাপন করিলেন। বীরেশ্বর বাবু বড়ই লোভী অর্থের আশা তাহার কিছুতেই মিটে না, এত টাকার অধিপতি হইয়াও ভজহরির বিষয় টুকুর জন্য তাহার বড়ই লোভ ছিল, আর তাহার বিষয় টুকু সামান্য হইলেও ভজহরির ভদ্রাসন বাটী ও তৎসংক্রান্ত বিস্তৃত জমী বীরেশ্বর বাবুর বাটীর সংলগ্ন, কোনও রূপে তাহা হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহার নব-নির্ম্মিত অট্টালিকার কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই জন্য তাহার বহুদিন হইতে লোভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার লেখা পড়া হইবে না। লেখা পড়া না শিখিয়া প্রথমে তিনি বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন, এক্ষণে না হয়, কোনও বন্ধুর কৃপায় এবং তাহার ভাগ্য ক্রমে দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু ভাগ্য ত চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকে না। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার ত থাকিবার কোনও নিশ্চয়তা নাই, অতএব এখন বিবাহ দিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নহে, এই ভাবিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি যমুনার মাতাকে বলিও যে, তাহাতে আর ক্ষতি কি, এখন উভয়ে ছেলেমানুষ বিবাহের উপযুক্ত হইলে অবশ্যই বিবাহ দিব, এখন দুই চার বৎসর যাক, ললিতের আরও একটু লেখা পড়া হক। বীরেশ্বর ভজহরির পত্নীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাখিলেন।

৫

বিন্দুবাসিনীর আরও অভিভাবক নাই। দুই তিনখানি গ্রামান্তরে তাঁহার পিত্রালয়; তথায় তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ ও কয়েকটী

পুত্র, ভ্রাতার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে, যে সদা সর্ব্বদা ভগ্নীর নিকট থাকিয়া তাঁহার কষ্ট করেন। আর বিন্দুবাসিনী জানিতেন যখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশ্বাস দিয়াছেন, তখন কি, তাঁহার কথা মিথ্যা হইতে পারে! এই জন্ত তিনি কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ কিছু চেষ্টা করেন নাই। আর ললিতের সহিত বিবাহ দিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা; কোন পিতা মাতা কন্যার বিবাহ সর্ব্ব-বিষয়ে সদ্গুণশালী পাত্রে দিতে না ইচ্ছা করেন; অবস্থা ভাল হইলে এ বিষয়ে অর্থের মায়া কেহই করেন না। বিন্দুবাসিনী সর্ব্বস্ব দিয়াও ললিতের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কারণ ললিত ও যমুনা দুইটীতে যেন মাণিক যোড়, এ দুইটী এক সূত্রে গ্রথিত হইলে, বেশ সুখী হইবে, বিশেষতঃ ইহারা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ, বিধাতা যেন একত্রে রাখিবার জনাই প্রথম হইতে ইহাদিগকে একত্র মিলিত করিয়াছেন। বিন্দুবাসিনী কন্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আর কোনও পাত্রের অনুসন্ধান করিলেন না। মৃত ভজহরি বাবু বীরেশ্বর বাবু অপেক্ষা জাত্যাংশে অনেক শ্রেষ্ট হইলেও বিন্দুবাসিনী কন্যার সুখের জন্ত সে বিষয় লক্ষ্য করিলেন না। ভাবিলেন আমার ত আর কেহই নাই যে একার্য্যের জন্ত তাহার বিবাহ কষ্ট পাইতে হইবে। যমুনাই আমার সব, যাহাতে সে সুখিনী হয় তাহা চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিন্দুবাসিনী ললিতের সহিতই যমুনার বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন, ইহাতে বীরেশ্বর বাবুও তাহার পত্নীর ও মত ছিল। এই জন্ত তিনি আপন অগ্রজকে কন্যার বিবাহ-সংক্রান্ত পাত্র স্থির করিবার জন্য কোনও কথা বলেন নাই; বিন্দুবাসিনীর ভ্রাতাও জানিতেন বীরেশ্বর বাবুর পুত্রের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক লইয়া গিয়াছে পাড়ার সকলেও জানিত ললিত যমুনার বর, যমুনা ললিতের কনে কিন্তু হইলে কি হয়, বাল্য-প্রণয়ে যে বিধাতার চির অভিশাপ আছে। অর্থলোভী পিশাচের কথায় বিশ্বাস করিয়া কে কবে সফলকাম হইয়াছে?

৬

ললিতমোহন কলিকাতায় থাকিয়া মাতুলের যত্নে বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। ললিত কিয়দ্দিনের মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখন ক্রমশঃ দুই এক স্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিছু মোটা টাকা পাইবার আশাও হইতে লাগিল। বিন্দুবাসিনী এখন মাতুলীকে দিয়া পূর্ব্বের কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের মত কথা শুনিতে পাইলেন না। বিন্দুবাসিনী আর আর কথায় তাদৃশ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া

একদিবস জাহ্নবীকে হাতে ধরিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে বলিলেন। জাহ্নবী দেবী কি করেন স্বামীর মনোগত ইচ্ছা সমস্ত ব্যক্ত করিলেন; শুনিয়া বিন্দুবাসিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। যমুনাকে আর বেশী দিন অবিবাহিতা রাখা যায় না—তাঁহার তাদৃশ অভিভাবক কেহ নাই যে সত্বর কোন পাত্র স্থির করিয়া দেন। আর যমুনা ললিতের সদ্ভাব দেখিয়া আর তাঁহারও অন্যপাত্রে সমর্পণ করিতে প্রাণে যেন কিরূপ আঘাত লাগিল। সরলপ্রাণা বিন্দুবাসিনী কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আজ মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি জানিতেন ভদ্রলোকের কথা ও কাজ একই কিন্তু আজ তাঁহার অদৃষ্টগুণে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। বিন্দুবাসিনী বলিলেন দিদি! আর কেন আমাকে চিন্তানলে দগ্ধ কর, তোমরা দয়া করিয়া আমার কন্যাটীকে গ্রহণ করিলে আমার মহা উপকার করা হয়; আমাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিলে ভগবান তোমাদের প্রতি সদয় হইবেন। এই বলিয়া হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জাহ্নবী দেবীর হৃদয় তাহাতে আর্দ্র হইয়াছিল কিন্তু অর্থ পিশাচ স্বামীর নিকট ও কোন অনুরোধ রক্ষ হইবে না। এই জন্য তিনি বলিলেন - দিদি! আমি কি করিব বল আমি অনেক বুঝাইয়াছি কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। বিন্দুবাসিনী ও জানিতেন জাহ্নবী দেবী তাঁহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া স্বামীর মতভেদ করিতে পারেন নাই। শেষে বিন্দুবাসিনী কি করিবেন একমাত্র কন্যার সুখের জন্য আপনার সমস্ত বিষয় জামাতার নামে লিখিয়া দিতে স্বীকৃতা হইলেন। তবে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে তাঁহার জীবদ্দশা অবধি মাসিক দশ টাকা করিয়া দিব। একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। লেখা পড়া ঠিক হইয়া গেল। ভজহরি জীবিত থাকিলে বোধ হয় তাঁহার কন্যার সহিত বীরেশ্বরের পুত্রের বিবাহ অসম্ভব হইত, উন্নত কুলশীল ভজহরি বোধ হয় এ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতেন না। কিন্তু অর্থহীনা বিন্দুবাসিনী কন্যার ভবিষ্যৎ প্রতি দেখিতে গিয়া নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি যে নিজের আত্মাভিমান ভুলিয়া, নিজস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া এ কার্য্য করিলেন কেহ তাহা দেখিল না, সমাজ তাহার কোনও প্রতিবাদ করিল না। পিশাচ বীরেশ্বরের হৃদয় সামান্য একজন স্ত্রীলোকের এরূপ ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া একটু বিচলিত হইল না। হায়! অর্থ তুমি মানুষকে এইরূপই মনুষ্যত্ববিহীন করিয়া ফেল।

৭

পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন এ বিবাহে যমুনার মা বিন্দুবাসিনীর এত জেদ কেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা আমার একটি মাত্র

কন্যা যাহাতে চিরসুখিনী হয়, যমুনা মাতা তাহার গুণবতী কন্যা যেন সৎপাত্রে পড়ে। এই জন্য তাহার এত জেদ। শেষে বিরেশ্বরবাবু কিছুতেই স্বীকৃত হন না দেখিয়া বিন্দুবাসিনী দশ টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া জামাতাকে সমস্ত বিষয় দানপত্র লিখিয়া দিলেন। বিরেশ্বরবাবু স্ত্রীর দ্বারা যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল দেখিয়া বিবাহ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভজহরির ভদ্রাসন টুকু হস্তগত করাই বিরেশ্বর বাবুর উদ্দেশ্য। যাহার যত অর্থ তাহার অর্থাকাঙ্ক্ষা যে তত বলবতী বিরেশ্বরের কার্য্য কলাপে তাহা বিশেষ প্রতীতি জন্মিবে। একজন অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে বিরেশ্বরবাবু কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সমাজও এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করিল না। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল অমন একটা বড় ঘরের শিক্ষিত পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইলে ইহার কমে কিছুতেই হয় না। বিরেশ্বরবাবু যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে মহৎ লোক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। অন্যত্রে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইত।

যমুনার রূপ ও গুণও সেইরূপ, রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশে যমুনা দরিদ্রের আঁধারে গৃহে উজ্জ্বলতম রত্ন বিশেষ, কিন্তু আমাদের সমাজে এ রত্নের আদর নাই; তাই ধনের বিনিময়ে এই রত্নের আদর হইল। পোড়া সমাজের চক্ষু নাই, তাহাদের বিচার বিবেচনা নাই, তাই রত্নগর্ভা বিন্দুবাসিনীর রত্নস্বরূপা কন্যার বিবাহে তাঁহাকে ভবিষ্য সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল।

৮

শুভদিনে ললিতের সহিত যমুনার শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ললিত ও যমুনার বহুদিনের একত্র সম্মিলন আজ অক্ষুণ্ণ হইল। অদৃষ্টদেবতা বিপরীত পরিচালিত না করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট পথে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহারা জানিতে পারিলেন না এ বিবাহ কি প্রকারে হইল। যমুনা জানিল যে, তাহার মাতা তাহার বিবাহে উদরান্নের সম্বল টুকু হারাইলেন। ললিত জানিতে পারিলেন না যে তাহার পিতা কিরূপে একজন অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। কারণ তাহারা এখন বালক এরূপ গুরুতর বিষয়ে তাহাদের আবশ্যক কি? পিতামাতার কর্ত্তব্য কাজ পিতামাতা করেন। ভাগ্যদেবতা তাহাদিগকে সুখী করিলেন এই সুখেই তাহারা সুখী। যমুনার মাতা বিন্দুবাসিনীও জানিতে পারিলেন তাহার একমাত্র কন্যাত ভাত কাপড়ের কষ্ট পাইবে না, আর স্বামীসুখেও

চিরসুখিনী হইবে। আমি আর কতকাল বাঁচিব, ঐ দশ টাকা মাসিক পাইলেই যথেষ্ট হইবে। বিন্দুবাসিনী এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত মনে করিয়া সুখস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

উপসংহার।

যমুনা ও ললিতের বিবাহ ঠিক বয়সে হইল। ললিত কলিকাতায় পড়িতে লাগিল, আর সোহাগ প্রতিপালিতা, লাবণ্যলতা যমুনা মাতার ও শ্বশ্রুর প্রতিপালনে সংবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলে সকলে বলিল এ বিবাহ রাজযোটক হইয়াছে, ললিত শান্তশিষ্ট ছেলে পিতার অবাধ্য নয়। হিন্দুর নিয়মানুসারে সে পিতা মাতার মতের উপর মত প্রকাশ করিতে পারেনা আর করিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে কে? ললিত ত এখন উপযুক্ত হয় নাই যে পিতার বিষয়ে কি প্রতিবাদ করিবে? বৎসরাবধি বিশ্বেশ্বর বাবু কথামত বেহানকে মাসিক দশ টাকা করিয়া প্রদান করিলেন। এক বৎসর পরে দ্বিরাগমনের দিনস্থির করিয়া বিশ্বেশ্বর বাবু বধূমাতাকে গৃহে আনিলেন। এখন হইতে বিন্দুবাসিনীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একরূপ শেষ হইল। তিনি বুঝিলেন আর ত বিন্দুবাসিনীর কিছু নাই যে গ্রহণ করিব। এখন বেশী ঘনিষ্ঠতা করিলে বরং সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতে হইবে। বিন্দুবাসিনীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত মাসিক ১০৲ টাকা দেওয়াও বিশ্বেশ্বরের ভার বোধ হইল। হায় বিন্দুবাসিনী; তুমি নিজ দোষে কি করিতে কি করিয়া ফেলিলে অর্থপিশাচ বিশ্বেশ্বরকে ভাল জানিয়া নিজের অন্নসংস্থান পরের হাতে তুলিয়া দিলে?

বিন্দুবাসিনী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া তিনি আপনার ভ্রাতার নিকট আনন্দপুরে চলিয়া গেল। এবং বৈবাহিককে বলিয়া গেলেন তাহার মাসিক ১০৲ টাকা যেন আনন্দপুরে পাঠান হয়। বিশ্বেশ্বর তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বিন্দুবাসিনীর ভ্রাতার তাদৃশ আয় ছিল না; তিনি একপ্রকার অনশনে অর্দ্ধাশনে স্ত্রী পুত্র লইয়া কাটাইতেন বৃদ্ধবয়সে তাহার অন্য কোনও উপায় নাই। তাহার উপর ভগ্নীর ভার পড়িল। বিন্দুবাসিনী তথায় থাকিয়া বৈবাহিককে টাকার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু আর সে পত্রের কোনরূপ উত্তর বা টাকা পাইলেন না এদিকে তাহার বৃদ্ধভ্রাতা কিছুদিন পরে পরলোক গমন করিলেন। অভাগিনী বিন্দুবাসিনী ভ্রাতাজায়া ও তদীয় পুত্রগণ সহ ঘোরতর দুঃখার্ণবে নিমজ্জিতা হইলেন। আজ হইতে তাহাদের প্রকৃত অনশন আরম্ভ হইল। পাঠক বিন্দুবাসিনীর এ অনশন কিসের জন্য, কেবল কন্যাদায় কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? তিনি না হয় কন্যার হিতের জন্য বিশ্বেশ্বর বাবুর পুত্রকেই জামাতারূপে গ্রহণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় বিরেশ্বরবাবু অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া, অর্থের জন্য অনাথা স্ত্রীলোককে অনশনে দিনপাত করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কেবল পাপস্বার্থসিদ্ধিই তাহার এত প্রিয় হইল? এ সকল সমাজও এ সকল অত্যাচার দেখিয়া দেখিল না বরং ধনলোভে বিরেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা করিল। যতদিন না সমাজ হইতে পুত্রপণরূপ এই ঘৃণিত বৃত্তি লোপ পাইবে, ততদিন আমাদের বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভ সমস্তই বৃথা। সাং সং।

সোণার পারিজাত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যুবতী সাহসে ভর করিয়া সেই সিড়িদিয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। অনেক দূরে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে যুগপৎ বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া পড়িল।

সে দেখিল, তিন চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন একটী সুন্দর গৃহ—গৃহের ভিত্তি সুদৃঢ়;—কালের কালিমাময় হস্তে তাহা এখনও কলুষ কালিতে পরিপূর্ণ হয় নাই—তাহার গাত্রস্থ চূণকালি এখন অখণ্ড ও অক্ষত অবস্থায় আছে,—সেই গৃহ কয়টীর জানেলা লোহা দ্বারা বিনির্ম্মিত, কিন্তু দুইটী গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ,—একটীর অর্গল দৃঢ়রূপ আবদ্ধ। যুবতী সাহসে ভর করিয়া একটা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, কিন্তু কাঁপিতেছিল।

যে গৃহে সে প্রবেশ করিল, তাহার মধ্যে দুইখানি খট্টা এবং অনেক পিত্তল কাঁসার দ্রব্য ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়াছিল। তাহার অবস্থা দর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—অনেকদিন পূর্ব্বে এই গৃহে কাহারা বাস করিত,—যাহারা বাস করিত তাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং দুঃখী ছিল না,—কিন্তু কেন এবং কোন্ পথে তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহা স্থির করিবার কোন উপায় নাই। তবে সে উপায় না থাকিলেও সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্রব্যরাশি দর্শন করিলে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা যখন গিয়াছে, তখন নিতান্ত সুস্থচিত্তে এবং অনুদ্বিগ্ন মানসে যাইতে পারে নাই। তাহাদের ব্যবহার দ্রব্যগুলিও গুছাইতে পারে নাই।

যুবতী সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিক অবলোকন করিয়া গৃহমধ্যে বাহিরের আলোক আসিবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। তবে এমনভাবে গৃহনির্ম্মিত যে, সেখানে নিরুদ্ধশ্বাসে মানুষকে মারিতে হয় না। যুবতী সেই গৃহটিতে দাঁড়াইয়া থাকিল,—চারিদিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ সন্ধানের দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিল,—কিন্তু সেই বহু দিনের পরিত্যক্ত, অনাদৃত বাসনগুলি আর খট্টা দুইখানি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সেই গৃহ দিয়া আবার অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পথ না থাকায় যুবতী বাহির হইয়া আবার অন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। যে প্রকোষ্ঠে সে প্রবেশ করিল, সে প্রকোষ্ঠে অন্য কোন দ্রব্যই দেখিতে পাইল না,—কেবল কতকগুলি ছিন্ন কাগজ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পতিত রহিয়াছে, যুবতী কাগজগুলি দেখিবার জন্য হাতের প্রদীপটা যেমন মেঝেয় নামাইতে গেল, অমনি প্রদীপটা গড়াইয়া পড়িল,—তেল টলিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি সে বর্ত্তিকা তুলিয়া লইতে গেল, কিন্তু হাতে অগ্নির উত্তাপ লাগিয়াছিল,—বাতি নির্ব্বাণ হইল।

প্রদীপ নিবিয়া গেল, কিন্তু গৃহ অন্ধকার হইল না। সমস্ত গৃহে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্নিগ্ধ স্বর্ণোজ্জ্বল আলোকমালা বিকীর্ণ হইল যুবতী অত্যন্ত বিস্ময় চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল,—তাহারই অদূরে একটা কোলোঙ্গির উপরে একখানি ক্ষুদ্র স্ফটিকাধারে একটী গোলাকার পদার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই এই আলোক রশ্মি নির্গত হইতেছে। যুবতী চন্দ্রকান্ত অয়স্কান্ত প্রভৃতি মণির নাম শুনিয়াছিল,—এবং শুনিয়াছিল, সেই সকল মণি হইতে এইরূপ আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া অন্ধকার বিদূরিত করিয়া থাকে। কিন্তু সে কখনত সেই সকল মণি প্রত্যক্ষ করে নাই, তবে উহা হইতে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করায় সে মনে মনে স্থির করিল, ইহা নিশ্চয়ই সেই জাতীয় কোন মহামূল্য মণি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন সে, সেই মণিটীর নিকট গমন করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, উহা সুশীতল। তখন স্ফটাকাধার সহ সেই মণিটী লইয়া গৃহ চত্বরে যে বিস্তর বিক্ষিপ্ত কাগজের রাশি ছিল, তাহার নিকট আগমন করিল।

কাগজ গুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং তাহার অধিকাংশ মূষিক কর্ত্তিত। তাহাদের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টতই অনুভব হয় যে, এই কাগজের অধিস্বামী বা অধিস্বামিনীগণ বহুদিন ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং বহুদিন হইতে ইহাদের উপরে আরসুল্যা এবং মূষিকেরা অবাধ আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। যুবতী স্থির করিল, এইস্থান হইতেই বোধ হয় ইন্দুর সেই ছিন্ন ও পুরাতন কাগজ লইয়া গিয়া উপরে উঠিয়াছিল, সে তন্ন তন্ন করিয়া কাগজগুলি পাঠ করিল, কিন্তু সেই কাগজে যাহা লেখা ছিল,—সেরূপ আর কোন লেখা কোথাও দেখিতে পাইল না। যে কাগজগুলি সেখানে ছিল,—তাহার অধিকাংশ জমিদারি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দলিল পত্র ও হিসাব

আছে। যুবতী যতদূর পারিল, ততদূর পরিশ্রম করিয়া কাগজগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিল,—তারপরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সেগুলিকে বন্ধন করিয়া রাখিবার উপযুক্ত কোন বস্ত্রখণ্ডাদি প্রাপ্ত হইল না। তখন তাহার মনে পড়িল, যে গৃহে সে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহে খট্টার উপর যে শয্যা দেখিয়াছিল, তাহা হইতে বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়িয়া আনিয়া কাগজগুলি বন্ধন করিবে। মণিটী হাতে করিয়া সেগৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রথমে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহে আবার গমন করিল।

খট্টার নিকটে গিয়া শয্যার উপরকার চাদর খানা টানিয়া তুলিল,—উপাধানের নিম্নে চাদর পাতিত ছিল, সুতরাং চাদর টানিতে উপাধানটাও উল্টাইয়া গেল,—তাহার তলদেশ হইতে একটা চাবি বাহির হইয়া পড়িল। যুবতী চাবিটী লইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, তারপরে চাবিটী বামহস্তে করিয়া চাদর তুলিয়া লইয়া অপর গৃহে গমন করিল,—এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত কাগজগুলি একত্র করিয়া সেই চাদরে বন্ধন করিল, তৎপরে, সেগুলি গৃহের একটা তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইয়া একবার ভাবিল, এই অত্যুজ্জ্বল মণিটী যেখানকার সেইস্থানে রাখিয়া যাই। ইহা লইয়া যাইবার আমার কোন অধিকার নাই,—কিন্তু এই অন্ধকারময় পাতাল পথে বিনা আলোকে যাইব কি প্রকারে? তখন মনে মনে স্থির করিল, এটা লইয়া উপরে উঠিয়া যাই, এবং উপর হইতে প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া আসিয়া আবার যেখানকার মণি সেই স্থানে রাখিয়া যাইব। সেই স্থির হইল।

তারপর তাহার মনে হইল, উপাধানের তলে যে চাবিটী পাওয়া গেল, উহা কোথাকার চাবি, অথবা তাহার সন্ধানেই বা আমার বিশেষ প্রয়োজন কি? কিন্তু যে সন্ধান করিতে আসিলাম, তাহার সন্ধান মিলিল কৈ? যে পত্রখানি পাইয়াছিলাম, তাহার সন্ধান হইল কৈ?

তখন সে স্থির করিল, আরও কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হইবে,—আরও কিয়ৎক্ষণ ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

যে গৃহটী আবদ্ধ ছিল, যুবতী তাহারই দ্বারের নিকটে গমন করিল,—দেখিল, সে দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ, তাহার মনে হইল, হয়ত এই গৃহেই মানদাসুন্দরী আবদ্ধ ছিল, হয়ত এই গৃহে তাহার জীবনের অবসান হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ইহা খুঁজিবার উপায় কি, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ কোথায়? সে তখন সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সেই গৃহের পশ্চাৎদিকে একস্থানে

দেখিতে পাইল, ক্ষুদ্র একটী দ্বার,—একজন মানুষ অতিকষ্টে সেই দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। দ্বারে একটী বৃহৎ চাবি আবদ্ধ। যুবতী সেই দ্বারের নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িল এবং নিজহস্তেই চাবি-দ্বারা সেই কুলুপ খোলে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—সেই চাবিতেই কুলুপ খুলিয়া গেল। তখন যুবতী আনন্দিত হইল এবং সেই ক্ষুদ্র লৌহদ্বার টানিয়া খুলিয়া ফেলিল,—তারপর অতিকষ্টে সেই অপরিসর পথে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

পূর্ব্বে যে দুইটী গৃহে সে গমন করিয়াছিল সে দুটি গৃহ যেরূপ পরিসর এই গৃহটী তাহা হইতে অনেক অধিক পরিসর। কিন্তু যুবতী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, সেই গৃহ-মধ্যে একখানি সুদৃঢ় ও স্থূলপর্দ্দা ঝুলিতেছিল, সে যেদিকে দণ্ডায়মান ছিল, সেদিকে অন্ধ-কার তবে তাহার হস্তস্থিত মণির আলোতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু পরদার অপর পার্শ্বে যেন আলোক জ্বলিতেছিল, তাহা সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাড়িৎ প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, এবং ভয়ে তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বত্র নীরব—সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ।

যুবতী তাহার হস্তস্থিত আলোক সাহায্যে একবার সেই গৃহের মেঝের দিকে চাহিয়া দেখিল,—দেখিল, একটী শয্যা পড়িয়া আছে এবং তাহার উপর একখানি নরকঙ্কাল বিরাজ করিতেছে। নরকঙ্কালের মাংসাদি বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে কেবল শুধু অস্থিমালা প্রকৃত এবং অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহি-য়াছে। তাহার অদূরে এক কৃষ্ণকেশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। যুবতী তদ্দর্শনে শিহরিয়া উঠিল,—তাহার বক্ষঃ পঞ্জর অতিদ্রুত বেগে কম্পিত হইল,—তাহার মনে হইল, হয়ত মানদাসুন্দরীর ইহা মৃত্যু শয্যা হয়ত তাহারই সেই কঙ্কাল এই শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে আর পর্দ্দার অন্তরালে চাহিতে ইচ্ছা করিল না,—একবার ভয় বিহ্বল নেত্রের সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে চাহিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল,—কিন্তু সহসা পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল,—তারপর পর্দ্দার মধ্য হইতে একখানি অতিসুন্দর গৌরবর্ণ হাত বাহির হইল, দেখিতে দেখিতে দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু দেখা দিল,—তারপর সর্ব্বাঙ্গে গৈরিক-বসনাবৃত একমূর্ত্তি পর্দ্দার মধ্য হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"সোণামুখি, তোমার ধন্য সাহস।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সংক্ষিপ্ত—সমালোচনা।

প্রবাহ। আশ্বিন। প্রথমেই ভক্ত অভিরামের "উদ্বোধন" অতি সুন্দর ভক্তিগদগদ কণ্ঠে এমন ভক্তিপূর্ণ আবাহন আমারা অনেক দিন শুনি নাই—মা জগদম্বা ভক্তের বাসনা পূর্ণ করুন "নিয়তি শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তার একটী অতি ক্ষুদ্র কবিতা—ইহার মধ্যে কিন্তু কবিত্ব পাইলাম না—এমন কবিতা ত অনেক পড়িয়াছি আর কেন? শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুর দুইভাই একটী ক্ষুদ্র কথা আমারা কয় বারই নারায়ণ বাবুর লেখার ভঙ্গি ও তাঁহার মিষ্টত্বের প্রশংসা করিতেছি কিন্তু তিনি বহু দিন চর্ব্বিত গল্পগুলির কাঠামোয় তাঁহার কৃতিত্ব না দেখাইয়া নূতন প্লটে (গল্পাংশ) তাঁহার ক্ষমতা পরিচালনা করিলে আমরা বড় সুখী হইব কারণ তাঁহার লেখা বড় উচ্চঅঙ্গের এইপুরাতন প্লটেও যে সুকুমার স্নেহসিক্ত সুরভিস্রোত প্রবাহিত করাইয়া দিল তাহা অবর্ণনীয়। আশ্বিন কবিতা মন্দ নহে। বাঞ্ছারামের পাঁচকথা আমাদের গৃহে গৃহে অধুনা প্রচলিত কথাবার্ত্তায় একখানি নিখুঁত ফটো উঠিয়াছে সম্পাদকের প্রতিজ্ঞা এবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে—যেমন জলদ গম্ভীর ভাবা তেমনি ওজস্বীতার এখনও যেন বোধ হয় দামোদর বাবুর জীমূত মন্দ্র আমাদের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত করিতেছে "মা" হয় শক্তি দাও নয় তোমার এ অধম সন্তানগণকে তুমিই লও অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ নয় তন্মধ্যে ভাষা ও ব্যাকরণ উল্লেখ যোগ্য।

ঊষা। ভাদ্র। উহার আর কি সমালোচনা হইবে; প্রবন্ধাভাবে সম্পাদক যাহা তাহা তুলিয়া দিতেছেন মুকুলে প্রকাশিত তৎপরে সেকালের কথায় প্রকাশিত ডাইনাশর তুলিয়া দিয়াছিলেন—যাহা একবার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আবার কেন এবার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ একটীও নাই সকলি তরুণ বালকের ন্যায় তবে প্যারীবাবুর বাবু মঙ্গের ভাল—ইহারা ছেলে ভুলাইয়া কাগজ চালাইতে চাহেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু গ্রাহকের ইহা পাঠ করিয়া কি ফল হইবে?

উপাসনা জ্যৈষ্ঠ। কার্ত্তিক মাসের উপাসনার সংখ্যা পাইয়া আমরা কেমন একটু বিস্মিত হইবার কারণ চন্দ্রশেখর বাবুর পৃষ্ঠপোষক থাকা সত্বেও পত্রিকা খানি এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশিত হওয়া বড় দুঃখের বিষয়—যাহা হউক পত্রিকাখানি নানাবিধ সুপাঠ্য প্রবন্ধে পূর্ণ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত ৺রামবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা এরূপ প্রাচীন পুস্তকের সামালোচনা ও পুনঃ সংস্করণ

হওয়া বড় বাঞ্ছনীয়। স্পর্শমণি একটী গল্প—তরুণরসে পূর্ণ বড় পাকাহাতের বলিয়া বোধ হইল। বেদান্ত বিষয় বেশ সরসভাবে লিখিত হইতেছে। "স্পিনহারিস্কোপ" নবাবিষ্কৃত রিডিয়ম ধাতুর বিশ্লেষণ বেশ মধুরভাবে লিখিত হইতেছে স্বদেশ কবিতাটী বেশ সুন্দর হইয়াছে "আমি কারে চাই" আজ কালকার সে পাগলিনীমূর্ত্তি নাই চাহিলেন—এখন অন্য কিছু চাহিলে ভাল হয় না। গ্রন্থসমালোচনা বেশ চলিতেছে।

ভারতী। আশ্বিন। প্রথমেই শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্তের "মাতৃভূমির প্রতি" একটি কবিতা উক্তিটা মনুষ্যোচিত হইয়াছে তৎপরেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নির্ব্বাচিত একটি গল্প—বেশ আড়ম্বর বর্জ্জিত সরল সুন্দর —আমাদের বড় ভাল লাগিল। তুকারামের আত্মকাহিনী—ভাল লাগিল না। পণ্ডিতবর সতীশ বাবুর তিব্বত দেশের বজ্রভৈরব একটি অবশ্য পাঠ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রিয়ম্বদা দেবীর "সুখ" একটি কবিতা—অনেকটা কবিতারই মতন বলিয়া বোধ হইল। অমঙ্গল বড় সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। স্বর্ণকুমারীদেবীর জীবন অভিনয় মনুষ্য জীবন নাটকের একটি উজ্জ্বলদৃশ্য পাঠে বড় তৃপ্তি অনুভব করিলাম। তৎপরেই "মহানাটক" এক মহাপর্ব্ব! কতদিনে শেষ হইবে অমৃতবাবুর ঘরের কথা পরের কাছে বলিয়া বড়ভাল করিতেছেন না যাহাই হউক তাঁহার লেখায় সরল সৌন্দর্য্যে ও সজীবতায় আমরা মুগ্ধ। "ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার" কি মাসিক পত্রের উপর রাজেন্দ্র বাবুর অত্যাচার নহে। বরবাটও স্বদেশীয়য় স "অভয় বাণী" প্রভৃতিও উল্লেখ যোগ্য। গানটী আমাদের বড় ভাল লাগিল। খেয়ালী খাতায় মধ্যে মাননীয়া সরলা দেবীর ও বিজয় বাবুর কথা না থাকিলে বাস্তবিকই খেয়াল হইয়া পড়িত। এ খেয়াল কতদিনে মিটিবে।

শ্রীসমালোচক শর্ম্মা।

কলিকাতা, ১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আলোচনা।

"মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।"

নবম বর্ষ। } মাঘ সন ১৩১২। { দশম সংখ্যা।

অনুতাপ।

আমাদের বাগানবাড়ীর বারাণ্ডা ঠিক গঙ্গার উপর। বৈশাখ মাস, রাত্রে বড় গ্রীষ্ম হইতেছিল বলিয়া ঘরের মধ্যে থাকিতে পারিলাম না; বিছানা হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি যে, আকাশে একখানা ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে, গঙ্গাবক্ষে তাহার ছায়া পড়িয়া তটিনী যেন ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া একটু সুস্থ হইলাম। দেখিতে দেখিতে মেঘখানা সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড় উঠিল, গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখি যে, অন্ধকার ভেদ করিয়া তীরবেগে একখানা নৌকা আসিতেছে,—নৌকাখানি আসিয়া বারাণ্ডার নীচে আমাদের ঘাটে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম এবং দেখিলাম যে, নৌকার মধ্যে একটী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স অল্প—বেশ সৌম্যমূর্ত্তি। আমি বলিলাম, "আপনি কেন নৌকায় বসিয়া থাকিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ঘরে চলুন, ঝড় থামিয়া গেলে পুনরায় যাত্রা করিবেন"।

সন্ন্যাসী দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন, আমি তাঁহাকে আমার সম্মুখেই একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলাম, তিনিও বসিলেন, কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কোনও কথার উত্তর দিলেন না। কিম্বা নিজে কোনও কথাও বলিলেন না। সন্ন্যাসী মৌনী না কি?

আমি বড় বিপদে পড়িলাম, অপরিচিত সন্ন্যাসীকে কি বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি মৌনী কি না তাই বা জিজ্ঞাসা করি কি করিয়া; বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। শেষে সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আপনার জিনিষপত্রগুলো নৌকা থেকে উপরে

নিয়ে আসব কি"? সন্ন্যাসী বলিলেন,—"একটী কাঠের বাক্স আছে, যদি আপনার চাকরকে আন্‌তে বলেন তো ভাল হয়"।

আমি রামচরণকে বাক্স উপরে আনিতে বলিলাম। রামচরণ তৎক্ষণাৎ বাক্সটী সন্ন্যাসীকে দিয়া গেল।

আমি সন্ন্যাসীকে বলিলাম,—"মহাশয়, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার কাছে অত কুণ্ঠিত হ'বার প্রয়োজন নাই,—আমার নাম শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

"আপনার নিবাস?"

"গোপালপুর গ্রামে।"

"আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কত দিন?"

"প্রায় দশবৎসর হইবে।"

"বাটীতে আপনার কেহ আছেন?"

সন্ন্যাসীর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। একটু থামিয়া তিনি বলিলেন,—"ছিল সব, এখন কেহ নাই।"

সন্ন্যাসীর বিষয় ভাল রকম জানিবার আমার বড় ইচ্ছা হইল,—আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে পারি কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন, শুনিবেন কি? আমি তাহাই চাই, আমার পাপময় জীবনের ইতিহাস কাহারও নিকট বলিতে পারিলে আমার যেন তৃপ্তিলাভ হয়।

আমি বলিলাম,—তবে অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলুন।

গোপালপুরগ্রামের ৺রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আমি কনিষ্ঠ পুত্র, আমার পিতৃদেব বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার অগ্রজ ৺যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। হায়! শুভক্ষণে দাদা আমার অভিভাবক হইয়াছিলেন। মন্দভাগ্য আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছি। দাদা আমার তিরস্কার করিলে আমি রাগ করিতাম, কত কুচিন্তা মনে আসিত, ভাবিতাম,—দাদা বুঝি আমায় ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাকে কোনও বিষয় জানিতে না দিয়া সমস্ত সম্পত্তি বুঝি নিজে ভোগ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। হায়! আমার বুদ্ধি।

আমি যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখন হইতেই আমার অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। একে একে যৌবনের সমস্ত দোষগুলি আমায় ঘিরিয়া ফেলিল। আমি বিকাশোন্মুখ প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে

চেষ্টা করিতাম না, বাসনা এবং কামনা যখন যেদিকে ফিরাইত, তখন সেই দিকেই ফিরিতাম। সময়ে সময়ে ভাবিতাম আমাদের এত বিষয়সম্পত্তি, কিন্তু তবু আমার পক্ষে বিলাসিতার দ্বার রুদ্ধ কেন? যত নষ্টের মূল দাদা। তিনি থাকিতে আমার বুঝি সুখ হইল না।

এক একবার যখন প্রকৃতিস্থ থাকিতাম, তখন মনে হইত—দাদা আমার মঙ্গলের জন্যই তিরস্কার করিতেছেন, কিন্তু এ ভাব অধিকক্ষণ থাকিত না। একটু পরে ঘাড়ে ভূত চাপিলেই আমার মনে হইত—দাদার তো পুত্র কন্যা নাই, তবে কি যথা সর্ব্বস্ব বৌদিদিকে দিবেন নাকি?

দাদার গম্ভীর মুখের দিকে আমি চাহিতে পারিতাম না, কিন্তু বৌদিদির হাসি হাসি মুখখানি দেখিলেই সব ভুলিয়া যাইতাম। যখন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতাম, তখন মনে হইত আমি বুঝি স্বর্গে। দাদাকে আমি মনে মনে বড়ই অশ্রদ্ধা করিতাম,—ভক্তি করিতাম বৌদিদিকে। তার স্নেহ আর যত্ন তাঁর মিষ্ট কথা একদণ্ডে আমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিত, দাদার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া আমি তাঁহার কাছে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতাম। উঃ এত অধঃপতনেও তাঁর উপদেশ বাক্য ভুলিতে পারি নাই। অন্ধ আমি তখন কেন বুঝিলাম না।

এই সময়ে সন্ন্যাসী একটু জল চাহিলেন। আমি তাঁহাকে জল পান করিতে দিলাম। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, আপনি আমায় ঘৃণা করুন—প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা করুন আপনার কাছে আমার হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া আমি একটু সুস্থ হই।

একদিন আমি চেন সমেত দাদার সোণার ঘড়ি চুরি করিলাম। তখন আমার টাকার দরকার—চারিদিকে বন্ধুরা উৎসাহ দিতেছে—আর কি রক্ষা আছে।

বৈকাল বেলায় যখন একজন বেশ্যার বাটী সমস্ত দিন বন্ধুদের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া ফিরিয়া আসি—রাত্রে প্রায় দাদার ভয়ে বাটী হইতে বাহির হইতে পারিতাম না—সেই সময় আমার নানারূপ দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল। তখন বেশ একটু গোলাপী নেশা হইয়াছিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম। "দাদা বড় বদলোক, তিনি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন, আর আমি কি কিছু করিতে পারি না? আমি দাদাকে কি করিয়া বিপদে ফেলিব, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। দাদা মরিলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। আমি সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইব। বৌদিদি মেয়েমানুষ, মিষ্ট কথায় মন সারিয়া লইব। ধিক আমার দুর্বুদ্ধি, আমি দাদাকে খুন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম এবং সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দাদার

ক্রিমত বলবান্, সহজে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিলাম; আমাদের বটতলা পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে এক খানা সবল হস্ত আমার কাঁধে পড়িল। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি,—রুদ্রমূর্ত্তি দাদা, দাদা বলিলেন, নরেশ! তুই আমার ঘড়ি চুরি করিয়াছিলি কেন? আমি অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলাম "কই আমিত চুরি করিনি।"

দাদা আমার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন,—"এখনও আবার মিথ্যা কথা, এটা কি?"

এই বলিয়া দাদা পকেট হইতে একটী ঘড়ি ও ঘড়ির চেন বাহির করিলেন। আমার আত্মা পুরুষ শুকাইয়া গেল, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম দাদা ঘড়ির নম্বর ধরিয়া, যে দোকানে আমি ঘড়ি বিক্রয় করিয়াছিলাম; সেখান হইতে সমস্ত ব্যাপার বাহির করিয়াছেন। আমি বেগতিক দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময় সজোরে দাদা আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তোর মুখে গন্ধ কিসের? একেবারে অধঃপাতে গেছিস; বাবা, তোকে কেটে ফেলবে। আমার বুক ধড় ধড় করিতে লাগিল এবং মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। দাদা বাটীতে আসিয়া আমাকে অত্যন্ত প্রহার এবং তিরস্কার করিলেন। বৌদিদি দাদাকে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পারিলেন না। দাদার এক ধমকানি খাইয়া এবং তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষান্ত হইলেন। আমি প্রহার খাইয়া সেই খানেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিত ভাবে বসিয়া রহিলাম। দাদা চলিয়া গেলেন।

আমি কাঁদিতেছি এবং রাগে কাঁপিতেছি, এমন সময় একখানি কোমল হস্ত আমার পিঠে পড়িল। বুঝিলাম বৌদিদির হাত। আমি মাথা গুজিয়া বসিলাম। নয়নজলের বৃদ্ধি হইল। আশ্রয়স্থল পাইয়া স্নেহের আধার পাইয়া আমার অভিমান উথলিয়া উঠিল—আমি আরও কাঁদিতে লাগিলাম।

বৌদিদি কত উপদেশ দিলেন, কত সান্ত্বনা করিলেন, কিছুতেই আমার ক্রোধ উপশম হইল না, শেষে চাহিয়া দেখি বৌদিদির চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কেমন কষ্ট হইতে লাগিল, বলিলাম—বৌদিদি তুমি কেঁদ না, আমার কপালে যা ছিল, তা হয়েছে।

বৌদিদি বলিলেন,—ঠাকুর-পো, রাগী লোকের কথায় রাগ করো না।

আমি বলিলাম, "না, বৌদিদি, তুমি কেঁদ না।"

বৌদিদি বলিল—তবে তুমি আমার ঘরে

এস, আমি তোমার জন্য খাবার রেখেছি,—খাবে এস।

স্নেহময়ীর নিকট আমি পরাজিত হইলাম—মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে বৌদিদি কার্য্যান্তরে গেলে আমি তাহার ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। চির মধুরশ্প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে আবার মিশিলাম, ক্রমে ক্রমে আমার ঘোর অধঃপতন হইল—হৃদয়ে সমস্ত পৈশাচিক বৃত্তি জাগিয়া উঠিল - লজ্জা সরমের ভয় ঘুচিল—আমি যে মাতাল এবং বেশ্যাগামী, তাহা সকলেই জানিল। এবারে মরিয়া হইয়া দাদাকে খুন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

আজ কাল দাদার সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হইত না। সম্প্রতি বউদিদির বড় জ্বর হইয়াছিল। নিউমোনিয়ার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। আমার মনে এক একবার বৌদিদির কথা উঠিত—মনটা খারাপ হইত। আবার সুরাদেবীর কৃপায় "যে আমি সেই আমি" হইয়া যাইতাম।

আমি দেখিলাম সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে চক্ষু মুছিতেছেন। বুঝিলাম অতীত স্মৃতিতে তার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। কিন্তু তাঁহার ইতিবৃত্ত শুনিতে আমার এত কৌতূহল হইয়াছিল যে আমি তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিতে পারিলাম না, তিনি বলিতে লাগিলেন।

আমাদের বাটীর পার্শ্বে মোহিনীদের বাটী, মোহিনী বালা বিধবা তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমার রূপজমোহ আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল, আমি নানা প্রকারে মোহিনীকে হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইলাম অবশেষে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া সেই বালবিধবার সর্ব্বনাশ সাধন করিলাম। তাহাকে বাটীর বাহির করিলাম এবং কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়া দিলাম।

ক্রমে মোহিনী আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। আমি তাহার পরামর্শে চালিত হইতে লাগিলাম। মোহিনীর অভাব বাড়িল। তাহার মদ চাই আমিই তাহাকে খাওয়াইতে শিখাইয়াছিলাম। তাহার গহনা চাই, আমিই তাহাকে পরাইয়াছিলাম। তাহার সমস্ত বিলাসিতা চাই, আমিই তাহাকে কুলত্যাগিনী করিয়াছিলাম। তাহার প্ররোচনায় আমি এবার দাদাকে খুন করিবার জন্য বিগুণ উৎসাহিত হইলাম।

বৌদিদির বড় অসুখ এখন যায় তখন যায় রাত্রে দাদা তার কাছে থাকেন এবং শুশ্রূষা করেন। আমি কলিকাতায় মোহিনীকে রাখিয়া বৌদিদির অসুখের জন্য বাটী আসিয়াছি, বৌদিদির আর বাঁচিবার

আশা নাই দাদা যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন আমারও নিবৃত্তি নাই কেবল ডাক্তারের বাটী ছুটাছুটী করিতেছি। বৌ দিদি অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। দাদা কেবল আমায় কাছে বসিতে বলিতেছেন। তিনি একাকী থাকিতে পারেন না। বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় দাদা আমায় বলিলেন "নরেশ তুই শুগে যা—আজ দু-দিন ক্রমাগত রাত জাগছিস্ অসুক কোর্‌বে। শেষ রাত্রে আমি তোকে ডেকে দিয়ে শোব এখন।" আমার শয়নের জন্য মন কেমন করিতেছিল না। দাদার কথা এড়াইতে পারিব না বলিয়া শুইতে গেলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আর থাকিতে না পারিয়া বৌদিদির ঘরের দিকে গেলাম। দ্বার ভেজান ছিল, আমি দ্বার পার্শ্বে যাইতেছি, কথা শুনিতে পাইলাম, বুঝিলাম দাদা ও বৌদিদি কথা কহিতেছেন। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম বৌদিদির যখন জ্ঞান হইয়াছে, তখন বোধ হয় বাঁচিবেন।

আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তখনও জ্যোৎস্না ছিল। চৈত্রমাস নৈশ মলয়ানিল সমস্ত শরীর যেন স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছিল। আমায় প্রাণের ভিতর কেমন একটা জ্বালা আসিল। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে স্নিগ্ধ সমীরণ যত আমার গায়ে লাগিতে আরম্ভ করিল ততই যেন বুকের ভিতর হুহু করিতে লাগিল।

দাদা বলিতেছেন—এখন কি একটু সুস্থবোধ করিতেছ?

বৌদিদি। হঁ্যা, এখন যেন অনেকটা সুস্থ কিন্তু বড়ই দুর্ব্বল। বৌদিদি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন। বৌদিদি আবার বলিল, দেখ ঠাকুরপোকে আমি অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখিতে ইচ্ছা হচ্ছে। আহা! তুমি তাকে শাসন কল্লে সে আমার কাছে কত অভিমান কর্‌তো, অনেকদিন তার কথা শুনিনি একবার তার কথা শুন্‌বো।

দাদা। তা শুন্‌বে এখন, একটু স্থির হও, সকাল বেলা তাকে তোমার কাছে ডেকে দেবো; আমার ইচ্ছা হইল, এখনি ছুটিয়া বৌদিদির কাছে যাই, কিন্তু আরও একটু স্নেহের অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা হইল। বৌদিদি যখন সুস্থ আছে তখন আর ভাবনা কি একটু কথা গুলো শুনিই না কেন।

বৌ দিদি আবার বলিলেন দেখ তোমার মতলব আমি কিছু বুঝিতে পারিনা তুমি ঠাকুরপোকে অত "মার কেন? আমি কখনও তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই আমার এই কথাটির উত্তর দাও।

দাদা—একটু হাসিয়া বলিলেন—"ছেলেটা অধঃপাতে যায় তাকে ধ্বংশের পথ থেকে

বাঁচাবার জন্ত এত শাসন করি। তোমরা মেয়ে মানুষ বুঝতে পারনাতো।

আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন আমি রসাতলে নামিয়া যাইতেছি। আমার চক্ষে স্পষ্ট বোধ হইল বৌদিদি দেবী দাদা পিশাচ। আমি ভাবিলাম এখনও ছলনা। আমাকে ধ্বংশের পথ থেকে বাঁচাবার জন্য শাসন হচ্ছে আমার এত হিতাকাঙ্ক্ষী তুমি।

আবার বৌ দিদি বলিলেন—"দেখ, আমার শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে কোনও যন্ত্রণা নেই তবু যেন বুকটার ভিতর খালি খালি বোধ হচ্ছে নিশ্বেস ফেলতে একটু কষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় আমি বাঁচবনা তুমি আমার কাছে ঠাকুরপোকে একবার ডেকে দাও আমি ভাল করে তার সঙ্গে একটু কথা কই। আমি আর প্রচ্ছন্ন না থাকিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দাদা বলিলেন এই যে নরেশ এসেছিস্? তোকে খুঁজেছিল। আমি গিয়া বৌ দিদির শিয়রে বসিলাম।

বৌ দিদি তখন ধীরে ধীরে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল ঠাকুর পো আমার সামনে এসে বস আমি তোমায় ভাল করে দেখতে পাচ্ছিনা। আমি বৌ দিদির কাছে বসিলাম তিনি ধীরে ধীরে আমার পিঠে হাত দিলেন।

আমার অনেক কথা মনে পড়িল। আর উপদেশ মিষ্ট কথা যেদিন দাদা প্রহার করিয়াছিলেন সেদিনকার কথা "ঠাকুরপো রাগী লোকের কথায় রাগ কোরোনা ঠাকুর পো" সমস্ত মনে পড়িল। আমার কান্না আসিতে লাগিল। দাদার দিকে চাহিয়া দেখি তিনি মাথা গুজিয়া কাঁদিতেছেন।

বৌদিদি বেশীক্ষণ আমার পিঠে হাত রাখিতে পারিলেন না। হাত লোটাইয়া পড়িল। তখন চিরপরিচিত চির মধুর কত কত উপদেশ দিলেন কত কথাই বলিলেন। প্রাতঃকালে উষা দেখা দিতে না দিতেই বৌদিদির জীবন দীপ নিভিল।

বৌদিদির মৃত্যুর পর হইতে দাদা আমায় বড় তিরস্কার করিতেন না। কিন্তু কি জানি দাদার উপর যে আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল তাহার অপনোদনও হইল না। আমি তখনও মোহিনীকে ছাড়ি নাই। বৌদিদির মৃত্যুর পরেই আবার আমি আমার পূর্ব্ব প্রকৃতি পাইলাম। রীতিমত সুধাপান করিতে লাগিলাম। দাদাও আবার পূর্ব্ববৎ তিরস্কার আরম্ভ করিলেন আমি বাটী যাইতাম না। যখন যাইতাম তখন দাদা আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। তাঁহার উপর আমার রাগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

দাদা আমার বাটীতে আসিতে পার

লিখিয়াছিলেন। একদিন বাটীতে আসিয়াছি; দাদা তাঁহার ঘরে বসিয়া কি লিখিতেছেন, আমি আসিয়া দাঁড়াইলাম। দাদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "নরেশ কাল সকালে কোথাও যাসনি।"

আমি বলিলাম "কেন দাদা?

দাদা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "প্রয়োজন আছে।"

আমি কহিলাম "শুনিতে পাই না।"

দাদা কহিলেন "তোমাকে কাল জনকয়েক লোক দেখিতে আসিবেন। আমি তোমার বিবাহ দিব।"

আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি মোহিনীর প্রেম পাশে আবদ্ধ, আমার কোন কথা ভাল লাগিল না। কেন আমি দাদার কথা শুনিলাম না। আমি বলিলাম "দাদা আমি বিবাহ করিব না।"

দাদার মুখখানা গম্ভীর হইল। কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে দাদা বলিলেন "নরেশ তোমাকে সৎপথে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মনে করিয়াছিলাম, বিবাহ দিয়ে তোমাকে সংসারী করিব। আর সুখের অভিলাষ নাই। এখন তুমি মানুষের মত হইয়া সংসারধর্ম্ম কর।"

আমি।—"দাদা! আমার বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছা নাই। আমায় ক্ষমা করুন, আমি বিবাহ করিতে পারিব না।"

দাদা।—নরেশ! আমার কথায় সম্মত না হওয়া কি ভাল দেখায় ভাই?

আমি বহুদিন দাদার নিকট এরূপ মিষ্ট কথা শুনি নাই। কিন্তু তাঁহার কথায় সম্মত হইতে পারিলাম না। আমি বলিলাম "দাদা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিবাহ করিতে বলিবেন না।"

দাদার মুখের উপর কালো মেঘের মত একটা ছায়া পড়িল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত কহিলেন "যাও ভাই, আমি তোমাকে আর কোন কথা বলিব না, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় কর।" দাদা কাপড়ের অগ্রভাগ দিয়া মুখ মুছিলেন কি চোখ মুছিলেন ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

আমি পরদিন প্রভাতেই কলিকাতায় মোহিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এবং দাদার নিকট আমার ঠিকানা গোপনে রাখিবার জন্য অন্য একটী বাটী ভাড়া করিয়া মোহিনীর সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। মনে রাখিবেন আমি তখন নাবালক। দিন কতক বেশ কাটাইতেছি। মোহিনী বড়ই যত্ন করে। আমার বন্ধুরা সন্ধ্যার পর একে একে আসিয়া জোটে। সমস্ত রাত্রিই প্রায় আমোদ চলে। আমি

ক্রমেই কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িলাম। টাকার প্রয়োজন হইল; আমার দাদা টাকাগুলির বড় হিসাব রাখিতেন না। তিনি কাব্যামোদী; কাব্য লইয়াই ব্যস্ত। আমি নানাপ্রকার উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতেছিলাম, কিন্তু এখন আর চলে না, টাকা চাই।

একদিন একখানা চিঠি আমার নামে নূতন বাসায় আসিল। আমি দেখিলাম, দাদার হাতের লেখা। আমি অবাক! দাদা কি করিয়া আমার ঠিকানা জানিলেন? হায়! আমার এত কূটবুদ্ধিতেও চতুর দাদাকে ঠকাইতে পারিলাম না। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল;—

ভাই নরেশ!

জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। সাধ্বী সতী তোমার বৌদিদির মৃত্যুর পর আমার জীবনটা বড়ই শীঘ্র শীঘ্র কালসমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে। ভাই! আমার কেহ নাই, একমাত্র তুমি আছ। কিন্তু ভাই তুমি ত পারিলে না। এত বিষয় সম্পত্তি কাহাকে দিব? স্বর্গীয় পিতার কীর্ত্তি ত লোপ করিতে পারি না। তুমি ত দুইদিনে উড়াইয়া দিবে। তোমার অংশ তুমি লইও। আমার দেবত্র করিয়া দিলাম। দুই চারি দিন পরে আমি গৃহত্যাগ করিব। তোমার দলিল পত্র যাহা কিছু প্রয়োজন, আমার ঘরে লোহার সিন্দুকে পাইবে। চাবি দেওয়ান মহাশয়ের নিকট রহিল। বোধ হয় তোমার সহিত আর দেখা হইবে না। ইতি ২০শে আশ্বিন সন—

আশীর্ব্বাদক

তোমার দাদা।

পত্র পড়িয়া দুঃখ হওয়া দূরে থাক, আমার রাগ হইল। আমি ভাবিলাম, দাদার অংশ আমি পাইব, দেবত্র করিতে দিব না। যদি তিনি ইতিমধ্যে সম্পত্তি দেবত্র করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিব। আমি থাকিতে তিনি তাঁহার অংশ দেবত্র করিবেন কেন?

সে দিন রাত্রে খুব সুরাপান করিলাম। মোহিনীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে আমায় অত্যন্ত উৎসাহ দিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে আমি বাটীর দিকে যাত্রা করিলাম।

বাটীতে আসিয়া দেখি, দাদা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাঁহার রূপ ও বলব্যঞ্জক দেহ ছিল, সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি ভাবিলাম এ সমস্ত ভণ্ডামী। দাদা বলিলেন, "নরেশ! আমি পরশ্ব বাটী হইতে যাত্রা করিব; তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমার অংশ আমি দেবত্র করিয়া দিয়াছি, তুমি তোমার অংশ বুঝিয়া লও।"

আমি বলিলাম—"আমি থাকিতে তুমি

কেন তোমার অংশ দেবত্র করিলে? কাজটা কি ভাল হইল?"

দাদা মাটির দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ভাল হউক, মন্দ হউক, তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।"

আমি কোন কথা না বলিয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে আমার ঘরে গিয়া বসিলাম। মনে করিলাম, শেষরাত্রে দাদাকে খুন করিব। মানবের অধঃপতন হইলে এইরূপই হিতাহিত বিবেচনা লোপ হইয়া থাকে?

রাত্রে অত্যন্ত সুরাপান করিলাম। প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটার সময় আমি উঠিলাম। একখানা ছোরা লইয়া দাদার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। সুরায় আমার বিবেকশক্তি অপহরণ করিয়াছিল। মনে পড়ে, সেদিন অন্ধকার রাত্রি, আকাশের এককোণে এক খণ্ড মেঘ নক্ষত্রগুলির ক্ষীণকান্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছিল। অন্ধকারে আমার দেহ আবৃত হইয়াছিল। হায়! কেন আমি তখন মৃত্যুর ছায়ায় আবৃত হইলাম না। দাদার ঘরের কাছে গিয়া প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। আবার সুরার উত্তেজক শক্তিতে সাহস পাইলাম। দরজা খুলিয়া দেখি, দাদা একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে গীতা পাঠ করিতেছেন। আমি আর বিলম্ব না করিয়া বাঘের মত দাদার স্কন্ধদেশ আঁকড়াইয়া ধরিলাম এবং তাঁহার বক্ষে আমূল ছোরা বসাইয়া দিলাম। দাদা একবার বলিলেন, "কেও? নরেশ?—নরেশ?—আমি ত তোর কোন ক্ষতি করিনি ভাই।" সব শেষ! দাদা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আমি কম্পিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে মোহিনীর নিকট পলাইয়া আসিলাম। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম আমার কোন বন্ধুর সহিত সে অগ্রে পলাইয়াছে। সেই দিন হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে কেমন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। সমস্ত জানি না কেন শূন্যবোধ হইতে লাগিল। আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

একদিন নর্ম্মদার তীরে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, আমাদের বাড়ীর দেওয়ান মহাশয় ঘাটে নামিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "কিহে নরেশ যে? আমি তোমার কত অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কোথাও পাই নাই। আজ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার জমীদারী তুমি দেখিবে চল।"

আমি বলিলাম, "সে কি দাওয়ান মশাই?"

দেওয়ান মহাশয় কহিলেন, "আর ভাই, যোগেশ বাবুকে কে খুন করেছে, আমি যখন সকালবেলা তোমাদের বাড়ীতে যাই, তখন

দেখি যে, তিনি তাঁর ঘরে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে, তখনও তাঁর একটু জ্ঞান আছে। আমি যেতেই তিনি একজন উকিল ডাক্‌তে বল্লেন। পাড়ার দু-একটী ভদ্রলোককেও ডাক্‌লেম। সকলে এলে তিনি সমস্ত বিষয় তোমার নামে উইল কোরে দিয়ে গেলেন। আমরা খুনীর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লেম। তিনি কেবলমাত্র বোল্লেন, "আমার আত্মীয়" এই তাঁর শেষ কথা—

আমি জ্ঞানশূন্য! নর্ম্মদার অপর পার্শ্বস্থ বিশাল অরণ্যের দিকে চাহিয়া আমি সংজ্ঞাহীনের মত বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "দাওয়ান মশাই,—আমি সন্ন্যাসী। আর আমার বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজন কি? চলুন, সমস্ত সম্পত্তি রেজেষ্ট্রি করিয়া আসি।"

দাওয়ান মহাশয় কোন কথা কহিলেন না। কেবল মাত্র আমাকে একটী চাবি দিয়া কহিলেন, "এই সিন্দুকের চাবী। যোগেশ! বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে আমাকে দিয়েছিলেন।" আমি কহিলাম, "চাবী আপনার নিকটেই থাক্‌।"

দাওয়ান মহাশয়ের সহিত আমি আমাদের গোপালপুরের বাটীতে আসিলাম। যখন বাটীতে প্রবেশ করি, তখন রাত্রি হইয়াছে। আমি আমার ঘরে গিয়া শুইলাম। রাত্রে নিদ্রা হইল না। কত কথা মনে পড়িল। অনুতাপানলে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কত কাঁদিলাম—নয়নজলে উপাধান সিক্ত হইল। ভাবিতে লাগিলাম,—"দেবতা! হৃদয়ে এত স্নেহ পোষণ করিয়া কঠিনতার আবরণে কেন ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে দেব?"—প্রাণ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল। দাদার প্রকৃতি গম্ভীর, প্রশান্ত বদন,—প্রফুল্ল পদ্মের মত বৌদিদির হাসি হাসি মুখ, সমস্ত মনে হইল। আমি শুইয়া থাকিতে পারিলাম না,—বাহিরে আসিলাম। সেদিন পূর্ণিমা। সমস্ত জগৎ হাসিতেছিল। বিশাল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে একবার চাহিলাম, কিন্তু চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। বোধ হইল, যেন সমস্ত নক্ষত্র আমার দিকে চাহিয়া নীরবে হাসিতেছে। আমি মস্তক অবনত করিলাম। যেখানে দাদা আমায় প্রহার করিয়াছিলেন সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল,—তৎক্ষণাৎ যেন কাহার চিরপরিচিত কোমল করস্পর্শ অনুভব করিলাম—তখনি শুনিতে পাইলাম, "ঠাকুরপো!—রাগীলোকের কথায় রাগ কোরো না, ঠাকুরপো!" আমি যেন উন্মাদ হইতে বসিলাম,—শত বৃশ্চিক যেন অঙ্গে দংশন করিতে লাগিল। ক্ষিপ্তের মত দাদার ঘরের দিকে ছুটিলাম। প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। এত জ্যোৎস্নাতেও জগৎ আঁধার দেখি-

তেছি। ঘরের দ্বারের নিকট আসিলাম। বোধ হইল যেন কে মাটীতে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। আমি উৎকর্ণ হইয়া শব্দ শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে চিরপরিচিত কণ্ঠে দাদা যেন বলিলেন, "নরেশ! আমি ত, তোমার কোন ক্ষতি করিনি ভাই।" আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতে যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন লোকজন ডাকিয়া রীতিমত লেখাপড়া করিয়া সমস্ত বিষয় দেবত্র করিতে চেষ্টা করিলাম। দুই চারিদিন কোন রকমে সে বাটীতে থাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি দেবত্র করিয়া বাহির হইলাম।

আজ দশ বৎসর হইল, এই সব ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি এখনও সে সকল ভুলিতে পারি নাই। ইহজীবনে ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ। পুলিশ আমায় ধরিতে চাহে ধরুক, আমার কোন বাধা নাই—আমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে না।

সন্ন্যাসী বাক্স খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন দাদার উইলের নকল।"

আমি পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখি, ঊষার আলোক দেখা দিয়াছে। সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া একটু জলপান করিয়া পুনরায় নৌকা খুলিলেন।

[ক্রমশঃ।

আকবরের জন্ম ও তৎ-সাময়িক বৃত্তান্ত।

তেজকেরাহ্‌ অল-ভকিয়ত্‌ হইতে।

হিজরী ৯৪৯—৯৫০।

৯৪৯ হিজরীতে সম্রাট হুমায়ুন অমরকোট্ দুর্গে পরিবারবর্গকে রাখিয়া তাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিয়দ্দূর আসিয়া পথিমধ্যে রজনীতে পুষ্করিণীর তীরে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে প্রত্যূষে অমরকোট হইতে আনন্দময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী একপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই শুভ ঘটনা ৯৪৯ হিজরীর শাবন মাসের পৌর্ণমাসী রজনীতে সংঘটিত হয়; তজ্জন্য সম্রাট প্রহৃষ্টচিত্তে পুত্রের নাম—বদর উদ্দীন (ধর্ম্মের পূর্ণচন্দ্র) মহম্মদ আকবর রাখিলেন। তৎপর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাষ্টাঙ্গভাবে ভূমিতে

পড়িয়া সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। (১)

এই শুভ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে যাবতীয় আমির ওমরাও একত্রিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তেজকেরাহর গ্রন্থকার জোহরের জিম্বায় যে সমুদয় ধন রত্ন ছিল, তাহা বাহির করিতে সম্রাট আদেশ করিলে, জোহর দুইশত সাহরুক্ক (shahru-khys) নামক রৌপ্য মুদ্রা, একখানি রৌপ্য বলয়, এবং মৃগনাভী কস্তুরীপূর্ণ একটী পাত্র আনিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রথম দ্রব্য দ্বয় যাহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ হইল। তৎপর একখানি চায়না প্লেটের উপর কস্তুরীর ভাণ্ডটি ভগ্ন করতঃ প্রত্যেক প্রধান কর্ম্মচারীকে উহার কিয়দংশ করিয়া উপহার দিয়া সম্রাট বলিলেন,—আমার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে ইহাই কেবল সকলকে উপহার দিতে পারি। এই কস্তুরীর সুগন্ধে এই কক্ষটি কেমন আমোদিত হইয়াছে, আশা করি, কালে আমার এই পুত্রের যশঃসৌরভে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে।" অতঃপর তুরী ভেরী নিনাদিত হইল, জয়ঢকা গর্জ্জিয়া উঠিয়া জগৎবাসীর সমক্ষে এক শুভ সমাচার জ্ঞাপন করিল।

সন্ধ্যোপাসনা পর আমরা সকলে অমরকোট রাণার সৈনাগু মেকআলি বেগের অধিনায়কত্বে একশত মোগল সৈনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পুষ্করিণীর তীর হইতে যাত্রা করিয়া পাচটী অভিযানের পর জান (১) নগরের সমীপবর্ত্তী হইলাম। এখানে অমরকোষের পূর্ব্বাধিকারী রাণীবেন এবং একজন প্রসিদ্ধ কোসাকের (cossac) অধীনস্থ

(১) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার সময় নির্ণয় করিতে ভুল করিয়াছেন। আকবরের জননী অল্প বয়সে ৯৪৮ হিজরীতে বিবাহিতা হন এবং বিবাহের পর বৎসরেক ইণ্ডাসের নিকটবর্ত্তী স্থানে অতিবাহিত করেন। আকবরের জন্ম রেজাব মাসে হয় এবং তাঁহার উপাধি জেলাল উদ্দীন (ধর্ম্মাবতার) ছিল। see prices mahammaden History, voi iii, page 807

(১) ইুয়াটসাহেব বলেন,—"আমি যে সকল মানচিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে জান বা জোয়ান jan or jowin নগরের উল্লেখ নাই। কিন্তু আইনী আকবরীতে উল্লিখিত আছে যে, উক্ত স্থান সরকার হাজিখাঁর অন্তর্ভুক্ত এবং বিস্তুন রাজস্ব প্রদান করিত। আবুল ফজল ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত ইণ্ডাস তীরে অবস্থিত এবং অতি মনোরম স্থান।"

বহুসংখ্যক অশ্বারোহীসৈন্য কর্ত্তৃক আমাদের পথরোধ হয়। রাণার জাট সৈন্য ও মোগল সেনানীগণ অবিলম্বে বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অগ্রধারণ করতঃ সৈন্য বিনাশ করিয়া হতাবশিষ্টগণকে বিতাড়িত করে এবং যে সকল শত্রু সৈন্য আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মোগল সেনাবিভাগ হইতে পলাতক একজন সৈনিক ছিল, সে মুখমণ্ডলে গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। মীর্জা-কুলী খাঁ তাহাকে সম্রাট সদনে লইয়া গিয়া তুর্কী ভাষায় বলিলেন,—"এই নরাধম এক সময় জাঁহাপনার অবমাননা করিয়াছিল।" সম্রাট বলেন,—তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছে, এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু অবশিষ্ট বন্দীগণকে নিহত করিবার আদেশ করিলেন।

এই ঘটনার পর আমরা অগ্রসর হইয়া জ্বান অধিকার করতঃ এক বৃহৎ উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিলাম। এইস্থানে বহুতর জমীদার আসিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন, সম্রাট প্রথমতঃ দুর্গাকারে উদ্যানের চতুঃপার্শ্বে গভীর খনন খানা কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। এই স্থান হইতে নব-জাত সাহাজাদা ও তদীয় জননীকে আনিতে অমরকোটে লোক প্রেরিত হয়। রমজান মাসের ২০শে তারিখে সাহাজাদা উপনীত হইলে তাহার জন্মের পঁয়ত্রিশ দিবসে সম্রাট তাঁহাকে প্রথম আলিঙ্গনে সম্মানিত করেন! (১)

বর্ণনা সৌকার্য্যার্থে এ স্থলে গত বৎসরের দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে হইতেছে। মোগল সৈন্য যে সময় সেওয়ান Sohwan অবরোধ করে, তৎকালে দেখা যায় যে, দুর্গাভ্যন্তরে একজন সৈনিক এমনিভাবে বন্দুক চালাইতেছে যে, স্বপক্ষের কয়েক জন লোক তৎকর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়। তদ্দর্শনে সম্রাট বলিয়াছিলেন,—"আমি আশা করি একদিন এ ব্যক্তিকে হাতে পাইব। সৈনিক পুরুষটী তাহাতে উত্তর করে,—যে ব্যক্তি আমার মস্তকের নিম্ন হইতে তরবারী লইয়াছে এবং কোষ হইতে তাহা অর্দ্ধ নিষ্কাশিত করিয়াছে, আমার ইচ্ছা তাহাকে ধরিতে পারিব।" মোগল সৈন্য যখন জ্বান অধিকার করে, ঘটনাক্রমে উক্ত দুইব্যক্তিই তথায় উপস্থিত ছিল এবং এক মদের দোকানে উভয়ে মিলিত হইয়া স্ব স্ব বীরত্বের বড়াই করিতেছিল। তাহাদের কথোপকথন শ্রুতিগোচর হওয়ায় তাহারা ধৃত

---

(১) এই তারিখ যখন পূর্ব্বোল্লিখিত তারিখের সহিত ঐক্য হইতেছে, তখন হইতে পারে আকবরনামার আবুল ফজলই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভ্রম অসম্ভব রকমের।

হইয়া সম্রাট সমীপে আনীত হয়। সম্রাট বিচার করিয়া বন্দুকধারীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করেন, কিন্তু চোরটিকে ক্ষমা করতঃ মূল্যবান খেলাৎ প্রদান করিলেন।

জানে অবস্থান কালে দেশের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করণ উদ্দেশ্যে আদেশ প্রচারিত হয়। তদনুসারে সুদ্ধ (sudha) সিমেক্ (symech), কারে রাজন্যবর্গ এবং বিকারের পূর্ব্বতন সর্দ্দার ও জামের (jam) বর্ত্তমান অধিপতি সম্রাটের সম্বর্দ্ধন করেন, এইস্থানে অন্যূন পোনর ষোল হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হয়।

এই সময় সাহ হোসেন টাট্টা হইতে বহির্গত হইয়া জানের আট মাইল দূরে ইণ্ডাস্ নদীতীরে আড্ডা গাড়েন। একদা সন্ধ্যার সময়—রমজান ঈদের মধ্যে সম্রাট সাই মুখে একটু জল দিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ আইসে যে, তারসবেগ সৈন্যদল হইতে পলায়ন করিয়া তাহার শত্রু হোসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বলিলেন,—"উহার মরণ সন্নিকট দেখিতেছি।" প্রকৃতই অদৃষ্টের তীক্ষ্ণবজ্র অতি সত্বর তাহার উপর আপতিত হইল। হোসেনের সহিত মিলিত হইলে হোসেন তাহাকে একটী ক্রীতদাস উপহার প্রদান করেন। একদিন এই দাসের কোন অপরাধে তারস্ বেগ তাহার নাসিকাচ্ছেদন করেন। উক্ত ঘটনার তিন দিন পরে দাস তাহাকে নির্দ্দয় রূপে নিহত করিয়া নাসিকাচ্ছেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এই হত্যাসংবাদ রাষ্ট্র হইলে মোগল অনুচরগণ প্রচারিত করিল,—"আমাদের সম্রাট দৈবজ্ঞ পুরুষ, "ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু আমাদের কোরাণে আছে,—"সম্রাটগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি।" পূর্ব্বোক্ত ঘটনা, সম্রাট হুমায়ুনের প্রকৃত রাজচক্রবর্ত্তীত্বের প্রমাণ।

এই সময় সাহাহোসেন টাট্টা হইতে অমরকোটের রাণার নিকট পরে সম্রাটের নিকট দূত পাঠান। তৎপর রাণাকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার আশায়, একটী সম্মাননীয় পরিচ্ছদ, একখানি মূল্যবান ছোরা এবং অপর কতিপয় সামগ্রী তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়াছেন। রাণা অবিলম্বে ঐ সমস্ত দ্রব্য সম্রাটকে দেখাইলে সম্রাট বলেন যে, প্রাগুক্ত দ্রব্যনিচয় একটী কুকুরের পৃষ্ঠে চাপাইয়া সাহ হোসেনের নিকট ফেরত পাঠান হোক্। তদনুরূপই করা হইল, সাহহোসেন অতিশয় অপ্রতিভ হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর খোয়াজগাজী নামক একজন মোগল সরদারের সহিত রাণার কলহ হয়, তাহাতে রাণা নিজের

সমস্ত অনুচরগণসহ মোগল শিবির ত্যাগ করিয়া বলিয়া যান,—"মোগলগণের সাহায্য করে আমি যে প্রয়াস পাইয়াছি তাহা সমস্তই বৃথা হইল।" রাণার দেখাদেখি অপরাপর জমীদারবৃন্দও আমাদিগকে অদৃষ্টের উপর ফেলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিবস মোনায়েম বেগও পলাইয়া গিয়া সাহ হোসেনকে জানাইল যে, সম্রাট এখন একাকী আছেন এবং তাঁদের শিবির একটী খোলা সমতল ক্ষেত্রে, তথা হইতে তাঁহাকে সহজেই পরাজিত ও ধৃত করা যাইবে। সৌভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বাহ্নেই এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌঁছাছিলে তিনি শিবিরের চতুঃপার্শ্বে গভীর খাদ খননের আদেশ করেন, এমন কি সম্রাট স্বয়ং যষ্টিহস্তে করিয়া খাদ খননের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এমনি দ্রুত গতিতে খননের কার্য্য হয় যে, তিন দিবসেই পরিখা পরিসমাপ্ত হইল। এমতে সাহহোসেন আক্রমাণার্থ আগমন করতঃ শিবির সম্পূর্ণ সুরক্ষিত দেখিয়া মোনায়েম বেগকে প্রবঞ্চনা করার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যাহাহোক্ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে গার্ড বজে (gird baz) নামক একজন মোগল সরদার নিহত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধাহবের মধ্যে সংবাদ আসিল যে, কনোজ যুদ্ধ হইতে পলাতক বৈরামবেগ (খাঁ) * সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে গুর্জ্জর হইতে আগমন করিতেছেন। এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তে সম্রাট তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কতিপয় সরদার আগে পাঠাইলেন। অবিলম্বেই তিনি উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন এবং সম্রাটও তাঁহার ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পরদিন রজনীতে সাহ হোসেন মোগল পরিখার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রণ-ভেরী বাজাইলেন, বৈরামবেগ ও অপরাপর মোগল সরদার তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান জন্য বাহির হন, কিন্তু সম্রাট বৈরামকে ফিরাইয়া আনিয়া রামেনবেগ ও অন্য সরদারগণকে শত্রুর অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। তাহারা শত্রু শিবিরের নিকটস্থ হইলে, রামেনবেগ ও বিপক্ষীয় বাবর কুলির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রামেন বিপক্ষের অশ্বটি নিহত করেন, কিন্তু একজন পদাতিক সৈন্য এমনিভাবে তাঁহার অশ্বের উরুদেশ ছেদন করে যে, অশ্বটী তাঁহার প্রভুকে শিবিরে আনিয়াই প্রাণত্যাগ করে। "তাপ্‌তক্" (Tupchak) জাতীয় অশ্বের ইহাই নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা বা গুণ।

* পরে সাহাজাদা আকবরের রক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। see Dows Hindicston

এই ঘটনাবসানে সম্রাট সেক আলি-বেগকে সেকো (chekaw) নামক স্থানে যাইয়া খাদ্য-শস্য সরবরাহ করিবার আদেশ করেন। সেক আলি যথারীতি কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকে, কিন্তু সাহহোসেন এতৎসংবাদ অবগত হইয়া রসদ সংগ্রহের পথরোধ করিবার নিমিত্ত শক্তিশালী এক সেনাদল প্রেরণ করেন। সম্রাটও আলির সেনাদল বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে তেহার সুলতানের অধীনের বাননী তথায় প্রেরণ করেন। সেক আলি ইহাতে অপমান জ্ঞান করিয়া তেহারকে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিবার জন্য সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেন। এই ঘটনায় দুই সরদারের কিছু মনান্তর উপস্থিত হয়।

সম্রাট হুমায়ন এই ভাবে শিবির অবরোধ থাকায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া একদা বলিলেন,—"এইবার সাহ হোসেন শিবিরের নিকট আসিলে আমি নিজে যাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিব" পরে তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব প্রস্তুত রাখিবার আদেশ করিলেন। পবিত্র রমজান মাস হইলেও আমরা পরদিন একটা যুদ্ধ-কাণ্ডের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। রজনীতে নদীর তীর হইতে একটী লোক আসিয়া বলিল—"কতকগুলি লোক নদীর অপর তীরে নৌকা অন্বেষণ করিতেছে।" তাহারা কে এবং কি জন্য নৌকা অন্বেষন করিতেছে, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—"তেহার সুলতান তাহার মধ্যে আছে।" তচ্ছ্রবণে সম্রাট বলিলেন,—ভগবানের আশীর্ব্বাদে যেন সুসংবাদ থাকে।" তৎক্ষণাৎ তেহারকে আনিতে একখানি নৌকা প্রেরিত হইল, তেহার পার হইয়া আসিয়া জানাইল যে, আমাদের সেনাদল আক্রান্ত হইয়াছিল, সেক আলী নিহত হইয়াছেন এবং তেহার অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। পর দিবস প্রাতঃকালে সম্রাট-স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, সমস্ত রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

এই সময় সৈন্যদল পুষ্ট হওয়ায় সাহোসেনও যুদ্ধের সংকল্প আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রিতে মোহম্মদ বিনায়াজ নামক একজন সরদার তাঁহাকে গোপনে সংবাদ দেয় যে, পর দিবস প্রত্যূষে সম্রাট তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। সরদার আরো বলেন যে, নানারূপ বিপদপাতে সম্রাট এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, এসময় তাঁহার সহিত আপোষ করা সাহ হোসেনের কর্ত্তব্য।

এই উপদেশানুসারী কয়েক দিবস পর সাহ হোসেন কতকগুলি সামান্য দ্রব্য উপহার সহ বাবর কুলীকে হুমায়নের নিকট পাঠাইয়া তাহার অতীত কার্য্যাবলীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎসঙ্গে তিনি আরো বলিয়া

পাঠান যে কেবল লজ্জা বশতঃই তিনি নিজে যাইয়া সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সম্রাট দয়ার্দ্রভাবে দূতকে, রাসেন বেগ্ ও তাঁহার সহিত যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন। দূত বাবর কুলী বলিলেন যে, রাসেন বেগ বর্ষার সাহায্যে তাঁহাকে অশ্ব হইতে নামিতে বাধ্য করেন কিন্তু তাঁহার আর কোন ক্ষতি করেন নাই কিন্তু অপর কতিপয় ব্যক্তি রাসেনের অশ্বটি আহত করে। সম্রাট তৎপর রাসেন বেগকে ডাকাইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে বলিলেন। অতঃপর অবিলম্বে তিনি সিন্ধু প্রদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন এই আশ্বাস দিয়া দূতকে বিদায় করিলেন।

এই খানেই ৯৪৯ হিজরীর (১৫৪২ খৃষ্টাব্দ) বৃত্তান্ত শেষ হইল। আগামীবারে আকবরের জন্মের দ্বিতীয় বর্ষের ঘটনাবলী বিবৃত হইবে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

টাণ্ডায় একরাত্রি।

মির্জাপুরের অনুমান ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে-বিন্ধ্য শৈল শ্রেণীর উপর দেওরি নামে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে। গত বৈশাখ মাসের ২০ এ তারিখে কোন সরকারি কাজের জন্য ঐ স্থানে গিয়াছিলাম। ভোর ৬ টার সময় মির্জাপুর হইতে একা করিয়া দেওরি যাত্রা করি। দেওরি অবধি একায় যাওয়া বড়ই কষ্টকর। অশ্বারোহণে তত অভ্যস্থ নই সুতরাং আমাকে একা করিয়াই যাইতে হইয়াছিল। ৩ মাইল পাকা রাস্তা (metolled road) বরাবর দক্ষিণে মির্জাপুর জব্বলপুর রাস্তা (Mirapur Jabbalpur Road) দিয়া আসিয়া ইটোয়া-টাণ্ডা-শিব্‌সর (Itowa Tanda Sivsi) রাস্তা ধরিলাম। ২ মাইল কাঁচা রাস্তায় আসিয়া বিন্ধ্য শৈল শ্রেণীর তলদেশে উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বাঁধান রাস্তা আছে। একা পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পাহাড়ের উচ্চতা অধিক নয়। ৫।৬ মিনিটে উপরে উঠিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। চতুষ্পার্শ্বে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড ছড়ান রহিয়াছে দেখিয়া বোধ হয় যেন যুদ্ধের পর বীরগণ জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের ঝোপ যেন প্রভুভক্ত অশ্বের ন্যায় প্রভুর পার্শ্বে ম্লান দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। ১ মাইল পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে টোড়ে কা দরি' বা টাণ্ড ফলের (Tanda Fall) নিকট উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে একা হইতে নামিয়া জল দেখিবার ইচ্ছা হইল। ৩টি নালা একত্র মিলিয়া প্রায় ৭০ ফিট উপর হইতে জল পড়ি-

তেছে। বর্ষার সময় এখানকার দৃশ্য বড় মনোমুগ্ধকর। এই সময়ে এত ভীষণ বেগে জল পড়ে যে নিকটে ২ জনে কথাবার্ত্তা কহিলেও কিছুই শোনা যায় না, এবং এই জলের শব্দ ২।৩ মাইল দূর হইতে শোনা যায়। কলের নিকটেই মির্জাপুরের সদাগর সিউদিন ওমারের বাঙ্গালা। বাঙ্গালার উপর হইতে কলের সৌন্দর্য্য বড়ই সুন্দর দেখায়। বর্ষার সময়ে অনেকে এই কল দেখিতে আসেন। কল অবধি একায় আসা যায়। মির্জাপুর হইতে যাতায়াতের একা ভাড়া এক টাকা।

এখান হইতে দেওরি প্রায় ২ মাইল, রাস্তা বড়ই দুর্গম। সংস্কারাভাবে একা যাতায়াতের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার অনতিদূরে রাখালেরা ধেনু চরাইতেছে। অদূরে হরিণ সকল দলে দলে গো বৎসগণের সহিত মনের সুখে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। আমার একা তাহাদের ২০।২৫ হাত দূর দিয়া 'বাচ্চি যাবো' ভাবে চলিয়াছে, তাহাদের দৃক্‌পাতও নাই। এই নিরীহ প্রাণী দিগকে বধ করিয়া অনেকে শিকার সুখ উপলব্ধি করেন। ইহাদের দৃষ্টি বড়ই তীক্ষ্ণ। শিকারি দেখিলেই ইহারা চিনিতে পারে এবং সাধ্যপক্ষে তাহার ত্রি সিমানায় আসে না। সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া অনেককে রিক্ত হস্তে ফিরিতে দেখিয়াছি, এখান হইতে আরও পূর্ব্বে সিরসিণ্ডে বাঘ ভালুক এবং নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। নীলগাই সকল কখনও দলছাড়া হইয়া বিচরণ করেনা। এক এক দলে ৫০।৬০ টি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মানুষ দেখিলে আক্রমণ করে।

প্রায় ১০ টার সময় দেওরিতে উপস্থিত হইলাম। দেওরি একটি ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লীবাসী সকলেই কৃষিজীবী। একা ও তদুপরি এক বাঙ্গালি বাবু দেখিয়া পল্লীস্থ বালক বালিকা 'বাঙ্গালি বাবু সেলাম' বলিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এতটা রাস্তা পাহাড়ে একায় আসিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চাপরাসিকে 'চা' তৈয়ার করিতে বলিলাম। চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল।

বৈশাখ মাসের রৌদ্র, সূর্য্যদেব যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁবুর ভিতর অসহ্য গরম। বাহিরে 'লু' চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীস্থ এক অবস্থাপন্ন কৃষি তাহার কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। লোকটি তাহার বহির্ব্বাটিতে আমাকে বিশ্রাম করিতে দিল এবং আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। আমার সঙ্গে খাবার আছে বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম। চায়ের জন্য দুধের কথা বলিতেই সের দুই দুধ আনিয়া হাজির করিল। এখানে বাজার নাই। আবশ্যকীয় জিনিসপত্র মির্জাপুর হইতে আনিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ধান,

চাল তরি-তরকারি সমস্তই হয়, মাসে একবার সহরে গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া থাকে।

রৌদ্রের তেজ প্রশমিত হইলে সরকারি কাজে বাহির হইলাম। কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া প্রায় ৬টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। ধরণীদেবী ধীরে ধীরে তিমিরাবৃতা হইতেছিলেন। অন্ধকারে একা লইয়া যাইতে সমূহ কষ্ট হইবে ভাবিয়া, একাওয়ালাকে টাণ্ডায় গিয়া আমার জন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলাম। কিছু জলযোগ করিয়া প্রায় ৭টার সময় ২জন চাপরাসি সঙ্গে লইয়া রওনা হইলাম। অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে টাণ্ডায় আসিয়া দেখি একা এখনও আসে নাই। আরও অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন একার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন একার আশা ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে মির্জাপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টাণ্ডা ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ আসিয়াছি, এমন সময়ে আকাশে একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে ঐ ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। প্রবলবেগে ঝটিকা উত্থিত হইল, চারিদিক কেবল ধূলিময়, কিছুই দেখা যায় না। নাকে মুখে ধূলি প্রবেশ করিয়া শ্বাস রোধের উপক্রম করিল। মুখে রুমাল দিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে চলিল। আকাশে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুত চমকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় শব্দে মেঘের ভীম গর্জ্জনে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। নিকটে বড় বৃক্ষও নাই যে তাহার তলে আশ্রয় লই। নিরাশ্রয় ভাবে বসিয়া থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নয় দেখিয়া টাণ্ডার বাঙ্গলায় ফিরিতে মনস্থ করিলাম। চারিদিক এত অন্ধকার যে দুই হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না। একবার রাস্তা ছাড়িয়া বিপথে যাইলে সমস্ত রাত্রি পাহাড়ে ঘুরিতে হইবে বুঝিলাম। কিন্তু এরূপ অনাবৃত স্থানে বসিয়া থাকাও নিরাপদ নহে। দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল দেখিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া উঠিলাম। কিছুদূর আসিয়াছি এমন সময়ে 'কোন হায়' চিৎকারে চমকিয়া উঠিলাম। এই স্থানে প্রায়ই চুরি ডাকাতি হয় শুনিয়াছিলাম সুতরাং ব্যাপার কি জানিবার জন্ত চাপরাসিদের ডাকিলাম। শুনিলাম জন কয়েক উটচালক আমাদের মত বিপদে পড়িয়া পথহারা পথিকের ন্তায় আশ্রয়ানুসন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরিতেছে।

বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোতে অতি কষ্টে টাণ্ডার বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম। এই দুর্য্যোগে আশ্রয়লাভ করিয়া সিউাদন ওমারকে শত শত ধন্তবাদ দিয়া বাঙ্গালায় উঠিলাম। বাঙ্গালা বন্ধ জন প্রাণীও নাই। বৃষ্টিতে জামা কাপড় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছিল। আমরা তিনজনে নিরম্বু উপবাসী হইয়া ঐ অবস্থায়

সমস্ত রাত্রি বারাণ্ডায় পড়িয়া রহিলাম। ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জনে, চোর ডাকাত ও বাঘের ভয়ে নিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে মির্জাপুর ফিরিয়া আসিলাম। এক ঘণ্টা পরে আমার একা আসিয়া হাজির। শুনিলাম ঝড়ে একা উল্টাইয়া দিয়াছিল। বেচারা সমস্ত রাত্রি পাহাড়ে অনাবৃত ভাবে পড়িয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লালগোলা অধীশ্বরীর স্বর্গ গমনোপলক্ষে

শোকাশ্রু।

(১)

প্রস্তরে বহিছে নীর   দামিনীদমক স্থির
নীরব বিহঙ্গ তান এ বিশ্ব আঁধার।
চিরস্ফুট রবি শশী   পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ রশ্মি
অনিল অনলভারে রোদনের ধার॥
চমকে পথিক হেরি অশনি-চপলা।
উন্মদা প্রকৃতি আজি তিমির-মেখলা॥

(২)

তমাচ্ছন্ন লালগোলা   বহিয়া দারুণ জ্বালা
নয়নে বরিষে অশ্রু মলিন বদনে।
মাতৃহারা প্রজাগণ   মা বিহনে শূন্যমন
কে আর ঘুচাবে ব্যথা প্রবোধ বচনে॥
লালগোলা অধীশ্বরী! করুণার খনি!
তোমার বিহনে মাগো তামসী মেদিনী॥

(৩)

তুমি মাগো পুণ্যবতী   ধরায় আদর্শ সতী
তোমা সম ভাগ্যবতী কে আর এমন।
কে পায় এমন পতি   ধর্ম্মোৎসাহী মহামতি
ন্যায়বান শুদ্ধশীল—দেখিনি তেমন!
প্রশান্ত উদার চিত্ত সাধুকার্য্যে রত।
ত্রিলোকের গুণ যত চরণে প্রণত॥

(৪)

ক্ষুদ্র প্রাণী পশুহরে   নরবর সকাতরে
মুক্তহস্তে দানে সদা আছেন নিরত।
ক্রীড়াভূমি শাস্ত্রাগার   সাধারণ উপকার
এ সকল কর্ম্মে যাঁর যাপন নিয়ত॥
তেমন দেবতা পতি যেই নারী পায়,
সার্থক রমণী জন্ম তাহার ধরায়!

(৫)

তুমি লক্ষ্মী স্বরূপিণী   দীন অনাথ জননী
কাতরা সন্তান তরে এমন কে হবে!
পতির আদর মাখি   পতিমূর্ত্তি হৃদে রাখি
ধীরে ধীরে পতিকোলে মুদিলে নীরবে!
শুনেছি শাস্ত্রের বাণী ভাগ্যে রাজরাণী।
ভাগ্যে পায় পতিকোলে মরণ রমণী॥

(৬)

আমরা অনাথ যত   কাঁদিব মা অবিরত
কে আর মুছাবে জল বলনা যতনে!
অন্নপূর্ণা রূপে তুমি   উজলিলে বিশ্বভূমি

দয়া মায়া বাৎসল্যের উজ্জ্বল বরণে!
রূপে গুণে ছিলে মাগো মুনীন্দ্র মোহিনী!
সরল পবিত্র ছবি বিশ্ববিভাসিনী॥

(৭)

ঘুমাও ঘুমাও মাগো আর কভু নাহি জেগো
শ্রান্ত ক্লান্ত এবে তুমি হয়েছ ধরায়।
ছাড়ি এই মরবাস হাসিয়া শান্তির হাস
যাও মাগো ধীরে ধীরে ত্রিদিব যথায়।
সেথা নাই মরীচিকা কাতর কল্লোল।
বিলায় শান্তির সহ মারুত হিল্লোল॥

(৮)

যাও মা সে পূতধাম যেইখানে অবিরাম
দেবদূতে করে গান সতীর মহিমা।
যেইখানে দময়ন্তী সীতা, পতিব্রতা, সতী,
বিহরে যথায় নাই আনন্দের সীমা।।
পাপ নাই শোক নাই শান্তির নিলয়।
পবিত্রতা অমৃতের চির উৎসময়॥

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

বৃন্তচ্যুত-কুসুম।

(১)

কে বলেরে এ সংসারে আছে সুখলেশ?
দুঃখে ভরা ধরাতল,
ঘুরিতেছে কর্ম্মফল;
যাহাদিতে বিশ্বজীবে অশান্তি অশেষ॥

(২)

হের ওই লতিকার একটি কুসুম।
নিরুপমা, শোভাধার,
সুখ শান্তি মূল যার;
যাহে ছিল লতিকাটি সুখেতে বিভ্রম॥

(৩)

নিদয় হৃদয় কাল অকালে সে ধন।
কাঁদাইয়া অভাগিরে,
ভাসাল নয়ন-নীরে;
দিল না সুখেতে কাল করিতে হরণ॥

(৪)

কাঁকর গণিছে বুঝি হেরিয়া আঁধার।
যে তরু আশ্রয় করি,
আছে দিবা বিভাবরি;
তার(ও) প্রিয় সম্ভাষণ মানিছে না আর॥

(৫)

আর কি দিবে না বিধে! ঐ লতিকারে।
নয়ন-আনন্দ যায়,
পুনঃ সুখ পাবে হায়;
এমন একটি আর চারু কুসুমেরে॥

(৬)

দিবে যদি তবে কেন লইলে কাড়িয়া।
দিয়াছিলে যে রতন,
যাহে হরষিত মন;
ছিল ঐ লতিকাটি সুমার ভাবিয়া॥

(৭)

দিবে না দিবে না যদি দিবে না তাহায়।
কি ল'য়ে কেমনে তবে,
বলনা রহিবে তবে ;
হায় ! তবে লতিকার কি হবে উপায় ?

(৮)

মেঘে যদি কেড়ে তার কুসুম রতন।
কে তোমায় সেধেছিল,
কে দিতে কহিয়া ছিল ;
আনন্দ-আননি হেন করিয়া যতন ?

(৯)

লতিকার দীর্ঘশ্বাস কে শুনে শ্রবণে।
স্বার্থপর ধরাবাসী,
ভাবিছে একাকী বসি ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুসুম রতনে ॥

(১০)

কে তার বলিয়া দিবে হেন কে ভুবনে।
উদ্‌ভ্রান্ত পরাণে হায়,
পুছে অন্ধ লতিকায়,
কোথা পাবে নিরুপমা কুসুম রতনে ॥

(১১)

বিষাদ হৃদয়ে পুনঃ পুছে সমিরণে।
সবার জীবন তুমি,
বল রে সর্ব্বগামী ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুসুমের তনে ॥

(১২)

বল রে নিঠুর বিধি বল রে কেমনে।
হায় রে হারাণ ধন,
সনে, হবে দরশন ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুসুম রতনে ॥

(১৩)

পাইবে না অভাগিনী শতেক যতনে।
হরেছে নির্দ্দয় কালে,
নাহি আর মহীতলে ;
কোথা পাবে নিরুপমা কুসুম রতনে ॥

শ্রীহরিনারায়ণ মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রবাহ—মাঘে প্রবাহের দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইল, আজকাল যাবতীয় মাসিক পত্রের মধ্যে প্রবাহকেই আমরা সকল শ্রেণীর পাঠোপযোগী মাসিক পত্র বলিয়া গণ্য করিতে পারি। এবার সম্পাদক মহাশয়ের প্রবন্ধ কয়টীই বেশ সুপাঠ্য, তন্মধ্যে তাঁহার "স্বদেশ" উপন্যাস বেশ সুপাঠ্য হইতেছে। আমরা চিরকালই দামোদর বাবুর সুমধুর লেখনী-নিঃসৃত শিক্ষাপ্রদ উপন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী। ভাষা ও ব্যাকরণ বেশ চলিতেছে, নারায়ণ বাবুর গল্প পাঠে আমরা এবার তাদৃশ প্রীত হইতে পারিলাম না। অপরাপর প্রবন্ধগুলির লেখা মন্দ হয় নাই।

অঙ্কুর, মাঘ প্রথম সংখ্যা। পত্রিকা-খানির প্রথম সংখ্যা আমরা পড়িয়াছি। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় ইহার সম্পাদক পদে বরিত হইয়াছেন। তজ্জন্য আশা করা যায় এ অঙ্কুর হইতে যে বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে সুফলের আশা অবশ্যম্ভাবী। পাত্তনিকা ও সম্বন্ধের "দেবযান ও পিতৃযান" সম্পূর্ণ না হইলেও লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর সূচনা পদ্যটী বেশ হইয়াছে, প্রতিফল গল্পটী বেশ ভাল লাগিল। বাঙ্গালা ভাষায় "অদ্বৈতবাদ খণ্ডন" প্রবন্ধটীতে অনেক জানিবার বিষয় আছে। যজ্ঞেশ্বর বাবুর "ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য" বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত পরিচালিত হইতেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত যজ্ঞেশ্বর বাবুর প্রবন্ধ বহুদিন পাঠে যতদূর জানিতে পারা যায়—তাহাতে পত্রিকাখানি জনসমাজে আদরণীয় হইবে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বান্ধব।—মাসিকপত্র আমরা পাইয়াছি। ইহাতে কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ ও কবিতা আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রবন্ধ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর চলিয়া আসিতেছে সুতরাং প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারা গেল না। "হিগেলের পরমাত্মবাদ" প্রবন্ধটী বেশ লাগিল; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের চিরকাল যে অসুবিধা আছে, তাহার তো কোনও প্রতীকার দেখিলাম না। ভাষা আরও সরল হইলে বড়ই ভাল হইত। "বিধু-মুখীচ্ছন্দের" আমরা পক্ষপাতী নহি। আমা-দের চক্ষে বিধুমুখীচ্ছন্দ যেন বাঙ্গালা সাহি-ত্যের যথেচ্ছাচার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি লাগিল ভাল।

প্রদীপ।—প্রদীপের আলোকরশ্মি ফুটি-য়াছে ভাল। অনেকগুলি প্রবন্ধ পূর্ব্ব প্রকা-শিতের পর, আমরা সমস্ত সংখ্যা পাই নাই, সেই জন্য প্রবন্ধগুলির সমালোচনা করিতে পারিলাম না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে প্রদীপের অধিকাংশ কবিতা ও প্রবন্ধগুলি সুন্দর ও সময়োপযোগী।

স্বদেশী।—১ম, ২য় ও তৃতীয় সংখ্যা পাইয়াছি। কাগজখানি সুচারুরূপে চালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সময়োপযোগী এবং সুন্দর; বিশেষতঃ অধিকাংশই কাজের কথা। আশা করি এরূপ ধরণের পত্রিকা আমাদের দেশের মহদুপকার সাধন করিবে। বড়ই সুখের বিষয় যে ইহাতে একটীও বাজে প্রবন্ধ নাই কিম্বা "কবিতা-কণ্টকের" ছড়াছড়ি নাই।

কুন্তলকান্তি তৈল
সৌগন্ধযুক্ত কেশবর্দ্ধক ও
যাবতীয় শিরোরোগ নাশক
মূল্য ॥০ আনা মাশুলাদি ৶০।
বি, ব্রাদার্স এণ্ড
৭৫ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

১৩৩ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আলোচনা

"মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।"

নবম বর্ষ। } ফাল্গুন ১৩১২। { একাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিশ্ববিমোহন উপহার—আগামী ১৩১৩ সালের শুভ বৈশাখ হইতে "আলোচনার" দশম বর্ষ আরম্ভ হইবে। আমরা আগামী বর্ষে আলোচনার সমধিক উন্নতি করিতে প্রাণপণ করিব এবং গ্রাহকবর্গকে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা পূর্ণ ৪ খানি উপাদেয় পুস্তক উপহার দিবার মনস্থ করিয়াছি (১) "বঙ্গশক্তি" স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের সর্কোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সংগ্রহ, (২) "লহরী" স্ত্রীপাঠ্য মনোমুগ্ধকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি (৩) বিপন্ন ব্যারিষ্টর (৪) কাটামুণ্ড, শেষের এই দুইখানি জীবন রহস্য-পূর্ণ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। পুস্তকগুলি পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, ডিটেক্‌টিভের অদ্ভুত কৌশল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র ১॥০ টাকা লইয়া এক বৎসর আলোচনা ও উক্ত ৪ খানি পুস্তক প্রদান করিব। অন্যান্য ব্যয় কিছুই লাগিবে না। আমরা বৈশাখ মাসের মধ্যে সকলের নামে প্রথম সংখ্যা "আলোচনা" ও উক্ত ৪ খানি সুবৃহৎ পুস্তক ভিঃ পিঃ তে পাঠাইব। যাহাদের আপত্তি থাকে এই সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্র জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী।—এই মিউনিসিপ্যালিটীর আয় বড় কম নহে, তথাপি আজ কয়দিবস হইল ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী সহরে ড্রেণ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবেন, যদি কাহার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে বলিয়াছেন। এ ঘোষণাবাণীর অর্থ আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম

না। প্রজা সাধারণ আপত্তি করিলেই কি রক্ষিত হইবে? আর মিউনিসিপ্যালিটীর এত আয় সত্বেও যে কেন ঋণ করিতে হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দরিদ্র প্রজাগণকে আর কত দায়ে অভীভূত করিতে হইবে?—এই ত সে দিন চেয়ারম্যান মহোদয় জেলা পরিদর্শন করিবার জন্ত প্রজাবর্গের শোণিত স্বরূপ অজস্র অর্থ ব্যয়ে একখানি "মটরকার" খরিদ করিলেন। এ সময় ত সাধারণ প্রজাবর্গের মতামতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল মহানুভব চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য করিতেন, তাঁহারা অশ্ব বা অশ্বযানের সাহায্যেই যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতেন। দরিদ্র প্রজাবর্গের রক্ত-রঞ্জিত অর্থের তাঁহারা অপব্যয় করিতেন না। চেয়ারম্যান সাহেবের ইচ্ছা মত Motor cur ত খরিদ করা হইল, তাহার পরেই Drainage work এর জন্ত চতুরলক্ষ টাকা কর্জ্জ করা হইবে। টাকা পরিশোধের সময়ও দরিদ্র প্রজাবর্গের নিকট হইতে কঠোর আদেশে ট্যাক্স আদায়ের বন্দোবস্ত করা হইবে। হাওড়ায় মিউনিসিপ্যাল বন্দোবস্তের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে।

কবিরাজী ঔষধ।—আমরা কলিকাতায় ৬৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোডস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশারদ মহাশয়ের দ্বারা আমাদের অনেক আত্মীয়কে চিকিৎসিত হইতে দিয়াছিলাম। রোগীটী বহুদিন ধরিয়া অম্লরোগে ভুগিতেছিলেন; অনেক চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিশারদ মহাশয়ের ঔষধ সামান্তদিন মাত্র ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইয়াছে। কৃষ্ণবাবুর আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, জটিল রোগ নিরাকরণে তিনি বেশ পারদর্শী। তিনি বিনা মূল্যে রোগীগণকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অর্থের জন্ত তিনি কাহাকেও পীড়ন করেন না। আমরা ভগবানের নিকট এই উদীয়মান কবিরাজের উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

স্বদেশী সভা।—আজকাল আবার পূর্ব্বের স্তায় সকল স্থানে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্যের "বয়কট" অর্থাৎ ধর্ম্মঘট করিয়া বিদেশী পণ্য বন্ধ করিবার জন্ত সভা সমিতি হইতেছে। অনেকেই বলিতেছেন—"স্বদেশী আন্দোলন" কার্য্য অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে? যাহারা এ কথা বলেন—তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এতদিন যে "বয়কট" তাদৃশ প্রবল ছিল না, তাহার কারণ পুনরায় আবেদন। বিলাতে লিবারেল দল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, মাননীয় জন-

মরলি এখন ভারত সচিব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আইন-কানুন কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের নেতাগণ তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সুবিচারের আশায় সকলেই তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত আশাবাণীর আশাপথ চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না। যে শুনা গেল, জন মরলী আমাদের আবেন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সেই দিনই কলেজস্কোয়ারে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে অসংখ্য লোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন— বিলাতী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না। এই কার্য্যে স্বার্থপর ইংরাজ বণিকগণের স্বার্থ নষ্ট হইবে বলিয়া স্বজাতি প্রিয় ইংরাজরাজ আমাদের কার্য্যে নানাপ্রকার বাধা প্রদান করিতে প্রাণপণ করিবেন। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের হৃদয়ের বেদনা জানাইতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। এক্ষণে যাহাতে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি, যাহাতে আমাদিগকে আর সকল বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়, এক্ষণে আমাদের সে বিষয়ে প্রাণপণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। চারিদিকে সভা সমিতি করিয়া বিদেশী দ্রব্যের "বয়কট" করাই এক্ষণে আমাদের হৃদয়ের তীব্র জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়।

আর কেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ লইয়া আর আমাদের আন্দোলন করা বিধেয় নহে, কারণ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হইবার আর কোনও উপায় নাই। তবে কেন আর বৃথা একটা হুজুগ লইয়া সময় নষ্ট করা হইতেছে। যাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয়—যাহাতে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া চারিদিকে প্রবাহিত হয়, যাহাতে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার করিতে বদ্ধ পরিকর হয়—এখন তাহাই আমাদের লক্ষ্যস্থল হইলে আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। যাহার ফলে আমরা অচিরেই আবার আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়া পাইব। হউলই বা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ, আমরা যদি বিচ্ছিন্ন না হই, আমরা যদি এক থাকিতে পারি, তবে ইংরাজের একটা কলমের আঁচড়ে আমাদের কি হইবে? তাই বলি—বঙ্গ ভঙ্গের কথা আর কেন, এখন স্বদেশ সেবাব্রতে আসুন সকলে প্রাণপণ করি।

ভক্তির জয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাসী অরবিন্দকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। বালক ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল,

এজন্য প্রথমতঃ তাঁহার কুটিরের সঞ্চিত ফল মূল এবং সুশীতল পানীয় প্রদানে তাহার ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন। বালক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, পরিশেষে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া কি কারণে যে এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছে, আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ, সন্ন্যাসীর প্রশ্ন অনুসারে, তাহার শৈশবকালে পিতৃ মাতৃ বিয়োগ, আচার্য্যের অনুকম্পায় তাঁহার গৃহে অবস্থান এবং অধ্যয়ন, আচার্য্যের সংসারে বৈরাগ্য এবং তুজ্জন্য পাঠার্থিগণের বিদায় দান, তাহার গুরু দক্ষিণা দানের অভিলাষ এবং তাহাতে আচার্য্যের নিরুদ্দিষ্টা কন্যার অনুসন্ধানের অনুমতি ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, অদ্যকার ঘটনা পর্য্যন্ত একে একে আদ্যন্ত বর্ণনা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী এই সকল ঘটনা শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। এবং অদম্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার পরিচয় পাইয়া এবং অসামান্য গুরুভক্তি দেখিয়া, আমি যার পর নাই বিমোহিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার নিরুদ্দিষ্টা গুরুকন্যার বিবরণ একটু বিস্তৃতভাবে শুনিবার বাসনা। যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাঁহার নাম, রূপ এবং বয়সের কথা প্রকাশ করিয়া বল। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমিও অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিয়াছি, যদি আমার দ্বারা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কিয়ৎ পরিমাণেও প্রসর হয়, তাহা হইলে পরমানন্দ উপভোগ করিব।"

অর। মহাত্মন্! আপনার নিকট আমার কোন বিষয়ই অপ্রকাশ্য নাই। আমি আচার্য্য মহাশয়ের নিকট যেমন যেমন শুনিয়াছি, অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমার আচার্য্য বলেন, তাঁহার কন্যার অনেকগুলি নাম আছে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ 'কালী' নামেই বিখ্যাত। বয়সের পরিমাণ তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, তবে এই মাত্র বলিয়াছেন যে, তাঁহার কন্যাকে দেখিতে ষোড়শ বর্ষের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। রূপ উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ। শিরোদেশে আভূমি লম্বিত উন্মুক্ত কেশদাম। বিবসনা, নিরাভরণা। বসন ভূষণের পরিবর্ত্তে নরকর শির বিনির্ম্মিত আভরণ পরিধান করিয়া থাকেন।

অরবিন্দের কথায় বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "বুঝিয়াছি বৎস, সকলই বুঝিয়াছি, আর তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, সমস্তই আমার উৎমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। মা অন্নপূর্ণা অবশ্যই তোমার আশাপূর্ণ করিবেন, ঐরূপ একটি রমণীর কথা, আমি সময়ে, অনেক লোকের কাছে শুনিয়াছি, অতএব তোমার হতাশ হইবার কোনই কারণ

দেখিতেছি না। পুনরায় নব উৎসাহে উৎসাহিত, নব উদ্যমে উদ্দীপিত হইয়া অন্বেষণ কর, যখন অপর দশজন লোক তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তখন অবশ্যই তুমিও পাইবে।" এই সকল কথা বলিয়া, সন্ন্যাসী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "উঃ! কি অসাধ্য সাধন,: আমি এই ক্ষুদ্র বালককে উৎসাহিত করিতেছি? ভগবদ্ সাক্ষাৎকার লাভ কি সহজ ব্যাপার? কত মুনি, ঋষি, যোগিবৃন্দ যুগ-যুগান্তর কঠোর তপস্যা করিয়া যাঁহার কৃপালাভ করিতে পারেন না, যোগেশ্বর হরি, দুষ্কর যোগাবলম্বনে যাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ, লোক পিতামহ ভগবান্ চতুর্মুখ চতুর্মুখে যাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, পঞ্চানন যাঁহার লীলাপ্রপঞ্চ পঞ্চাননে প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরিশেষে পদারবিন্দে প্রপন্ন, এই তরল-মতি সরল বালক কেমন করিয়া তাঁহার সন্দর্শন পাইবে? আহা! অবোধ বালক, আচার্য্যের চাতুরিজাল ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই—চেষ্টাও করে নাই, আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, ঐকান্তিক সরলতাগুণে তাহাতেই অতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, বুঝিতে পারে নাই যে তিনি তাহাকে কি কঠোর ব্রতেই ব্রতী করিয়াছেন, কি দুর্লভ রত্নেরই আহরণে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহাহউক, ব্রাহ্মণ কিন্তু অযোগ্য পাত্রে ভারার্পণ করেন নাই, বোধ হইতেছে, এই বালক কর্তৃক নিশ্চয়ই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। বালকটিতে যে সকল শুভ লক্ষণ রহিয়াছে, কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। বুঝিলাম, এখন উহার দীক্ষা হয় নাই, কিন্তু আচার্য্যের নিকটে প্রকারান্তরে দেবতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে, উহাকে ঐ দেবতার বীজমন্ত্র প্রদান করিয়া দীক্ষিত করি,—ক্ষেত্র উর্বরা বটে, বীজ বপন কখনই বিফল হইবে না। শুধু দেবতা জানিলে ইষ্ট সিদ্ধি হয় না—বীজ জানিতে হয়। বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন না করিয়া, কেবল অগ্রভাগে জল সিঞ্চন করিলে, যেমন বৃক্ষ সজীব হয় না, পরন্তু সেচনকারীর পরিশ্রম পণ্ড হয়, সেইরূপ মূলমন্ত্র জপ না করিয়া, কেবল দেবতার নাম ধরিয়া ডাকিলেও, দেবতার চৈতন্য হয় না, অপিচ সাধকের সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া থাকে, তাই বলিতেছি, অগ্রে বীজ, তারপর দেবতা। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ, যেমন চতুরতার সহিত দেবতার পরিচয় দিয়াছেন, আমিও সেইরূপে উহাকে দীক্ষিত করিব। আসল কথা প্রকাশ করিব না, কি জানি, ছেলে মানুষ, প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলে হতাশ অথবা ভগ্নোৎসাহ হইলেও হইতে পারে।

সন্ন্যাসীকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব দেখিয়া অরবিন্দ বলিল,—"মহাশয়! আমাকে হতাশ

হইতে নিষেধ করিয়া, যথেষ্ট উৎসাহ দিতে-ছেন বটে, কিন্তু আমার আশান্বিত হইবারত কোনই কারণ দেখিতেছি না? বিশাল ভারতবর্ষের কোন লোকালয়ইত দেখিতে ক্রটী করি নাই—সর্ব্বত্রই বিফল হইয়াছি। সাধে কি আমাকে হতাশ হইতে হইয়াছে।

স। বৎস! ভারতের সমস্ত লোকালয়ই অন্বেষণ করিয়াছ বলিয়া যে, সকলই দেখা হইয়াছে, এমত বিবেচনা করিও না। সুবিস্তীর্ণ ভারতের বহুতর স্থান এখনও তোমার নেত্রগোচর হয় নাই।—কত বিস্তৃতায়তন প্রান্তর, কত দিগন্তবিস্তারী অরণ্যানী, কত বহু যোজন ব্যাপী অভ্রস্পর্শী—অচল শ্রেণী এখনও তোমার অপরিদৃষ্ট রহিয়াছে। বৎস! আর একটি কথা তোমাকে বলিতে ভুল হইয়াছে,—যে সকল লোক তোমার গুরু কন্তার ন্যায় লক্ষণাক্রান্তা কামিনীর কথা আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলেন,—"সেই মেয়েটি লোকালয়ে থাকিতে বড় ভাল বাসেন না।" সেই জন্য, বৎস! তোমাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিতেছি, এখন বহুতর নির্জ্জন স্থান তোমার নয়নগোচর হয় নাই, ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর, নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

সন্ন্যাসীর বাক্যাবলী শ্রবণে, অরবিন্দের মনে অপরিসীম আনন্দের উদয় হইল, হতাশার দুর্ব্বলতা অকস্মাৎ তিরোহিত হইয়া, উদ্দীপনার নব তাড়িত স্রোত তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে আবার যেন সে আশার আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইল। বালকের এই অভাবনীয় আকস্মিক অবস্থান্তর দর্শনে সন্ন্যাসীও যারপর নাই প্রসাদিত হইলেন। অরবিন্দ বলিল,—"হে মহাত্মন্! আপনার উপদেশামৃত পানে, যেন আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল—আবার যেন আমি নব কলেবরে নব জীবন লাভ করিলাম।"

স। বৎস! আমার স্থিরবিশ্বাস হইতেছে, ভগবান্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন,—হতাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিও। বৎস! তোমাকে আর একটি উপদেশ দিবার ইচ্ছা আছে।

অ। কৃপাময়! আপনার অমূল্য উপদেশ অমৃতাধিক সুমধুর। কৃপা করিয়া আবার অভিনব উপদেশ দানে কৃতার্থ করুন। আপনার অযাচিত অনুগ্রহ, অপার করুণা, অপরিসীম স্নেহ ইহজীবনে ভুলিবার নহে।

স। বৎস অরবিন্দ! আমার কাছে একটি আশ্চর্য্য মন্ত্র আছে। কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ দয়া করিয়া আমাকে সেই মন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রটির প্রভাব এমি অতুলনীয় যে, যে ব্যক্তি যাহা অভিলাষ

করিয়া উহা একাগ্রচিত্তে জপ করে। নিশ্চয়ই তাহার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, তাই ঐ অমূল্য মন্ত্র উপদেশটি তোমাকে প্রদান করিবার ইচ্ছা।

অ। দয়া করিয়া মন্ত্রটি প্রদান করুন।

স। বৎস! এই মন্ত্রটি বড়ই গুহ্য,—প্রকাশ্যে উচ্চার্য্য নহে, কোন প্রকারে অন্য লোকের কর্ণগোচর হইলে, বিফলতার আশঙ্কা আছে। পবিত্র দেহে শুদ্ধচিত্তে সবিশেষ ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দেখ দুইখানি গৈরিক বসন রহিয়াছে; পুণ্যতোয় সুরধুনি-সলিলে অবগাহন করিয়া, উক্ত বস্ত্র দ্বয়ের একখানি পরিধেয় ও অপর খানি উত্তরীয় রূপে গ্রহণ কর, পশ্চাৎ আমি মন্ত্র প্রদান করিতেছি।

সন্ন্যাসীর আদেশ অনুসারে অরবিন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া বস্ত্র যুগল পরিধান করিলে সন্ন্যাসী তাহার কর্ণমূলে ভগবতী কালীকার মূলমন্ত্র প্রদান করিলেন। পুণ্য ক্ষেত্র বারাণসীধামে, পূত-সলিলা জাহ্নবিতীরে অরবিন্দ দীক্ষিত হইল। অবিদ্যার অন্ধকারময়ী যবনিকা অপসারিত হইয়া, এইবার তাহার জীবন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরব্ধ হইল, এতদিন পরে তাহার সিদ্ধিমার্গের অর্গলিত দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দীক্ষা দানান্তে সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বৎস! খুব সাবধানে খুব সংগোপনে এই মন্ত্র জপ করিও, শত শত উৎকট বিপদ উপস্থিত হইলেও ভীতি বিহ্বল হইয়া অমার মন্ত্র জপে বিরত হইও না। বরং বিপদের সময় দ্বিগুণ প্রযত্নে মন্ত্র স্মরণ করিও। দিনমণির অভ্যুদয়ে যেমন অনন্ত অন্ধকার রাশি অন্তর্হিত হয়, এই মন্ত্রের স্মরণ মাত্রেই তোমারও সেইরূপ অনন্ত বিপদ পরম্পরা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিবিড় অরণ্য। নিবিড় অন্ধকার। যে দিকে চাও, কেবলই অন্ধকার। এ যেন অন্ধকারের রাজ্য। অনন্ত অন্ধকাররাশি যেন আকাশ মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া আপনার অধিকার সীমা দৃঢ়ীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। অনন্ত সংখ্যক গগনস্পর্শী পাদপ শ্রেণীর অনন্ত সংখ্যক শাখা পল্লব, পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া দিবাভাগেও আলোকের গতি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভীষণ কানন মধ্যস্থ তমসা গর্ভে প্রবেশ করিলে দিবানিশার পর্য্যায়ক্রমিক গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। কাননস্থলীর অবস্থা স্থিরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই অনুমিত হয়, যেন, উহাতে কস্মিনকালেও জন-মানবের সমাগম হয় নাই। মানুষের প্রতিবিধি থাকিলে,

অবশ্যই তাহার একটা পরিচিহ্ন থাকিত। একটি মানুষ স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে, এমন একটি ক্ষুদ্র পথের অস্তিত্বও কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল মাত্র স্থানে স্থানে কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় লতা গুল্ম রাশি ভেদ করিয়া কানন গিরি হিংস্র পশু-গণের পদচিহ্নাঙ্কিত সুড়ঙ্গবৎ সংকীর্ণায়তন দুই চারিটি সুদীর্ঘ পথ কাননের বহির্দেশ হইতে তীর্য্যগ্‌ভাবে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়াছে। অরণ্যের দক্ষিণ দিকে বিশাল প্রান্তর, উত্তরে হিমানি মণ্ডিত শীর্ষ গিরিরাজ হিমালয় আকাশমার্গ ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, পূর্ব্ব পশ্চিমে আমাদের বর্ণিত এই জঙ্গল অরণ্যানী হিমাদ্রির পাদদেশ অধিকার করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত কলেবর বিস্তার করিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বেলা অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা আগত প্রায়, সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে আরক্ত কলেবর হইয়া, অস্তাচলের বিশ্রাম শয্যায় গমনোন্মুখ হইয়াছেন। হিমাদ্রির তুষার ধবল কলেবরে অস্তগত রবি স্বর্ণ-কিরণ সমূহ প্রতিফলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সায় ন্ন-কালে পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে সেই সকল ব্যাপার বর্ণন করিয়া বুঝান সুকঠিন।

রবির অস্তমিত-ছবি ক্রমশঃ দৃষ্টি পথের সীমা অতিক্রম করিল। রাজা অরাজক হইলে দস্যু, তস্করাদি দুর্ব্বৃত্তগণ যেমন প্রহৃষ্ট মনে আপনাপন আধিপত্য বিস্তার করে, জগত্ প্রকাশক দিনমণির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ নৈশ অন্ধকারও বিপুল তৎ-পরতার সহিত স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। নিশা যত গভীর হইতে লাগিল, তমসারাশি যেন ততই ঘনীভূত হইয়া অধি-কৃত স্থান দৃঢ়ীকৃত করিতে লাগিল। রবির রাজ্য গেল, রজনীর রাজ্য হইল। কিন্তু হে রজনি! তুমি এত প্রভুত্ব প্রকাশ করি-তেছ কেন? তোমার এত দর্প, এত বক্র আঁটুনি কেন? কতক্ষণ তুমি রাজ্য পাই-য়াছ? কতক্ষণ তুমি রাজ্যেশ্বরী হইয়াছ? হে রজনি! তোমার রাজ্যের অস্তিত্ব কত-ক্ষণ, ভাবিয়াছ কি? ভাবিয়াছ কি তোমার লীলাখেলা অতি ক্ষণস্থায়ী, অতি ক্ষণভঙ্গুর জাননা কি,—উত্থানের পর পতন আছে? উত্তেজনার পর অবসাদ আছে? আঘাতের পর প্রতিঘাত আছে? তাই বলিতেছি, বৃথা গর্ব্ব করিও না, বৃথা আস্ফালন করিও না,—কিছুই চিরস্থায়ী নহে, শীঘ্রই তোমার প্রভুত্ব ঘুচিবে, শীঘ্রই তোমার দর্প চূর্ণ হইবে,—আবার রবির উদয় হইবে, আবার রবির রাজত্ব হইবে। তাই বলিতেছি, এত বাড়াবাড়ি কেন?

আমরা নিয়ত দেখিতে পাই, প্রকৃতির এই নিয়ম, কি জড়-জগতে, কি জীব-জগতে সর্ব্বত্রই তুল্য রূপে কার্য্যকারিণী। কেবল ভাঙ্গা আর গড়া, গড়া আর ভাঙ্গা, কেবল পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনই যেন প্রকৃতির প্রাণ। প্রকৃতি প্রতিনিয়তই যেন আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, "কিছুই চিরস্থায়ী নয়।" আমাদের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সকলই ঐ একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, একই দুচ্ছেদ্যসূত্রে সংগ্রথিত রহিয়াছে। হে রোগি! রোগের উৎকট যন্ত্রণায় তুমি বড় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছ? হে দুঃখী, দুঃখের ভীষণ কশাঘাতে তোমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছে? হে দরিদ্র, দীনতার দারুণ দংশনে তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে; হে শোকী, শোকের দুর্ব্বিসহ দাবানলে তুমি অহরহ দগ্ধ হইতেছ? হতাশ হইও না, কিছুকাল অপেক্ষা কর, দেখিবে শীঘ্রই তোমাদের সকল যাতনার শান্তি হইবে, ঐ দেখ, তোমাদের দুঃখান্ধকারময় আকাশে আবার উষার আলোক রেখা দেখা দিতেছে—এখনই সুখরবির উদয় হইবে। ঐ শুন প্রকৃতির অভয়বাণী,—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। হে সুখী, হে বিলাসী, সুখ বিলাসে তোমরা বড়ই বিভোর হইয়াছ দেখিতেছি? ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া যেন সরাটাকে সরাব মত দেখিতেছ,—ভাবিয়াছ যেন, তোমাদের জীবন তটিনীতে চিরদিনই এইরূপ সুখের জোয়ার প্রবাহিত থাকিবে? কিন্তু জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে যে আবার ভাটা আছে, সেটা বুঝি ভাবিবার অবসর পাও নাই? কিয়ৎক্ষণ পরেই যে আবার দুঃখ-ভাটার একটানা স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে, সেটা মনে করিয়াছ কি? তাই বলিতেছি, হে মোহান্ধ, সাবধান!—সময় থাকিতে সতর্ক হও, সুখের মন্দানিল উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের অনলোচ্ছ্বাস সহিবার শক্তি ধারণ কর। তাহা হইলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। ঐ শুন প্রকৃতির ভেরী নিনাদ, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

পাঠক মহাশয়, আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার আমরা অরবিন্দের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। কাশীধামে সেই সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হওয়ার পর, দুই মাস গত হইয়াছে, আমরা আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সম্ভবতঃ সে এখন সন্ন্যাসীর উপদেশ মত নির্জ্জন কানন, প্রান্তরে গুরুকন্যার উদ্দেশ করিতেছে। আসুন, আমরা এই অন্ধকারময় গহন কাননে প্রবেশ করিয়া একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। উঃ! কি বিকট অন্ধকার! নৈশ অন্ধকারে কাননাভ্যন্তর

নিরন্তরপ্রবাহী গভীর অন্ধকারকে আরও যেন গভীর করিয়া তুলিয়াছে। এই ভীষণ আঁধারে কোলের মানুষ দেখিবার যো নাই, কেবল অন্ধকারের পর অন্ধকার শ্রেণী যেন স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কার সাধ্য এই ঘন নিবিড় অন্ধকারে পদাগ্রভাগ প্রসারণ করে? উঃ কি বিকট গর্জ্জন! সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ পশুগণের গভীর নিনাদে যেন, কানন-ভূম বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আসুন পাঠক মহাশয়, আমরা একটু অগ্রসর হইয়া, এই ভীষণ কাননের ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। ও কি ও? ও কিসের শব্দ? ঠিক যেন মনুষ্যের কণ্ঠ-ধ্বনি? যেন কোন বিপন্ন অভাগার হতাশ ব্যঞ্জক হৃদয়ের কাতর আর্ত্তনাদ? আহা কে তুই অভাগা? এই নিবিড় নিশীথে, বিজন বিপিনে, কে তুই? এই হিংস্র জন্তু সঙ্কুল ভয়াবহ স্থানে, কে তুই দুঃসাহসিক একাকী ভ্রমণ করিতেছিস্? আহা! তোর কি প্রাণের মায়া নাই? অপঘাতেও কি তোর আশঙ্কা হয় না? অথবা হয়ত, আমি ভুল বুঝিয়াছি, বোধ করি তুমি এই কাননের অধিষ্ঠাতৃ কোন দয়াময় দেবতা, কাননবিহারী দিগ্‌ভ্রান্ত বিপন্ন পথিকদিগকে, হিংস্র বন্যপশুদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, পথ প্রদর্শনের জন্য, এই গভীর নিশায় কাননময় বিচরণ করিতেছ। হে করুণাময় প্রভো! তোমার চরণোপান্তে কোটী কোটী প্রণাম করি। পাঠক মহাশয় আসুন! আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া এই মহাপুরুষের বিচিত্র কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করি। হরি হরি! একি! এ স্বর যে আমাদের পরিচিত! এ যে আমাদের সেই অরবিন্দের কণ্ঠধ্বনি! এ যে আমাদের সেই বালক অরবিন্দের ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস! আ—হা—হা!! মরি মরি মরি!! কি সাধুতা!! কি একাগ্রতা!! কি ধর্ম্মপরায়ণতা!! কি ভক্তিপ্রবণতা!! ধন্য! ধন্য! ধন্য বালক! ধন্য অরবিন্দ! ধন্য তোমার গুরুভক্তি! ধন্য তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়পদ চট্টোপাধ্যায়।

জাপান মহিলার পাতিব্রত্য।

কেহ কি বলিতে পারেন—অসভ্য জাপান আজ এত উন্নত কেন, কেন আজ জাপানের বলবীর্য্য দেখিয়া প্রাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত। ইহার মূলে যে নিশ্চয়ই কোন ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যাহার জন্য নগণ্য জাপান এত অল্প দিনের মধ্যে জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল এত

সুদৃঢ় করিতে পারিয়াছে। সে ধর্মভাব আর কিছু নহে, জাপান কুললক্ষ্মীগণের ধর্মশীলতা ও পাতিব্রত্যই ইহার মূলীভূত কারণ। একদিন এই পরাধীন ভারত যাহার বলে সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, একদিন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নীতির অনুসরণ করিয়া যে ভারত ললনা জগতে পূজনীয়া হইয়াছিলেন। আজ জাপান রমণীগণ সেই সতীত্ব তেজে আপনাদের স্বামী পুত্রকে এতদূর সতেজ করিয়াছে যে মুষ্টিমেয় হইয়াও তাহারা প্রবল পরাক্রান্ত রুষ জাতিকে অনায়াসে যুদ্ধে পরাজিত করিল, তাই আজ তাহারা জগতের ইতিহাসে ধন্য ও বরেণ্য হইয়া রহিল। অস্ত্রবলে জাপানের ন্যায় নগণ্য জাতি প্রভূত বিক্রমশালী রুষিয়ার রণবাহিনীর প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। একমাত্র জাপান কুললক্ষ্মীগণের জ্বলন্ত সতীত্ব তেজেই তাহারা এক্ষণে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য হইতে পারিয়াছে আর সেই জন্যই গর্ব্বোন্নত বৃটিশ কেশরী আজ তাহাদের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

জাপানের এই অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া, অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের এরূপ জাতীয় অভ্যুদয় দেখিয়া মনে আনন্দও হয়, আবার আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে নিদারুণ ক্ষোভেরও উদয় হইয়া থাকে। একদিন আমাদেরও এইরূপ তেজোদীপ্ত সমগ্র জগত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, একদিন স্ত্রীজাতির সতীত্ব গুণে আমরাও যুদ্ধ বহুলগণকে চমকিত করিতে পারিয়াছিলাম। সেই পুণ্যবতী রাজপুতললনাবৃন্দের অমানুষিক সতীত্বতেজে এককালে এই হতভাগ্য জাতিকেও উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়াছিল। জাপান আজকাল আর অসভ্য বর্ব্বর আখ্যায় আখ্যায়িত হইবার জাতি নহে, আজ তাহারা ধর্মবলে আদর্শ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর ত্রিকালদর্শী, ঋষিগণ সংহিতা শাস্ত্রে যে স্ত্রীনীতি গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের অরুন্ধতী, দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতি রমণীগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া দেবীরূপিণী হইয়াছেন, যাহাদের প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শ প্রতিমা আমরা এখন পূজা করিয়া থাকি। রাজপুতনা একদিন যে নীতি অনুসরণ করিয়া সমগ্র মেদিনী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, জাপান আজ সেই নীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, সেই আর্য্য ঋষি প্রদর্শিত পথের পথিক হইয়া বলবীর্য্যে এত উন্নত হইয়াছে। বিবি ইসাবেলা "Unbeaten Tracks in Japan" নামক গ্রন্থে জাপানী স্ত্রীর যে চরিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিয়দ্দিন হইল বঙ্গবাসীতে যাহার কতক অংশ উদ্ধৃত হইয়া ছিল, আমরা সেই জাপানী স্ত্রী চরিত্রের কয়েকটী নীতি কথা আজ পাঠকবর্গের গোচর করিব—

(১) জাপানে প্রত্যেক বালিকার যোগ্য বয়সেই বিবাহ দিতে হইবে। জাপানী পিতা মাতা,—নিজ পরিবার বা আত্মীয় স্বজন-বংশে কন্যার বিবাহ দিতে পারিবে না।

(২) জাপানী পিতা মাতা,—পুত্র অপেক্ষা কন্যার শিক্ষাবিধানে ও চরিত্র-গঠনে বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন; কেননা, কন্যাকে শ্বশুর-শাশুড়ীর, স্বামীর এবং তাঁহাদেরই অন্যান্য পরিজনবর্গের অধীন ও মনোমত হইয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

(৩) সুন্দরী অপেক্ষা সুচরিত্রা হওয়াই জাপানী রমণীর উৎকৃষ্ট গুণ। পতিব্রতা, সুশীলা, সুধীরা, বশীভূতা স্ত্রীই জাপানী সংসারের আনন্দ-রূপিণী। উচ্চহাসিনী, উচ্চভাষিণী, কলহ-প্রিয়া, প্রগল্‌ভা, কর্কশা, ব্যাপিকা, গৃহকুৎসা ব্যক্তকারিণী, অধীরা, উগ্রা কামিনী জাপানী সমাজবিধি অনুসারে পরিত্যাজ্যা।

(৪) জাপানী স্ত্রী কখন কোন কুকথা শুনিবে না; কু দৃশ্য দেখিবে না; আত্মীয়-কুটুম্ব পুরুষকেও হাতে তুলিয়া কোন দ্রব্য দিবে না; একাসনে বসিবে না;—একত্র পথ চলিবে না,—একত্র বস্ত্র রাখিবে না; শৈশব অবস্থা হইতেই পুরুষের সংসর্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে শিক্ষা করিবে। জাপানী পিতা মাতা,—কন্যার বাল্যকাল হইতেই তাহাকে এই সকল নীতি শিক্ষায় শিক্ষিত করিবে।

(৫) কোন জাপানী বালিকাই স্বেচ্ছায় স্বয়ংবরা হইতে পারিবে না; পিতা-মাতা ঘটক সাহায্যে কন্যাকে পরিণীতা করিবে। কুত্রাও প্রেম, তথাপি জাপানী কুমারী নষ্ট-চরিত্রা হইতে পারিবে না, চরিত্র-রক্ষার জন্য ধাতু প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকিবে।

(৬) স্বামীর সংসারই,—জাপানী বিবাহিতা রমণীর আত্ম-সংসার; স্বামী গৃহই স্ত্রীর গৃহ; স্বামী নিঃস্ব হইলেও জাপানী স্ত্রী কদাচ পতিগৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

(৭) জাপানী রমণী অনূঢ়া অবস্থায় পিতা মাতাকে ভক্তি সম্মান করিবে; তাহাদেরই সেবাপরায়ণা হইবে; কিন্তু বিবাহ হইলেই জাপানী স্ত্রী, পিতা মাতা অপেক্ষাও শ্বশুর শাশুড়ীকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিতে অভ্যাস করিবে। তাহারা কটু কহিলেও, জাপানী বধূ রুষ্ট হইবে না,—প্রফুল্ল মনে তাহাদের সেবা করিবে; এরূপ করিলে, শ্বশুর শাশুড়ী,—বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

(৮) বিবাহিতা জাপানী রমণীর স্বামী ব্যতীত অন্য কোন প্রভু বা দেবতা নাই। রমণী সতত প্রফুল্ল বদনে এবং বিনীত বচনে স্বামীর সহিত কথোপকথন করিবে; স্বামী রূঢ় বাক্য কহিলেও, স্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিবে না; হৃষ্ট মনে স্বামীর আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত থাকিবে। কারণ স্বামীই স্ত্রীর স্বর্গ;

স্বামীর অসন্তোষই,—স্ত্রীর স্বর্গলাভের অন্তরায়।

(৯) স্বামীর আত্মীয় স্বজনই স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন; স্ত্রী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিবে না। কারণ, ইহাতে স্বামীর সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিবে।

(১০) স্বামী অসচ্চরিত্র হইলেও, স্ত্রী অসূয়া-পরবশ হইবে না। স্বামীর চরিত্র-শোধনের জন্ম তিরস্কার করিবে বটে; কিন্তু তাহাও প্রফুল্ল মুখে, বিনীত ভাষায়। স্বামী, স্ত্রীর কথা শুনিলে, ইহার জন্ম বার বার তাহাকে কিছু বলিবে না; প্রবৃত্তি শান্ত হইলেই,—স্বামীর চরিত্র আপনিই শোধিত হইয়া যাইবে।

(১১) জাপানী স্ত্রী বৃথা বহু বাক্য বলিবে না, মিথ্যা কহিবে না; কাহারও নিন্দা করিবে না। অপরের নিন্দা শুনিলে চাপিয়া রাখিবে,—ফুটিয়া বলিবে না; বলিলে, সংসারে দ্বন্দ্ব কলহ উপস্থিত হইতে পারে।

(১২) জাপানী স্ত্রী সর্ব্বদাই সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে; প্রত্যূষে সকলের অগ্রে শয্যা হইতে উঠিবে; সকলের শেষে শয়ন করিবে। পান ভোজনে বা বেশপোষাকে বহু ব্যয় করিবে না; থিয়েটার যাত্রা দেখিবে না; যেখানে বহুপুরুষের সমাগম, তেমন স্থলে যাইবে না।

(১৩) যুবতী স্ত্রীলোক,—কোন যুবা পুরুষের সহিত,—স্বামীর কোন আত্মীয় পুরুষের সহিত এমন কি,—স্বামীর পুরুষ ভৃত্যের সহিতও বেশাবেশি ভাবে কথা কহিবে না; সহস্র প্রয়োজন থাকিলেও, কোন যুবককে পত্র লিখিবে না।

(১৪) বিবাহিতা স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ীরই সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে,—পিতা মাতার নহে; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রী—পিতা মাতা অপেক্ষা শ্বশুর শাশুড়ীর অধিক সেবা করিবে। ঘন ঘন পিতা মাতাকে দেখিতে যাইবে না; প্রয়োজন হইলে, লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইবে। স্বামীর আদেশ ব্যতীত কুত্রাপি যাইবে না; তাহাকে কোন সামগ্রী দিবে না।

(১৫) বহু ভৃত্য থাকিলেও, বিবাহিতা স্ত্রী, স্বামীগৃহে সকল কার্য্যই নিজে করিবে। শ্বশুর শাশুড়ীর কাপড় কাচিবে। অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবে। নিজহস্তে স্বামীর শয্যা প্রস্তুত করিবে; জাপানী প্রকৃতি ছেলেদের ময়লা মাথা কাপড় নিজেই পরিষ্কার করিবে। সর্ব্বদাই নিজের বাড়ীতেই থাকিবে।

(১৬) স্বামী-সংসারের চাকর চাকরাণী যদি স্বামীর কোন আত্মীয় স্বজনের নিন্দা করে, তাহাদের নামে লাগায়, তাহা হইলে, জাপানী স্ত্রী সে কথায় কাণ দিবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে, অর্থাৎ বিবাহের অগ্রে যে শ্বশুর শাশুড়ী নববধূর একান্ত অপরিচিত ছিল,

তাহাদের নামে লাগাইয়া মন ভাঙ্গাইয়া দিতে,—মন ভাঙ্গাইয়া সংসার সুখ নষ্ট করিতে কতক্ষণ? যে পাপবুদ্ধি চাকর চাকরাণী এরূপ লাগাইতে আসিবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

(১৭) নিন্দা করা আর দ্বেষ করাই স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের দোষ। মূর্খতাই ইহার কারণ। ফলে, সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। এই সব কারণে বিবাহিতা জাপানী স্ত্রী কোন বয়সে কোন অবস্থাতেই স্বতন্ত্র চলিবার চেষ্টা করিবে না; সর্ব্বদাই স্বামীর বশে থাকিবে। ভাল কাজ করিলেও তাহার জন্ত বড়াই করিবে না। লোকে মন্দ বলিলে নীরবে সহ্য করিবে; দোষ শোধরাইয়া লইয়া ভাল হইবার চেষ্টা পাইবে।

(১৮) জাপানী যদি শ্বশুর শাশুড়ীর আজ্ঞা প্রতিপালনে অযত্ন প্রকাশ করে, যদি অবিশ্বাসিনী, বিলাসপরায়ণা, কুষ্ঠরোগাদিতে রুগ্ন কলহপ্রিয়া, চৌর্য্য-অপরাধে অপরাধিনী এবং বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। পতি-ত্যক্তা স্ত্রী বড়ই হতভাগা; তাহার জীবন,—মৃত্যুর তুল্য।

পাঠক! ইংরাজ মহিলা বিবি ইসাবেলা জাপানী রমণীর বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হউন; জাপান আজ হিন্দু ধর্ম্মের পবিত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া কতদূর উন্নত হইয়াছেন দেখুন। বিবি ইসাবেলা স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াছেন, জাপানী স্ত্রী বস্তুতই সুশীলা কুললক্ষ্মী, একান্ত পতিপরায়ণা, সর্ব্বথা সংসার শুভকারিণী। জাপানী স্ত্রী-বস্তুতই সংসার তরুর বিনোদ-বল্লরী, শান্তিকুঞ্জের সুরভিত মল্লিকা, গৃহ সরোবরের প্রফুল্ল নলিনী পতি হৃদয়ের চিরপ্রহ্লাদিনী। জাপান রমণী শৈশব হইতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অনুরাগিণী হইয়া থাকে। জাপানে এইরূপ শিক্ষাই প্রচলিত, তাই আজ তাহাদের এত উন্নতি, তাই আজ তাহাদের যশোসৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত। ধন্য জাপান! আজ তোমরা ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, স্ত্রীজাতিকে প্রোজ্জ্বল ধর্ম্মশিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া জগতে যে চিরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছ; যে কীর্ত্তি চিরকাল উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়া জগতের লোককে হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে। ভাই! হিন্দু! আর তোমরা তোমাদের চির পূজ্য ধর্ম্মে বীতস্পৃহ হইয়া কিরূপ অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছ, একবার দর্শন কর। ধর্ম্ম ভিন্ন যে জাতীয় জীবনের উন্নতি কোনও রূপেই সংসোধিত হইতে পারে না, জাপানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে সে বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে।

আজকাল সকলে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু হিন্দু রমণী কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইলে সমস্ত জাতির মুখোজ্জ্বল হয়, সংসার

শান্তিময় হয়। নৈতিক বলে বলবন্ত হইয়া সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে, এস, আমরা আমাদের রমণীগণকে সেই শিক্ষা প্রদান করিয়া ধন্য হই, হিন্দুর যশো-লক্ষ্মী পুনরায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া আমা-দিগকে ধন্য করুক। যতদিন না আমরা পুনরায় আমাদের স্ত্রীগণকে অসার শিক্ষার পরিবর্ত্তে সেই পূর্ব্ব শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে পারিব, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা করা শূন্যে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় নিষ্ফল। আং সং

সৌন্দর্য্য।

চেয়োনা উহার পানে,
আশা তরশা প্রাণ তোর,
পলকে পড়িবে ঢলি,
বাড়িবে যাতনা ঘোর।
হাঁসি ভরা চাহনিতে;
প্রাণনাশি হলাহল;
মনের অগম্যে ছুটে,
জ্বালে প্রাণে দাবানল।
অতল সাগর জলে,
কর মগ্ন সুধা যারে,
অনিবে জ্বালাবে প্রাণ,
কিছুতে নিবিবেনারে।
যেওনা উহার কাছে,
রও স'রে দূরে দূরে;
কাজ কি পতঙ্গ বৃত্তি,
মানবে আশ্রয় করে?
রূপ তৃষা প্রাণঘাতী,—
কোমল মুকুল প্রাণে;
কিবা কাজ দিয়া কান,
শিয়রে শমন এলে?
সুন্দ উপসুন্দ খব,
রাবণ চিতার পর;
জুড়াল রূপের জ্বালা,
জ্বলে ছায় পুরন্দর;
অমর নিস্তার তাই,—
তবু কি লাঞ্ছনা কম?
নীরবে অনল জ্বালা,—
বহে গাত্রে অনুপম।
বাতাস লাগিলে গায়,—
অমর বা কিবা তার;
পুড়িয়া মরিবে প্রাণে
করি সার হাহাকার।
মধুর অধর ওই
রঞ্জিত বাঁধুলি রাগে;
ঢেলে দেয় কালকূট,—
মরমের নিম্নভাগে।
ওই হাসি ভরা মুখ,
চাহনি চপলা সম;
বজ্রাঘাত পূর্ব্ব চিহ্ন,
সাবধান প্রিয়তমে।
কন্দর্প কুসুমায়ুধ,—
নিন্দিত যুগল ভুরু;

শত্রু মিত্র নাহি মানে,
হানে প্রাণে শর গুরু।
যতনে অন্তরে থাকি,
অন্তর যাতনা হেরে ;
হাসে মুখে মৃদু, যথা--
পশু নাশি ব্যাধ শরে।
কে বলে ব্রহ্মাণ্ড পতি—
লক্ষেতে এ বিশ্ব ছুটে ;
ওরি প্রতারণা মুগ্ধ,
ওরি পায় বিশ্ব লুটে।

প্রণয়।

সুর নিষেবিত নন্দন কানন,
জীব পরিপূর্ণ মর্ত্ত ভূমিজন,
বসন্ত অনীল ভীম ঝঞ্ঝাবাত,
অচল শিখরে, পয়োনিধিতলে,
সৌধে, কি কুটীরে, কিম্বা বনস্থলে,
আঁধার রজনী, বিমল প্রভাত,
অমিয় মাখান শশাঙ্ক কিরণে
দাবানল পারা মধ্যাহ্ন তপনে,
কুঞ্জ কুঞ্জ, কিবা নিবিড় কান্তার,
নয়নের কোণে নিভৃত মরমে,
গোপনে, পরাণে, ভীতি, কি সরমে,
জানিনা কোথায় জনম তার,
শারদ সুধাংশু হাসিটুকু হরি,
শিরিষ কুসুম কোমলতা ধরি,
চারুবেশে সেগো যেখানে রয়,
সহচরী বেশে চির মধু হাস,
কিঙ্করের বেশে ফুল্ল ফুল বাস,
সে দুর সমীর নিরত বয়।
কোয়েলি কুজিত রম্য উপবন,
মুখরিত রব ভ্রমরা গুঞ্জন,
চিরানন্দময় পরশে তার ;
মোহিনী মদিরা ললিত অধরে,
পরশে পরাণ আবেশে শিহরে,
ধমনীতে বয় তড়িত ধার,
দারুণ হুতাশে মরমের স্তরে,
রাবণের চিতা জ্বলে হুহু করে,
শান্তিহীন প্রাণ মরণ যাচে,
স্নেহের আঁচলে অশ্রু সিক্ত মুখে,
প্রেম মর করে শোক দগ্ধ বুকে,
মূর্চ্ছাগতে শুধু সেই রয় কাছে।
কেবা এ জগতে সখা তার চেয়ে ?
না ডাকিতে আসে আপনি ধাইয়ে,
কাঁদিয়ে যতনে হাসাতে চায়,
উচ্ছ্বসিত বুক শান্তি ভরা সুখে,
প্রীতি ফুল্ল মুখ শুধু চোখে দেখে,
জানিনা কি দিয়ে বেঁধেছে ধরায় !

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কুন্তলকান্তি তৈল
সৌগন্ধযুক্ত কেশবর্দ্ধক ও
যাবতীয় শিরোরোগ নাশক
মূল্য ॥৹ আনা মাশুলাদি ।৵৹।
বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭৫ নং নিমু গোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

আলোচনা।

"মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।"

নবম বর্ষ। } চৈত্র ১৩১২। { দ্বাদশ সংখ্যা।

প্রেমের পুরস্কার।

সে আজ অনেকদিনের কথা। সে দিন আমি আমার বন্ধু মহম্মদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম। তখন আকাশে মেঘ ছিল এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছিল। বৃষ্টি নামে নাই,—কেবল পদ্মাশীকরসম্পৃক্ত মন্দানিল আমাদের শরীর শীতল করিয়া দিতেছিল আমরা বেড়াইতেছি,—দুইজনেই নীরব। পশ্চাতে বিশাল নিস্তব্ধ প্রান্তর—সম্মুখে কলনাদিনী ভৈরবী পদ্মা। প্রাণের মধ্যে নানাপ্রকার ভাবনা তোলাপাড়া করিতেছিল। মনে হইতেছিল যে, আর একদিন এমনি অস্পষ্ট প্রদোষালোকে—এমনি নিস্তব্ধ আকাশতলে—এই পদ্মাসৈকতে মুন্নার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। হায়, সে কি ভয়ানক দিন! এত যত্ন, এত চেষ্টাতেও মুন্না আমার হইল না। জানিনা মুন্না, মহম্মদ তোমাকে কি গুণে বশীভূত করিয়াছেন!

কিয়ৎকাল নীরবে পাদচারণা করিবার পর মহম্মদ আমায় বলল "দেখ ওয়াহেদ্ আজ তোমায় একটী কথা বলিব।"

আমি বলিলাম—"কি বলিবে বলনা ভাই।"

মহম্ম—"তবে সত্য করিয়া বল, মুন্নাকে তুমি ভালবাস কিনা?"

আমি বলিলাম—"জানিনা ভাই, সে আমায় ভালবাসে কিনা, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসি—সে যে বড় সুন্দর!"

মহম্মদ একটিও কথা বলিল না, সে আমার দিকে একবার চাহিয়া আবার অবনত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিল। তাহার সুন্দর সুকেশান্ত বদনের দিকে চাহিয়া দেখি যে তাহা অবিচল ধীর ও প্রশান্ত। মহম্মদের স্থির প্রকৃতি আমার ভাল লাগিল না। প্রাণে যেন কেমন বৃশ্চিক দংশন হইতে লাগিল। ভাবিলাম মহম্মদের দৃঢ় ধারণা যে মুন্না তাহাকে ভালবাসে। আর নহে

হইল না, আমি একটা অছিলা করিয়া মহম্মদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কিছুদূরে একটা গাছ ছিল। আমি সেই গাছের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে মুন্না দাঁড়াইয়া আছে। আমি ভাবিলাম—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী মুন্না এখানে কেন? ভাবিলাম, আর কিছু নয়—মহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

আজ অনেকদিন পরে মুন্নাকে দেখিয়া আমার নানাকথা মনে পড়িতে লাগিল। কতবার কতদিন আমি ব্যাকুল অন্তরে তাহাকে মনের কথা জানাইয়াছি, কিন্তু কতবার সে আমাকে নিরাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। স্বতঃপ্রণোদিত ভালবাসা লইয়া তাহার নিকট কতবার অনাদৃত হইয়াছি। আমার অন্ধকারময় জীবনের ধ্রুবতারা মুন্না আমার হইল না। সে মহম্মদের;—মহম্মদই আমার মিত্ররূপী শত্রু। সে থাকিতে মুন্না আমার হইবে না।

আমি ভাবিলাম একবার বৃক্ষতলে মুন্নার নিকট যাই এবং প্রাণ খুলিয়া আর একবার তাহাকে সমস্ত কথা বলি। হায় আশা! তুমি মানুষকে পাগল করিতে পার। আমি ধীরে ধীরে মুন্নার নিকটে গেলাম। মুন্না কোনও কথা কহিল না। আমি ডাকিলাম—মুন্না।

মুন্না বলিল—"এই অন্ধকারে আমায় কি করিয়া চিনিলে ওয়াহেদ্?"

আমি—"মুন্না দিবারাত্র যে আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহাকে অন্ধকারেও চিনিতে পারা যায়।"

মুন্না বলিল—"তুমি এখানে কেন?"

আমি "আগে বল তুমি এখানে কেন?"

মুন্না—"আমি মহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আসিয়াছি।"

আমি—"আমিও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

মুন্না—"কখনই নয়; আমি যে আজ মহম্মদের সঙ্গে দেখা করিব, তাহা আমার বলা ছিল।"

আমি বলিলাম "হাঁ মুন্না, বাস্তবিক আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসি নাই। আমি মহম্মদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, সহসা তাহার মুখে তোমার কথা শুনিয়া আমার—

মুন্না আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"মহম্মদের মুখে আমার সম্বন্ধে কি কথা শুনিলে ওয়াহেদ্?"

আমার মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত হইল। ভাবিলাম,—এত ভালবাসা! মহম্মদের মুখে নিজের কথা শুনিবার জন্ত এত আগ্রহ! আমি নিরাশ হইলাম। ধন্ত মহম্মদ, ধন্ত তুমি—আমায় শিখাইয়া দাও, কি গুণে তুমি

মুন্নাকে বাঁধিলে ! মুন্না আবার বলিল—"বল, বল মহম্মদ কি বলিল ?

আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না—প্রাণে বড়ই বেদনা পাইলাম। বলিলাম "একটী কথা,—কেবল মাত্র একটী কথা—সত্য বল তুমি মুন্নাকে ভালবাস কিনা'—তাহার সহিত আমার আর কোনও কথা হয় নাই।"

তুমি কি বলিলে ?

আমি—পরিহাস রাখ মুন্না, আমার হৃদয়ের জ্বালা তুমি কি বুঝিতে পার নাই ?

মুন্না একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"জানি ওয়াহেদ্, তুমি আমায় ভালবাস, কিন্তু কি করিব, তোমায় আমি বিবাহ করিতে পারিব না। তুমি দরিদ্র,—আমি যদিও ঐশ্বর্য্যশালিনী, তবু আমি দরিদ্রকে বিবাহ করিব না—কারণ আমি পিতৃ মাতৃহীনা, তোমার মত দরিদ্রকে বিবাহ করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। তুমি ঘরে যাও ওয়াহেদ্, ঐ দেখ,—ভয়ানক মেঘ করিয়াছে এখনি বৃষ্টি নামিবে।"

সহসা স্ফুরৎ বিদ্যুদ্দামচকিত, অবৃষ্টি সংরব্ধ মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং পদ্মা গর্ভ হইতে সৈকতাভিমুখে তাড়িত একটা প্রবল বায়ু আমার গায়ে লাগিল। হতাশাস, অনাদৃত প্রেমিক আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতভাবে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি, মুন্না চলিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলাম—দেখিলাম যে ঘন ঘন গগণ প্রভা আসিতেছে, বিজলীর হাসি ভাল লাগিল না, বোধ হইতে লাগিল সে যেন আমায় উপহাস করিতেছে। বালুকাময় প্রান্তরের দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম অভেদ্য অন্ধকার ! উত্তাল তরঙ্গকল্লোলোদ্ভূত পদ্মার দিকে চাহিলাম যে আমার হৃদয়ের ছবি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

কি জানি কি মনে হইল, নিজের দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিতে দিতে পদ্মার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যতবার পদ্মা গর্জ্জন ও আকাশ গর্জ্জনের মিশ্রণ হইতে লাগিল, ততবার আমার মনে হইতে লাগিল যে "আর কেন সকল আশা ভরসা তো আজ ফুরাইল, এই প্রকৃতি বিপ্লবে পদ্মাগর্ভে আমার জীবন নাটকের অভিনয় শেষ করি।"

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখি যে একখানি নৌকায় একটি পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি উঠিল। এই দুর্য্যোগে সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মার গর্ভে কাহারা নৌকা ভাসাইতেছে ? কি সাহস !

নৌকায় লণ্ঠনের আলোক জ্বলিতেছিল। সেই অস্পষ্টালোকে পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম মহম্মদ ও মুন্না। মুন্নার বাটী পদ্মার ওপারে বোধহয় মুন্না মহম্মদকে তাহার বাটীতে লইয়া

যাইতেছে। উভয়ে নৌকা খুলিয়া দিল, এদিকেও ভয়ানক ঝড় উঠিল।

আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম নৌকা তখনও অধিকদূর যায় নাই, সহসা একটা ঝটিকা বাতাসে নৌকাখানি জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। আমি ভাবিলাম—"খোদা মুন্নাকে রক্ষা কর আমি সব সহ্য করিতে পারি কিন্তু মুন্না যে ডুবিয়া মরিবে আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না; ইন্‌শাল্লা তালা আমি পদ্মাগর্ভে ঝাঁপ দিলাম।

জানিনা মুন্না কিম্বা মহম্মদ আমায় দেখিতে পাইয়াছিল কিনা আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে ভীষণ তরঙ্গে গা ভাসান দিতে আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বহু কষ্টে অনেক আশায় আমি প্রায় নৌকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি এমন সময় নৌকা উল্টাইয়া গেল মুন্নার নিরাশ চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি অন্ধকারে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পদ্মাগর্ভে কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুক্ষণপরে আমি একখানি ওড়নার অগ্রভাগ ধরিলাম ওড়না আমার হাতে উঠিয়া আসিল। আমি আর একটু অগ্রসর হইতেই মুন্নার সুদীর্ঘ বেণী পাইলাম। সংজ্ঞাহীনা মুন্নাকে লইয়া বহুকষ্টে আমি তীরে উঠিলাম।

মুন্নাকে আমার গৃহে লইয়া গিয়া অনেক শুশ্রূষা করিবার পর তাহার চৈতন্য হইল। দুই একদিন পরে মুন্নাকে তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিলাম। সে আমায় ভাল বাসুক বা প্রত্যাখ্যান করুক সে বাঁচিয়া থাকিলেই আমার অনেক শান্তি।

মহম্মদ মরে নাই। কয়েকদিন পরে তাহাকে আবার মুন্নার বাটীতে গতায়াত করিতে দেখিলাম। মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। হায়! কেন আমি দরিদ্র হইলাম, আজ ঐশ্বর্য্য থাকিলে বোধ হয় মুন্না আমায় প্রত্যাখ্যান করিত না।

একদিন মুন্নার বাটী হইতে ফিরিতেছি এমন সময় পথিমধ্যে কে আমার মাথায় লাঠির আঘাত করিল আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি যে আমি এক অপরিচিত স্থানে একটী ভগ্ন অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। আমি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণপরে একজন বাবুর্চ্চি আমার খাবার দিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ময় কাহা আয়ে হুঁ"। বাবুর্চ্চি বলিল—"মাফ্ কিজিয়ে হুজুর বোলনে কা হুকুম নেহি"।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, এই জনশূন্যস্থানে আমি কোনপ্রকারে কালযাপন করিতে লাগিলাম। একে একে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত কাটিল বসন্ত আসিল। আমার কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। সন্ধ্যার

পর যখন বাতায়ন পথে মলয়ানিল আমার গায়ে লাগিত, তখনই অতীত স্মৃতি আমায় আকুল করিয়া ফেলিত। শতবার সুখ কল্পনা করিয়া মুন্নার নিকট গিয়াছি—শতবার সে আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কিন্তু তবু তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা গেল না।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি আমার প্রকোষ্ঠ উন্মুক্ত। বুঝিতে পারিলাম না কে চাবী খুলিয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম যে মহম্মদ আসিতেছে। আমি মহম্মদকে দেখিয়া বলিলাম, কি ভাই, তুমি যে এখানে? মহম্মদ বলিল—"আমি কোনরূপে শুনিলাম যে তুমি এখানে বন্দী তাই তোমায় উদ্ধার করিবার সুযোগ খুঁজিতে এইদিকে আসিতেছিলাম। তুমি মুক্ত হইলে কিরূপে"? আমি—অত্র আমার গৃহের দ্বার কে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা জানি না, দ্বারে চাবী ছিল না বলিয়াই আমি বাহিরে আসিতে পারিয়াছি। ভাই, একটা কথা বলিব অনেকদিন হইল মুন্নার কোনও সংবাদ পাই নাই। যদি তাহার কোনও সংবাদ রাখিয়া থাক তো আমায় বল। মহম্মদ—সেকি কথা! মুন্না যে আজ ছয়মাস হইল মরিয়া গিয়াছে। আমি বসিয়া পড়িলাম। পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণপরে মহম্মদকে বলিলাম—"ভাই তুমি ঘরে যাও আর আমি গৃহের দিকে ফিরিব না। একবার আমাদের ক্রীড়াভূমি পদ্মাসৈকতে যাইব তারপর পদ্মাগর্ভে আমার স্মৃতি চিরকালের মত লোপ পাইবে। গভীর রাত্রি সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল পদ্মার তরঙ্গসংঘাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমি আজ সেই পদ্মাসৈকতে যেখানে মুন্না আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কত কথা আজ স্মৃতিপথে উদয় হইল। "সেই অন্ধকারময় আকাশ—পদ্মার ভৈরবী মূর্ত্তি পদ্মাগর্ভ হইতে মুন্নার উদ্ধার—আজ সমস্ত কথা মনে পড়িল। প্রাণ উদাস হইয়া গিয়াছে। কুলনান্দিনী পদ্মা আজ সর্ব্বাঙ্গে কৌমুদী মাখিয়া নাচিতেছে বিশাল কালময় প্রান্তর আজ রজতশুভ্র চন্দ্র কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। হায়! যখন মুন্না বাঁচিয়াছিল তখন তো চাঁদ তুমি এত হাস নাই। তখন তোমার এই হাসি লুকান ছিল। আজ আর হাসি ধরে না। জগতে যেদিকে চাহি সেইদিকেই আনন্দ দেখিতে পাই কেবল আমার অন্তর মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক এবং ভয়ঙ্কর। মুন্না—মুন্না তুমি স্বর্গে। তোমার আগমনে বেহেস্ত যেন আরও পুণ্যময় হয়, কিন্তু মুন্না আমি এই মরুভূমির মত পৃথিবীতে কি করিয়া থাকিব!

কিছুদূরে একটী কবর দেখিতে পাইলাম। এই জনশূন্য প্রান্তরে এ কাহার কবর।

তবে কি মুন্নাকে এইখানে কবর দেওয়া হইয়াছে? স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে যাইতে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। উন্মত্তের মত স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে যাইলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে প্রাণ বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিল। একি! এখানে আমার কবর কে নির্ম্মাণ করাইল? তখন জ্যোৎস্নালোকে স্মৃতিস্তম্ভোপরি অক্ষরাবলীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম তাহা এই:—"স্মৃতিস্তম্ভ, সেখ ওয়াহেদ আলীর কবর। তাহার বন্ধু শ্রীমহম্মদ আলি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।" আমি আশ্চর্য্য হইলাম। একি ব্যাপার! আমি যে জীবিত! সেখানে বসিয়া কত ভাবিতে লাগিলাম কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না। শোকসন্তপ্তচিত্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম সেই বালুকাময় প্রান্তরে শুইয়া পড়িলাম। তন্দ্রাবস্থিতভাবে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম?—"আমি যেন মরিয়া গিয়াছি—বাস্তবক আমার বন্ধু মহম্মদ আমার কবর নির্ম্মাণ করাইল। সে দিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। সমস্ত জগত হাসিতেছে। অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে মলয়ানিল বাহিত নদীর পরপার্শ্বস্থ নৈশ বীণাধ্বনির ন্যায় একটি গান শুনিতে পাইলাম:—

"বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি"

ক্রমে সে ধ্বনি আরো কাছে শুনিতে পাইলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল যেন সে শব্দ কবে কাহার কণ্ঠ হইতে শুনিয়াছি। চিনিতে পারিলাম—স্পষ্ট বোধ হইল যেন মুন্নাই গাহিতে গাহিতে আমার কবরের নিকট আসিল। পরে সে নানা সুরভিপুষ্প দিয়া আমার কবর সাজাইল। তাহার পরে, সে বীণাহস্তে লইয়া আমারই কবরে দাঁড়াইয়া আমার মৃত্যুতে কাতর হইয়া গাহিতে লাগিল "বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি" একি! আমি কি স্বর্গে! মুন্না কি আমায় ভাল বাসিত! মুন্না—প্রিয়তমে! এতদিন তবে মনের ভাব গোপন রাখিয়াছিলে কেন? সহসা পুষ্প সৌরভে দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল; সম্মুখে চাহিয়া দেখি সত্যই আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুন্না দাঁড়াইয়া গাহিতেছে—"বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি" আমি প্রবুদ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত মুন্নার নিকট গিয়া বলিলাম "মুন্না—মুন্না একি ব্যাপার!" সহসা পশ্চাদ্দিক্ হইতে কে বলিল "তোমার প্রেমের পুরস্কার" পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—মহম্মদ। মহম্মদ বলিল—"ওয়াহেদ,—আমিই তোমার শত্রু। আমিই তোমার মাথায় লাঠির আঘাত করিয়াছিলাম ও বন্দী করিয়াছিলাম। আমিই তোমাকে মুক্ত করিয়া দিই এবং আমিই তোমাকে মুন্নার মৃত্যু সংবাদ দিই। বাস্তবিক মুন্না মরে নাই। সে মনে মনে তোমায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য মুন্না আমার প্রতি ভালবাসার

ভাণ দেখাইত। আমি মূর্খ! না বুঝিয়া মুন্নার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইলাম। তোমার উপর হিংসা পরায়ণ হইয়া তোমার অনিষ্ট সাধনে কৃতসংকল্প হই। মুন্নাকে তোমার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করাই এবং তোমার মিথ্যা কবর তাহাকে দেখাই; ফলে মুন্না উন্মাদিনী হইল। আমার মনে বড় অনুতাপ হইল—সেইজন্য তোমায় মুক্ত করিয়া মুন্নার সহিত মিলিত করিবার উপায় করি। ক্ষমা কর ভাই, আমায় ক্ষমা কর। নাও তোমার হৃদয়ের বস্তু তুমিই নাও। বল-মুন্না, আমায় ক্ষমা করিলে? মুন্না—"ক্ষমা করিলাম।" মহম্মদ আর দাঁড়াইল না। আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারিলাম না। আমি মুন্নার সহিত তাহার বাটীতে গেলাম। পরে বলা বাহুল্য যে মুন্নার সহিত আমার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

শ্রীনকরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবী না মানবী তুমি?

১

প্রবাসের ক্লান্ত দেহ ঢালিয়া শয্যায়,
সুষুপ্তির কম-কান্তি
পরশে, কি মহা শান্তি
লভিল হৃদয়, আজি পূর্ণ নিরাশায়!
সুদীর্ঘ-ব্যথিত প্রাণ,
জাগরণে ছিল ম্লান,
একি রে অপূর্ব্ব স্বপ্ন হেরিনু নিদ্রায়,—
আলোকিল তমস্বিনী শত চন্দ্রমায়!—

২

আমি কোথা?—এ যে দেখি স্বর্গ-নিকেতন!—
পবিত্র অমরা-পুরী,
সৌন্দর্য্যের ভূরি ভূরি
র'য়েছে বিচিত্র চিত্র,—নন্দন-কানন!
কি সুন্দর ফুল গুলি,
বাসন্তি-হিল্লোলে দুলি'
করিতেছে পরস্পরে প্রীতি আলিঙ্গন,—
এ দৃশ্য—মানব-দৃশ্য না হ'বে কখন!

৩

মৃদুল-তরঙ্গ লীলা-ধীরা মন্দাকিনী,
তরঙ্গ-বিভঙ্গে হায়,
দোলা'য়ে ললিত কায়,
চ'লেছে পুলকে ধরি' মধুর রাগিণী!
সে সঙ্গীত-সুধা-ধারা,
পানে মত্ত দেবতারা,
সে সঙ্গীতে মুগ্ধা বৈজয়ন্ত নিবাসিনী;
কোথা' পাবে এ মাধুরী দরিদ্রা মেদিনী!

৪

কি মধুর প্রকৃতির প্রেমের উচ্ছ্বাস,—
কাননে কুসুম ফোটে,
অনিলে সুরভি ছোটে,
কি অনিন্দ্য সুপেলব লাবণ্য-বিকাশ!
ধরণীর বিরক্ততা,
ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা,

করে'নি হেথায় যেন কভু সহবাস ;
কি সুন্দর বসন্তের পবিত্র বিলাস !

৫

কোথাও জলধি শান্ত প্রমোদ গভীরে,
নাচাইয়া উর্ম্মিরাশি
সুধাংশুর শুভ্র হাসি
মাখিয়া আননে, স্নেহে ডাকে তটিনীরে !
রভসে বিভোর প্রাণ,
গায় নদী কত গান,
বীচি-ভঙ্গ—তান লয়ে, আনন্দ অধীরে,—
কি অপূর্ব্ব দেব-লীলা সলিলে সমীরে !

৬

কোথাও বিচিত্র সৌর সুধা-ধবলিত,
হিমাদ্রির শৃঙ্গ প্রায়,
দাঁড়াইয়া নিঃশঙ্কায়,
অসীম সুষমা রাশি করি প্রকটিত !
মুক্ত বাতায়নে বসি',
প্রাণ খুলে হাসে শশী;
হেরি দেব-দম্পতীয়ে প্রীতি সম্মিলিত,
হেথাকার কেহ বুঝি থাকেনা নিদ্রিত ?

৭

কুহরে কোকিল নিত্য বন-রাজে-শিরে,
পুষ্পিত লতিকা গুলি,
নীরবে আপনা ভুলি,
খোয়ায় শান্তির পদ প্রেম-অশ্রু-নীরে !
কহে ফুল সনে,
মধুপ, প্রফুল্ল মনে,
হইয়া রঞ্জিত পুষ্প-পরাগ আবিরে,
আহ্বানে কামনা সদা সত্য সুরুচিরে !

৮

শান্তির পবিত্র ভূমি,—এ ত্রিবিধ ধাম,
কি সাম্য মহিমাময়,
করে নিত্য অভিনয়,
জড়িত কামনা গুলি সকাম-নিষ্কাম !
পবিত্র সরল ভাব,
হেরি পূর্ণ আবির্ভাব,
পুণ্য-পরার্থতা-স্রোত বহে অবিরাম,
এখানে আত্মার লভে অনন্ত আরাম !

৯

পরিহরি অবনীর নিবাস-নিরয়,
কে তুমি মধুর বেশে,
আনিলে এ দেব-দেশে,
হৃদয়ের অন্ধকার করিয়া বিলয় !
প্রলয়-পর্জ্জন্য-ঘোর,
গভীর নির্ঘোষে মোর,
আতঙ্কে কম্পিত করি' দি'ছিল হৃদয়,
কে তুমি, সহসা দিলে এ শান্তি-আলয় !

১০

আজন্মের কাতরতা,—নীরব ক্রন্দন,
তুমি কি শুনেছ হায়,
বসি এই অমরায়,
তাই কি মুছাতে অশ্রু এতই যতন ?
অপূর্ণ প্রাণের আশা,
জীবনের ভালবাসা,

তুমি কি এসেছ দেবী, করিতে পূরণ ?
পূরাবে কি অভাগার ক্ষুদ্র আকিঞ্চন ?

১১

নীরবে স'য়েছি কত নীরব যন্ত্রণা,
নীরবে প্রাণের গান,
হ'য়ে গেছে অবসান,
নীরব হ'য়েছে বীণা,—মধুর মূর্চ্ছনা !
এ আনন্দ গৃহ ছাড়ি,
আর সে মোহের বাড়ী
নিওনা নিওনা দেবী এ মোর প্রার্থনা,
অবনীর কিছু আর করিনা কামনা !

১২

সে সুখ পরশে আজি মোহিত অন্তর,
এই পুণ্য সুখ স্মৃতি,—
পরাণের এই প্রীতি,
কোথায় পাইবে বিশ্বে মানব নশ্বর !
আত্মা যার দেব সনে,
মিশে' আছে সঙ্গোপনে,
তাহারি জীবনে এই সুখ নিরন্তর,
কোথা' পাবে এই স্বর্গ দেব দেবী নর ?

১৩

একি দেবী ?—সহসা এ ভীষণ আঁধার
কোন্ গুপ্ত দ্বার দিয়া,
এ হৃদয়ে প্রবেশিয়া,
ভাঙ্গিল সে সুখ-নিদ্রা,—স্বপ্ন অমরার ?
পুণ্যময় স্বর্গনাভ,—
সে দেবত্ব আবির্ভাব,
দেখিতে দেখিতে কোথা লুকা'ল আবার,—
এ'বে দেখি প্রহেলিকা মোহ ছলনার !

১৪

এইত মুহূর্ত্তে হায়, ভুলিয়া অবনী,
ভুলিয়া সে শ্রান্তি ছায়া,
জগতের মোহ মায়া,
আনন্দে বিমুগ্ধ ছিল হৃদয়, ধমনী !
পুনঃ যদি দিবে মোরে,
এ অনন্ত বিশ্ব ঘোরে,
পিয়াইলে তবে কেন সুধা সঞ্জীবনী,
ডুবালে অকূলে কেন মিলা'য়ে তরণী !

১৫

এ কি ছলা ?—ছলনার একি ব্যভিচার ?—
মধুর মোহিনী বেশে,
আনি পূত দেব-দেশে,
শেষে কেন দিলে হেন বিরহ অপার ?
এ বিয়োগে মর্ম্ম ভেদ,
অদম্য প্রাণের খেদ,
আজীবন রবে প্রাণে তীব্র, দুর্ন্নিবার,
কেন নিয়ে এলে, যদি না আনিবে আর !

১৬

সে দিন পবিত্র নেত্রে হেরেছি তোমায়
করুণার পূর্ণ ছবি,
সহস্র চন্দ্রমা, রবি,
সাধিয়া তোমার পদে আপনি লুটায় !
আজি এ মানব নেত্রে,
মানবের কর্ম্ম ক্ষেত্রে,

দেখিতেছি তুমি, পূর্ণ মানবী মায়ায়,
দেবী না মানবী তুমি? কি বুঝিব হায়!
শ্রীঅটল বিহারী দাস।

গয়া ভ্রমণ।

গয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থ স্থান। ইহার তুল্য তীর্থ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। এখানে দেশ দেশান্তর হইতে যাত্রীগণ পরলোকগত আত্মীয়গণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে আসিয়া থাকে। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা বাঁকিপুর হইতে গয়া যাত্রা করি। পুরাণ গয়ায় পুলিশ ষ্টেসনের নিকট একটি ত্রিতল বাটী ১০ টাকায় ভাড়া করিয়া তথায় এক মাস বাস করি। ঐ এক মাসের মধ্যে গয়ার যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছি, আজ তাহাই লিখিব।

গয়া বাঁকিপুর হইতে ৫৭ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৩৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে রাম শিলা পাহাড়, দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পাহাড়, পূর্ব্বে ফল্গু নদী এবং পশ্চিমে কেটারি ও প্রেতশীলা পাহাড়। গয়া দুইভাগে বিভক্ত, পুরাণ গয়া ও সাহেবগঞ্জ। মুসলমান রাজত্বের সময় সাহেবগঞ্জ ইলাহাবাদ নামে অভিহিত হইত। গয়ায় তৎকালীন কলেক্টর 'ল' সাহেব হইতে ইহার নাম সাহেবগঞ্জ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আফিস কাছারি প্রভৃতি সাহেবগঞ্জে অবস্থিত বিষ্ণুপাদ-পদ্মের মন্দির ও গয়ালীদিগের বাটী পুরাণ গয়ায়। এখানকার রাস্তা ও গলি সমস্তই প্রস্তর দ্বারা বাঁধান।

রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে গয়ায় আসিতে হইলে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিতে হইত, যিনি গয়ায় আসিতেন, তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিত বাঁকিপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন হইবার পর যাত্রীদিগকে বাঁকিপুর হইতে গরুর গাড়িতে বা পদব্রজে গয়ায় আসিতে হইত। এই পথে এত দস্যু ভয় ছিল যে দস্যুদল ছদ্মবেশে যাত্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া সুবিধা মতে তাহাদের হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। চক রাস্তার দুই পার্শ্বে যে দুইটি ফটক আছে কথিত আছে কোন হিন্দু রাজা গয়া যাত্রীদিগকে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, রাত্রিকালে এ দুটি ফটক বন্ধ হইলে আর দস্যুভয় থাকিত না। কেহ কেহ বলেন ইহা মুসলমান রাজত্বের সময় প্রস্তুত।

পুরাণ গয়া যেন পাহাড়ের উপর অবস্থিত ফল্গুতে যে সমস্ত বাঁধান ঘাট আছে তাহাদের উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ফল্গু বর্ষার সময় ভিন্ন যেন বালুকাময় প্রান্তর বলিয়া বোধ হয়। ফল্গুতে যে সামান্য জল আছে তাহা অস্বাস্থ্যকর। বালুকা খনন

করিলে অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর জল পাওয়া যায়। কথিত আছে শ্রীরাম চন্দ্র বন গমন কালে যখন এই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে এক দিন রাম ও লক্ষ্মণ সীতা দেবীকে কুটীরে রাখিয়া ফলাহরণে গিয়াছেন এমন সময়ে দশরথ আসিয়া সীতাদেবীর নিকট পিণ্ড যাচ্ঞা করেন। কুটীরে কিছুই নাই রাম লক্ষ্মণ প্রত্যাগত হইলে পিণ্ড দিবেন সীতাদেবী এই কথা দশরথকে বলায় তিনি বালুকার পিণ্ড দিতে বলেন এবং ফল্গু হইতে বালুকা লইয়া সীতাদেবী দশরথকে পিণ্ড দান করেন। রাম চন্দ্র প্রত্যাগত হইলে যখন সীতাদেবী তাঁহাকে এই ঘটনার কথা বলেন এবং ফল্গু ও বটবৃক্ষকে ইহার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বলেন ঐ সময়ে ফল্গু সত্য কথায় গোপন করায় "তুমি অন্তঃসলিলা হও" এই বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। বটবৃক্ষ সত্য কথা বলিয়া ছিল বলিয়া সীতা দেবীর বরে অক্ষয় জীবন লাভের বর প্রাপ্ত হন। ফল্গু যদি জল পূর্ণ হইত, তাহা হইলে গয়া একটি সুন্দর নগরে পরিগণিত হইত। গয়া মাহাত্ম্যে লিখিত যে গঙ্গা বিষ্ণুর চরণোদক হইতে উৎপন্ন এবং বিষ্ণু স্বয়ং দ্রব হইয়া ফল্গু রূপে অবতীর্ণ হন, এই হেতু গঙ্গা হইতে ফল্গুর মহিমাই অধিক। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও ফল্গু তীর্থের স্নানের মত ফল পাওয়া যায় না।

গয়া তীর্থ উৎপত্তি সম্বন্ধে গয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে তারকাসুরের পুত্র ত্রিপুরাসুরের গয়াসুর নামে এক মহা বল শালী বিষ্ণুভক্ত পুত্র ছিল। তিনি কোলাহল পর্ব্বতে (ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে) বহু সহস্র বৎসর শ্বাস রোধ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপ প্রভাবে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদ সমুদ্রে বিরাজিত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবৃত করিলে পর বিষ্ণু ও দেবতাগণ গয়াসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমরা তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর।" তখন গয়াসুর কহিলেন "হে দেবগণ! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার শরীর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইতে, সর্ব্বদেবতা ও দ্বিজাতি হইতে, যজ্ঞ তীর্থ ও গিরিকুল হইতে জ্ঞানী কর্ম্মী ও ধর্ম্মী ইত্যাদি পবিত্র বস্তু হইতে পবিত্র করুন।" * দেবগণ "তাহাই হউক" বলিয়া প্রস্থান করিলে পর গয়াসুরকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে লাগিল। তখন

---

* যদি তুষ্টা শরীরং মে ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাৎ।
সর্ব্বদেব দ্বিজাতিভ্যঃ যজ্ঞতীর্থ শিলোচ্চয়াৎ।
দেবেভ্যোঽতি পাবনেভ্যঃ পবিত্রমস্তু চ॥
গয়া মাহাত্ম্য।

যমরাজ গয়াসুর কর্ত্তৃক তাঁহার অধিকার নষ্ট প্রায় দেখিয়া ব্রহ্মাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর কথামত গয়াসুর সকাশে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞার্থ তাহার পবিত্র শরীর প্রার্থনা করিলেন। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার পরও গয়াসুরকে চলিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ গৃহ হইতে ধর্ম্মশিলা আনিয়া তাহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। দেবগণ অটলভাবে ঐ শিলার উপরে অবস্থান করিয়াও গয়াসুরকে নিশ্চল করিতে অপারগ হইয়া, গদাধর গয়াসুরকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। গয়াসুর বলিলেন "যতদিন পৃথিবী পর্ব্বত নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন এই শিলাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ অবস্থান করুন, পাঁচক্রোশ গয়াক্ষেত্র ও এক ক্রোশ গয়াশির আমার নামানুসারে কথিত হউক। ইহাতে গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল এবং সমস্ত তীর্থ আসিয়া লোক হিতার্থে অবস্থান করুন। এই তীর্থে স্নান তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া লোকে মুক্ত হইবে। এখানে যাহাদিগের পিণ্ডদান হইবে তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। এখানে বাস করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ হইবে।" * গয়াসুর তাঁহার প্রার্থিত বর প্রাপ্ত হইলে পর নিশ্চল হইলেন। কথিত আছে গয়াসুরের মস্তকে যে দিবস পিণ্ডদান না হইবে সে দিবস গয়াসুর পুনরায় উত্থিত হইবেন। এক দিবস পাণ্ডারা ইহার সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ মানসে পিণ্ডদান স্থগিত করেন, সন্ধ্যার সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইলে পিণ্ডদান করা হয়। বিষ্ণু পাদপদ্মের পাদদেশে ঐ চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

* যাবৎ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবদচন্দ্র তারকং।
তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ॥

অতীতের স্মৃতি।

গয়া।

বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির ফল্গুনদীর তীরেই অবস্থিত। মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যা বাই প্রচুর অর্থব্যয়ে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরটি কৃষ্ণ প্রস্তরের নির্ম্মিত দেখিতে রথের চূড়ার ন্যায়। ইহার শিখর-

অন্যে চ সকলা দেবা মন্নাম্না ক্ষেত্রমস্তু চ।
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি প্রযচ্ছন্তু হিতং নৃণাং।
স্নানাদি তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানাৎ ফলাধিকং।
গঙ্গাদ্যাশ্চ মহানদ্যাঃ সরাংসি বিবিধানিচ।
তে দেবাস্তানি তীর্থানি প্রযচ্ছন্তু হিতং নৃণাং।
পিতৃণাং ব্রহ্মলোকশ্চ ভুক্তি মুক্তি ফলস্তথা॥
একো বিষ্ণু স্ত্রিধা মূর্ত্তির্যাবৎ সংকীর্ত্ততে বুধৈঃ॥
তাবৎ গয়াসুরক্ষেত্রং খ্যাতি মে তু সদা ভুবি।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনাশয়তু সর্ব্বতঃ॥

দেশে একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত চূড়া আছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে মহারাণী অহল্যা বাইএর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিতে হইলে রাত্রি ৭৮টার সময় দর্শন করাই সুবিধা। ঐ সময়ে চন্দন দ্বারা পাদপদ্ম চিত্রিত করা হয় এবং পদচিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

গয়াতে ছোট বড় অনেকগুলি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মযোনি, রামশিলা, প্রেতশিলা ও সীতাকুণ্ড পাহাড়ই উল্লেখ যোগ্য। গয়ার সমস্ত পাহাড় অপেক্ষা ব্রহ্মযোনি পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। মহারাণী অহল্যা বাই ইহার উপরে উঠিবার সোপান প্রস্তত করাইয়া দেন। ইহার ধাপ সংখ্যা প্রায় ৩৫০। ইহার শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে ব্রহ্মযোনি নামে এক গুহা আছে এই গুহায় প্রবেশ করিয়া বাহির হইলে আর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ইহার নিকটস্থ পাহাড়ে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন আজও গরুর পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই ভীমসেন পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তাঁহার বাম জানুর চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার নিকটেই মঙ্গলা গৌরী দেবির মন্দির এই মন্দিরের পার্শ্বেই অক্ষয় বট। এখানেও লোকে পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

রামশিলা পাহাড় পূর্ব্বে প্রভাস পর্ব্বত নামে খ্যাত ছিল। এই গিরিজাত নদীর সঙ্গমস্থলে রামচন্দ্র জানকি স্নান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বন গমন করিলে পর ভরত এইখানে রাম সীতা লক্ষ্মণ ও অনেক ঋষি মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তদবধি ইহা রামশিলা নামে খ্যাত। টিকারির মহারাজ রণ বাহাদুর সিংহ ইহার সোপান প্রস্তুত করাইয়া দেন। পাহাড়ের উপরিভাগে একটি শিব মন্দির আছে। এখান হইতে গয়া সহরের দৃশ্য বড়ই মনোরম। এখানে আসিলে বাস্তবিকই মনে হয়।

"যে করেছে কোন দিনে গিরি আরোহণ,
সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন।"

রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে প্রেতশীলা পাহাড়। এখানে পিণ্ডদান করিলে প্রেতত্ব দূর হয়। সীতাকুণ্ড পাহাড় ফল্গুনদীর পূর্ব্বতীরে। ইহার নিকটস্থ কূপে সীতাদেবী স্নান করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র দশরথকে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন সেই অবধি ইহা রামগয়া নামে খ্যাত। বিষ্ণুপদ হইতে এক মাইল দক্ষিণে গদালোল তীর্থ। বিষ্ণুর গদায় হেতী নামক দৈত্যের মস্তক দ্বিখণ্ড হইলে সেই গদা প্রক্ষালন হেতু এই তীর্থের উৎপত্তি হয়। ইহা ভিন্ন উত্তর মানস, ধর্ম্মারণ্য ব্রহ্ম সরোবর প্রভৃতি আরও বহু তীর্থ স্থান আছে। সকলগুলি দর্শন

কথা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

সাহেবগঞ্জের ভিতর হাঁসপাতালের নিকট অশোক নির্ম্মিত স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি প্রোথিত আছে। এখানে একটি গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও ২টি প্রাইভেট এনট্রেন্স স্কুল আছে। জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেকে এখানে আসিয়া বাস করেন। এখানকার জল বায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। এখানে অধিকাংশ পদস্ফীতি রোগ দেখা যায়।

ফল্গু নদীর উপরিভাগে যে জল পাওয়া যায় তাহা পান করিলে ঐ রোগ হইয়া থাকে। গয়ার পেড়া ক্ষীরের প্রস্তুত এক-প্রকার মিষ্ট দ্রব্য, তামাক ও পাথরের জিনিস প্রসিদ্ধ। ঢেপুয়ার (গোরখপুরী পয়সার) চলন এখানেও আছে। এই পয়সা আনার ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। গবর্ণ-মেণ্ট প্রচলিত পয়সাকে ইহারা লাটসাহী পয়সা বলে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নীরবে।

নীরবে জনম মম
গাইবারে নিতি নিতি,
নীরবে আমার প্রাণ
প্রাণের নীরব গীতি।
নীরব আকাশে শশী
নীরবে নীরবে ভাসি,
প্রচারে মহিমা তাঁর
নীরবে নীরবে হাসি।
প্রভাতে তরুণ রবি
নীরবে নভে উঠেছে
অমৃত কিরণ ধারা
নীরব রবে ঢালিছে!
নীরবে নীরদ উঠে
নীরবে আকাশে ধায়
সুনীল গগনে তারা
নীরবে নীরবে চায়!
নীরব বয়স আসে
নীরবে বয়স সয়
বিস্তীর্ণ জলধি পাশে
নীরবে তটিনী ধায়।
নীরবে নলিনী ফুটে
প্রভাতে রবির আশে
নীরবে আদর করে
যায় সে তাহার পাশে।
নীরবেতে আত্মা পাখী
বাস করে দেহ নীড়ে
নীরবেতে যায় উড়ে
সকলি বন্ধন ছিঁড়ে!
নীরবে পরাণে মম
উঠে নিত্য কত আশা
নীরবেতে কহি কত
প্রাণের নীরব ভাষা।
নীরবে মরণ মোরে
করিবেরে আলিঙ্গন
নীরবে চলিল সব
ছাড়ি বন্ধু প্রিয় জন!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

কুন্তলকান্তি তৈল
সৌগন্ধযুক্ত কেশবর্দ্ধক ও
যাবতীয় শিরোরোগ নাশক
মূল্য ॥০ আনা মাশুলাদি ।৵০।
বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭৩ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।